NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ECO

PAPER - 7

MODULES - 39, 40 & 41

ELECTIVE COMMERCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of
the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাণিজ্য

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ECO 07 : 39

	রচনা	সম্পাদনা
	শ্রী উজ্জ্বল ঘোষ	অধ্যাপক অঞ্জন ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ECO 07 : 40

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	অধ্যাপক জয়ন্ত কুণ্ডু	অধ্যাপক স্বপন ঘোষ রায়
পর্যায় 2	শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	শ্রী রথীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী
পর্যায় 3	অধ্যাপক উজ্জ্বল ঘোষ	অধ্যাপক অঞ্জন ভট্টাচার্য

পাঠক্রম ঃ পর্যায়
ECO 07 : 41

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	অধ্যাপক উজ্জ্বল ঘোষ	অধ্যাপক অঞ্জন ভট্টাচার্য
পর্যায় 2	—ঐ—	—ঐ—
পর্যায় 3	অধ্যাপক স্বপন ঘোষ রায়	অধ্যাপক মদনমোহন রায়
পর্যায় 4	—ঐ—	—ঐ—
পর্যায় 5	—ঐ—	—ঐ—

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ECO—07

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায় 39			
একক	1	অবতারণা	7–13
একক	2 ক	চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা	14–28
একক	2 খ	প্রস্তাব ও স্বীকৃতি	29–38
একক	2 গ	প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা	39–49
একক	2 ঘ	স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়	50–63
একক	3 ক	বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সমিতি, নিষ্ফল যোগ্য সম্মতি উপচুক্তি, ঘটনাপেক্ষ চুক্তি	64–71
একক	3 খ	চুক্তি পালন, চুক্তি ভঙ্গ ও চুক্তির পরিসমাপ্তি	72–92
একক	4	ক্ষতিপূরণ ও জামিন	93–104
একক	5	গচ্ছিত প্রদান, বন্ধক ও প্রতিনিধিত্ব	105–116
পর্যায় 40			
একক	1	পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০	117–128
একক	2	ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬	129–139
একক	3 (ক)	অংশীদারি আইন, ১৯৩২—সংজ্ঞা, অংশিদারের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব	140–149
একক	3 (খ)	অংশীদারি আইন, ১৯৩২—পুনর্গঠন ও সমাপ্তি	150–158

পর্যায়
৪১

একক	1	কোম্পানি আইন—কোম্পানির গঠন ও অর্থসংস্থান	159–176
একক	2	কোম্পানি আইন—কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও অবসায়ন	177–196
একক	3 (ক)	বৈদেশিক বিনিময় পরিচালন আইন, ১৯৯৯	197–207
একক	3 (খ)	হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১	208–214
একক	4 (ক)	কারখানা আইন, ১৯৪৮	215–226
একক	4 (খ)	শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭	227–236
একক	5 (ক)	শ্রমিক সংঘ আইন, ১৯২৮	237–241
একক	5 (খ)	মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬	242–246
একক	5 (গ)	ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮	247–252

একক ১ ❑ অবতারণা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ আইনের সংজ্ঞা
১.৪ আইনের উদ্দেশ্য
১.৫ সমাজ ও আইন
১.৬ আইনের অনুশাসন ও তার সমালোচনা
১.৭ বাণিজ্যিক আইন
১.৭.১ ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎস সমূহ
১.৮ সারাংশ
১.৯ অনুশীলনী
১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- আইন কি;
- আইনের উৎপত্তির কারণসমূহ;
- সমাজ ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক;
- আইনের অনুশাসনের ধারণা;
- বাণিজ্যিক আইনের সারমর্ম;
- বাণিজ্যিক আইনের উৎস সমূহ;

১.২ প্রস্তাবনা

মানুষ সামাজিক জীব। তারা সমাজে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবার করেন। তারা যে সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আহারাদি-বিধি, জীবিকা-নির্বাহ প্রণালী মেনে চলতে হয়। সমাজের সদস্যরাই সমাজের আচরণ-বিধি তৈরি করেন। সমাজের সব সদস্যরাই সমানভাবে এইসব বিধি-নিষেধ মেনে কোন রাষ্ট্র তার সমাজের সদস্যদের আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষকে সেই আইন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র-আইন রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের আচরণ-বিধিকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা আইন অমান্য করে তারা আইন অনুযায়ী শাস্তি পেয়ে থাকে। সুতরাং আইনের অর্থ, আইনের উৎপত্তি, আইনের অনুশাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

১.৩ আইন কি?

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এবং মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নিয়মকানুন হল আইন। বর্তমান সভ্যসমাজে মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাস করতে হলে কিছু নিয়ম-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এইসব নিয়ম-কানুন না মানলে সমাজে ভীষণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এইসম নিয়ম-কানুন যাতে প্রত্যেকে মেনে চলতে বাধ্য হয়, তার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইন অমান্য করলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং আইন বলতে সেই সব বিধি ও নিয়মকে বোঝায় যা রাষ্ট্র প্রণয়ন ও বলবৎ করে।

আইনের সংজ্ঞা : জনসাধারণের ওপর বলবৎযোগ্য রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রাপ্ত অনুশাসনকেই আইন বলে। বিশিষ্ট আইনবিদ্ হল্যান্ডের (Holland, Jurisprudence) মতে—"জন সাধারণের বাহ্যিক আচরণ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ নিয়মকেই আইন বলা হয়।"
"Law is a rule of external human action enforced by sovereign political authority."

আইনের সংজ্ঞা থেকে আমরা আইনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। যথা—

- ইহা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ রাখার প্রচেষ্টা করে।
- ইহা মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।
- ইহা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ইহা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত।
- কেউ যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে।

১.৪ আইনের উদ্দেশ্য

আইন সম্পর্কে ওপরের আলোচনা ও সংজ্ঞা থেকে আমরা আইনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। যেমন,

- মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে প্রত্যেক মানুষ সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা পায়।
- আইনের প্রয়োগ দ্বারা নৈতিক অনুশাসন ও সুবিচারের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- আইন অমান্য করলে শাস্তি প্রদান করা।

১.৫ সমাজ ও আইন

আইন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা পেলাম। সমাজ সম্পর্কে ধারণা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কতখানি, তা আমরা এই অংশে আলোচনা করব।

কোন একটি মানবগোষ্ঠী অথবা কোন ব্যক্তিসম্প্রদায়, যারা আচার-আচরণ, আহারাদি-বিধি, জীবনধারণের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে একটি সাদৃশ্যের বন্ধনে আবদ্ধ, প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা সকলে একই স্থানে, অর্থাৎ এক সঙ্গে বসবাস করে। এইভাবেই সমাজের সৃষ্টি হয়।

এইসব অভ্যাস, আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক সূত্র ভিন্ন সমাজে ভিন্ন মানবিক আচরণ-বিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। সমাজে যারা বসবাস করে তারাই সমাজের বিভিন্ন ব্যবহার বিধির প্রণেতা। কিন্তু এই বিধিগুলি বাধ্যতামূলক ছিল না। অথচ, সারা এই সামাজিক বিধিগুলি মেনে চলত না তারা শাস্তি হিসাবে সমাজে এক ঘরে হয়ে যেত। এজন্য অন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তির অস্তিত্ব সমাজের ফৌজদারী আইনে (Penal Code) নেই।

কিন্তু অন্যদিকে আইন (Law) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত হয়, সমাজ দ্বারা নয়। মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হল আইনের উদ্দেশ্য।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ বিধি সকলের ক্ষেত্রে বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন সকলকেই মেনে চলতে হয়। অন্যথায় তাকে শাস্তি পেতে হয়। এব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন দেশের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

কোন দেশের তথা সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো বিবেচনা করে সেই দেশের আইন প্রণীত হয়। অর্থাৎ আইন সমাজ নির্ভর। তাই একথা স্পষ্ট করেই বলা যায়, সমাজের বিশেষ কোন পরিবর্তন হলে আইনের পরিবর্তন আবশ্যক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ইউরোপে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রে কৃষকদের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু আধুনিক সময়ে সামন্ততন্ত্র বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা অনেক অধিকার লাভ করে। সুতরাং সমাজের পরিবর্তন আইনের পরিবর্তনের সূচনা করে। কিন্তু, কোন কোন সময়ে আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন—আইন করে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

অর্থাৎ, ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল সমাজ ও আইন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজের পরিবর্তনে আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন। এবং বিশেষ প্রয়োজনে আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের রীতি-নীতির ওপর বাধা আরোপ করে সামাজিক পরিবর্তন আনা হয়।

১.৬ আইনের অনুশাসন (Rule of Law)

প্রথাগত আইন না মানলে মানুষ সামাজিকভাবে নিন্দিত হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের শাসন না মানলে শাস্তির বিধান থাকে। দেশের সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইন থেকেই সঞ্জাত। কোন কোন দেশে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী আইনের অতিরিক্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। আধুনিক যুগের লক্ষ্য হল একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল নাগরিকের ওপর একই ভাবে আইন প্রয়োগ করা। অধ্যাপক ডাইসির মতে—"আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান।" আইনের অনুশাসন বলতে মধ্যযুগীয় ধারণায় বলা হয়—"আইনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ।" এর দ্বারা সরকার, আইন প্রণেতা ও সাধারণ নাগরিক সকলেই নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ডাইসি (A. V. Dicey) ছিলেন আইনের অনুশাসনের অন্যতম প্রবক্তা। 1885 সালে সাংবিধানিক আইনের উপর বক্তৃতামালায় এই মতবাদ প্রকাশিত হয় এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে 1920 সালে লর্ড চ্যান্সেলার একটি কমিটি গঠন করেন যার কাজ ছিল এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং রক্ষাকবচ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা।

আইনের অনুশাসন বিষয়ে ডাইসির তত্বগুলি নিম্নরূপ :

১। **বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের বিলুপ্তি**—এতে সরকার ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকারের ক্ষমতা লোপ করে প্রতিটি মানুষের ন্যায় বিচার পাবার কথা বলা হয়েছে। এই অনুশাসন অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আইনের চোখে দোষী প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইন দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়া।

২। **আইনের চোখে সকলের সমান অধিকারের তত্ব**—এই তত্বে বলা হয়েছে আইনের ওপরে কেউ নেই। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির গতিবিধি, পদমর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রের সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের বিচারাধীন। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও সাধারণ নাগরিকের মতই আইন মান্য করবে এবং আইন লঙ্ঘন করলে তাদেরও শাস্তি হবে। এইভাবেই জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার।

৩। **কোন দেশের সংবিধান মূলত তার নিজস্ব আইনি কার্যাবলী নির্ধারণ করে**—কোন দেশের সংবিধান বিদেশি কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্তব্য নির্ণয় করাই হল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য এবং তা করা হয়ে থাকে দেশের প্রচলিত আইন ও বিচারালয়ের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই। সংবিধান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা মূলত আইনের অনুশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান থেকেই উপলব্ধি হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে শাসন ও শাসিত সকলেরই সমভাবে আইনের অধীন হওয়া কাম্য—সেটাই আদর্শ আইনের শাসন।

মন্তব্য : উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী সকল ব্যক্তি বা শ্রেণী বিচারালয়ে একই সুবিধা পায়। কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী অন্যকারোর থেকে অধিক সুবিধা ভোগ করে না। আইন সকল নাগরিকের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের অনুশাসনের আদর্শ ও বাস্তবরূপ দুই-ই বজায় রাখতে হলে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সমালোচনা : "আইনের অনুশাসন" বিষয়টি বর্তমানে নানারকম সমালোচনার নিরীখে বিবর্তনের পথে। এই মতের সমালোচকদের মধ্যে স্যার আই, জেনিংস (I. Jennings), এইচ. ল্যাস্কি (H. Laski) এবং ডব্লিউ. এ. রবসন (W. A. Robson) এর নাম অগ্রগণ্য। এঁদের সমালোচনা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়, তা হল—

১। **প্রশাসনিক আইনের উদ্ভব**— শাসন তান্ত্রিক কারণে ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার জন্য সরকারি দফ্তরগুলি বহু নতুন নতুন নিয়ম প্রণয়ন করেছে। এগুলি তিন প্রকার। প্রথমত, শাসনতান্ত্রিক আইন (Administrative Law), দ্বিতীয়ত, বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative Power) এবং তৃতীয়ত, স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা (Discretionary Power) অর্থাৎ আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার তত্ব প্রশাসনিক জটিলতায় উপেক্ষিত হয়ে থাকে এবং শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে—উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থার সাহায্যে সরকার বিশেষ ক্ষমতা উপভোগ করে থাকে।

২। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের উদ্ভব**— প্রফেসর ল্যাস্কির মতে দেশের সম্পদ যতদিন না জনগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে, ততদিন 'আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান'—এই নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ, সম্পদশালী মুষ্টিমেয় ধনীরাই দেশের প্রশাসন ও বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াটির উপর প্রভাব

বিস্তার করতে সমর্থ। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণী বঞ্চিত হয়ে থাকে—কাজেই, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক অসমত্ব বজায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত 'আইনের চোখে সাম্য' কথাটি অর্থহীন। তবে, অর্থনৈতিক সাম্যের সঙ্গে সামাজিক ও সাংবিধানিক সাম্যও প্রয়োজন।

৩। **আইনসভার সর্বময় ক্ষমতা**—এ বিষয়ে ইংল্যান্ড ও ভারতীয় আইন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। ইংল্যান্ডের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সে দেশের সাধারণ আইন থেকে উদ্ভূত। কিন্তু, ভারতবর্ষে লিখিত সংবিধানে জনসাধারণের অধিকারগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে, একথা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে আইনের প্রণয়ন ও সংশোধন করার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার হাতেই ন্যস্ত। এর অর্থ—সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া। সংসদ প্রণীত আইনের নির্দেশিত পথেই বিচারালয়গুলি বিবাদের নিষ্পত্তি করে থাকেন এবং প্রয়োজনে মন্তব্য করে থাকেন। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার হাতেই থাকে।

ডাইসির মতের উপরোক্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকৃত হয় যে, রাজনৈতিক দলসমূহ ও আমলাতান্ত্রিক দলের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব, অর্থনৈতিক অসম বন্টন ও সংসদীয় ক্ষমতার যদি সুসামঞ্জস্য বিধান করতে হয়, তবে ডাইসির মতবাদ অনুসারে আইনের শাসন মান্য করে "সকলের জন্য সমান অধিকার" প্রতিষ্ঠা করার বিধানই হচ্ছে আদর্শ মতবাদ।

১.৭ বাণিজ্যিক আইন (Commercial or Mercantile Law)

যে কোন রাষ্ট্রেই ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প বর্তমান থাকে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপেই ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য সেই রাষ্ট্রে সুনির্দিষ্ট কোন আইন বর্তমান থাকে যা ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লেনদেন নিয়ন্ত্রন করে। সুতরাং বাণিজ্যিক আইন বলতে আমরা আইনের সেই শাখাকেই বুঝি যার দ্বারা মানুষের ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাচীনকালে হিন্দু বাণিজ্য ছিল মূলত প্রথাভিত্তিক। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রভাবে বাণিজ্যিক আইনগুলি আরও নির্দিষ্ট ও লিখিত ভাবে প্রচলিত হয়। যেমন 1932 সালে অংশীদারী আইন, 1930 সালে পণ্য বিক্রয় আইন, 1881 সালে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, 1872 সালের চুক্তি আইন, 1926 সালের শ্রমিকসংঘ আইন ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক মামলা সম্পর্কে কলকাতা হাইকোর্টের নিয়মাবলীতে একটি ধারায় বলা হয়েছে যে, "ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও বণিকদের মধ্যে সাধারণ লেনদেন সম্পর্কিত বিরোধ হল বাণিজ্যিক মামলার বিষয়বস্তু। ইহা বিন্ন দলিলপত্র তৈরি, পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানি, পণ্যের ভাড়া, স্থলপথে পণ্য প্রেরণ, বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিনিধিত্ব ও বাণিজ্যিক রীতিনীতি এবং এই সকল লেনদেন বাবদ দেনাও বাণিজ্যিক মামলার বিষয়-বস্তু।"

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত সকল বিরোধই বাণিজ্যিক মামলার অন্তর্গত। এই সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য যে সকল আইনের প্রয়োজন হয়, তার প্রতিটি বিষয় বাণিজ্যিক আইনের আওতায় পড়ে।

১.৭.১ ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎস

ভারতীয় বাণিজ্যিক আইন ভারতীয় আইন পরিষদ প্রণীত আইন, বিচারপতিগণের রায়, বৃটিশ বাণিজ্যিক আইন ও ভারতীয় বাণিজ্যিক রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎসগুলি মূলত পাঁচ প্রকার—

(১) প্রথা ও রীতিনীতি : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সেই দেশের প্রথাগুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। ভারতেও বিভিন্ন বিচারের প্রয়োজনে সুপ্রাচীনকাল থেকেই চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার যৌক্তিকতা নিরূপণের সময় কয়েকটি বিষয় বিচার্য। যেমন- (১) সুনিশ্চিয়তা, (২) যৌক্তিকতা, (৩) প্রচলিত আইনের অবিরোধিতা এবং (৪) সর্বজন গ্রাহ্যতা। ব্যবসায়ীগণ বহু প্রথা মেনে চলেন। এরূপ প্রথা ও রীতিনীতি সমূহ কোন আইনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও পালনীয় হয়, যদি উহা প্রাচীন ও যুক্তিপূর্ণ হয় এবং কোন লিপিবদ্ধ আইনের বিরোধী না হয়। যখন কোন আদালত এরূপ প্রথা বা রীতিনীতি সমূহ মেনে নেন, তখন সেগুলি বাণিজিযক আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

(২) প্রাচীন আইন প্রণেতাগণের লিখিত আইনশাস্ত্র : প্রাচীন ভারতে প্রণীত মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির নির্দেশ বর্তমান কালেও বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যায় গৃহীত হয়ে থাকে। মুসলিম ধর্মেও ধর্মপ্রণেতা গণের নির্দেশ মুসলিম আইনকে প্রভুত প্রভাবিত করে থাকে। আধুনিককালে আইনপরিষদই আইনের প্রধান উৎস। ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী এবং তারা ব্যাপকভাবে এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের অধিকাংশই আইন পরিষদ প্রণীত বিধি ও অধিনিয়ম।

(৩) বৃটিশ বাণিজ্যিক আইন : বিভিন্ন দেশের আইনে অন্যান্য দেশের আইনের প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক আইনে ইংল্যান্ডের আইনের প্রভাব সমধিক লক্ষণীয়। আইন পরিষদ প্রণীত বিধি ও বিচারকের রায়ের মাধ্যমে বৃটিশ বাণিজ্যিক বহু নিয়মাবলী ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনে পরিণত হয়েছে।

(৪) বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত : বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন বিচারের রায় দানের সময় আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং তাদের সুচিন্তিত মন্তব্য করেন। পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যা ও মন্তব্যগুলি ঐ ধরনের মামলার নিষ্পত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের 141 ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের (সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়) প্রদর্শিত আইনের ব্যাখ্যা ও মন্তব্য নিম্নতর আদালতের ক্ষেত্রে মানা বাধ্যতামূলক। 1934 সালের 'গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে'র 211 ধারা (বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের 225 ধারা) ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত যদি না সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কর্তৃক পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়, তবে বিভিন্ন হাইকোর্টের পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত মান্য করা অত্যাবশ্যকীয়।

(৫) বিধিবদ্ধ আইন : আধুনিকযুগে বিধিবদ্ধ আইনেরই মূল প্রধান্য। আইনসভা বা সংসদ বিভিন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে—এই আইন সংবিধান অনুযায়ী আইনকর্তাদের নির্দেশিত পথে সমাজকে পরিচালিত করে। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে এই ধরনের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়াও আদালতের ব্যাখ্যা, বিশিষ্ট আইনবিদের মন্তব্য ও আধুনিকতার প্রয়োজনে অনেক আইন প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন-ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ফেমা, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য।

১.৮ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- আইনের ধারণা;
- আইন কীভাবে সৃষ্টি হল;
- সমাজের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক;
- সমাজের ওপর আইনের নিয়ন্ত্রণ;
- আইনের অনুশাসনের ধারণা;
- বাণিজ্যিক আইন ও তার বিষয়বস্তু;
- বাণিজ্যিক আইন কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

১.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) আইনের সংজ্ঞা দিন।

(২) আইনের যেকোন দু'টি উদ্দেশ্য বলুন।

(৩) সমাজের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক কী?

(৪) বাণিজ্যিক আইন কী?

(৫) ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের কয়েকটি উৎসের নাম লিখুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) আইনের অনুশাসন তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(২) সমাজ ও আইনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করুন।

(৩) বাণিজ্যিক আইনের সংজ্ঞা দিন। ভারতীয় বাণিজ্যিক আইনের উৎসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-২০০১

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ ক ❑ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা

গঠন

২.ক.১ উদ্দেশ্য

২.ক.২ প্রস্তাবনা

২.ক.৩ চুক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা

২.ক.৪ চুক্তির সংজ্ঞা

২. ক.৫ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান

২. ক.৬ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ

২. ক.৭ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা

- ২. ক.৭.১ নাবালক
- ২. ক.৭.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি
- ২. ক.৭.৩ জড় বুদ্ধি
- ২. ক.৭.৪ পানোন্মাত্ততা
- ২. ক.৭.৫ উন্মত্ততা
- ২. ক.৭.৬ অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি

২. ক.৮ সারাংশ

২. ক.৯ অনুশীলনী

২ক.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.ক.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা লাভ করবেন—

- চুক্তি আইনের প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ চুক্তি আইন থাকার সুবিধা, বা না থাকলে কী অসুবিধা হত;
- চুক্তি সম্পর্কে ধারণা?
- চুক্তি বৈধ হতে গেলে কোন কোন উপাদান থাকা আবশ্যক;
- চুক্তির প্রকারভেদ;
- কারা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের ভূমিকা।

২.ক.২ প্রস্তাবনা

আদালতের মাধ্যমে যে সকল চুক্তি বলবৎ করা যায়, তাই চুক্তি আইনের অন্তর্গত। চুক্তি আইনের পরিধি ব্যাপক। বাণিজ্যিক আইন অনেকাংশে চুক্তি আইনের অন্তর্গত। কারণ বাণিজ্যিক লেনদেন সমূহ চুক্তি আইনের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। কোন চুক্তিকে আইন দ্বারা বলবৎ করতে হলে নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্তপূরণ করতে হয়। এই সকল শর্তগুলিকে 'চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান' বলে। চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি যথাক্রমে-প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, আইনসঙ্গত প্রতিদান, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়, সম্পাদনের সম্ভাব্যতা, সরাসরি বাতিল সম্মতি, বিষয়বস্তুর বৈধতা, নিশ্চয়তা ও লিখন এবং নিবন্ধন। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সবক'টি উপাদান থাকা আবশ্যক। এগুলির মধ্যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে সম্মতি কার্যকরী হয়' না। সুতরাং যে সম্মতিতে উপরের সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকে তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম উপাদান হল 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা'। কোন ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, অথবা তার মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকে, এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী যদি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হয়। সুতরাং চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ও চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

২.ক.৩ চুক্তি-আইনের প্রয়োজনীয়তা

আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করানো যায়, এমন চুক্তিগুলি চুক্তি-আইনের আলোচ্য বস্তু। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং শিল্প ও বাণিজ্যে চুক্তি আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্যালমণ্ডের মতে চুকি হল সেই সম্মতি যা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে দায় সৃষ্টি করে এবং তার প্রকৃতি বর্ণনা করে। অ্যানসন-এর মতে আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত সম্মতিই চুক্তি। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। ভারতীয় চুক্তি আইনের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তি হল সেই সম্মতি যা আইন দ্বারা বলবৎ করানো যায়।

চুক্তি থেকে কীভাবে বিভিন্ন পক্ষের দায় সৃষ্টি হয় তা আমরা নীচের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। মনে করা যাক, একজন বাড়ির মালিক তাঁর বাড়িটি 5 লক্ষ টাকার বিক্রি করার চুক্তি করেন। এখানে বাড়ির মালিকের দায় বাড়ির দখল দেওয়া, অন্যদিকে ভাবী ক্রেতার দায় 5 লক্ষ্য টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে, শর্তগুলি পালিত হলে, তবেই চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয়। আরও একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক, 'ক' নামক এক ব্যক্তি 'খ' নামক অপর এক ব্যক্তিকে 400 টাকায় একটি কুকুর বিক্রয় করার চুক্তি করলো। এক্ষেত্রে 'ক' এর দায় হল কুকুরটি 'খ' কে দেওয়া। আর 'খ' এর দায় হল 'ক' কে 400 টাকা দেওয়া।

২.ক.৪ চুক্তির সংজ্ঞা

চুক্তি অধিনিয়মের 2(h) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায় এরূপ সম্মতিকে চুক্তি বলে। "An agreement enforceable by law is a contract"–2(h)। উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, চুক্তিতে অবশ্যই একটি সম্মতি থাকবে ও সম্মতিটিকে আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে।

সম্মতির দ্বারাই চুক্তি তৈরি হয়। অ্যানসনের মতে আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত সম্মতিই চুক্তি। এই সম্মতির মাধ্যমে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাজ করা বা কাজ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার লাভ করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সকল সম্মতিকেই কিন্তু আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। উদাহরণ য়িে ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে শ্যামকে নিমন্ত্রণ করল। শ্যাম রামের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে বলে সম্মতি প্রকাশ করল। শ্যাম অনিবার্য কারণবশত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তা বলে শ্যামের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এই ধরনের প্রতিদানহীন সামাজিক ব্যাপার আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সম্মতি থাকলেই সকল সময় চুক্তি সংঘটিত হয় না। অর্থাৎ, যে সম্মতি আইনের দ্বারা বলবৎ করা যায়, তাকেই চুক্তি বলে। রাম তার বিয়ে উপলক্ষ্যে একটি দোকানের সঙ্গে খাবার সরবরাহের জন্য অর্ডার দেয়। দোকানদার এক্ষেত্রে তার সম্মতি প্রকাশ করল। এই প্রতিশ্রুতি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় এবং এটি চুক্তি। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি,—"সকল চুক্তিই সম্মতি, কিন্তু সকল সম্মতি চুক্তি নহে"।

২.ক.৫ চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান

কোন সম্মতি নির্দিষ্ট কিছু শর্তপূরণ করলে তখন তাহা আইনের দ্বারা বলবৎ যোগ্য হয়। এই শর্তগুলিকে বলা হয়, "চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদান।" নীচে শর্তগুলি আলোচনা করা হল—

(১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতি—চুক্তির প্রধান উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। অর্থাৎ একপক্ষ প্রস্তাব দেবে ও অপর পক্ষ উহার স্বীকৃতি দেবে। এক পক্ষের প্রস্তাব অপরপক্ষ যদি স্বীকৃতি দেয় তবেই চুক্তির উৎপত্তি হয়। তবে চুক্তি হতে গেলে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া চাই।

(২) যোগ্যতা —সকল ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম নয়। চুক্তি সম্পাদন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যে সকল যোগ্যতার দ্বারা কোন ব্যক্তি বৈধ চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম সেগুলিকে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলে। কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা সাধারণত তিনটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। যথা—(১) তাঁকে সাবালক হতে হবে, (২) তাঁকে সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে ও (৩) তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের বিধান অনুযায়ী তাঁর চুক্তি করার অধিকার থাকতে হবে।

(৩) আইনসঙ্গত প্রতিদান—চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দু'টি পক্ষ থাকে- প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে কিছু দেবে বা অপর পক্ষের থেকে কিছু নেবে। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায় বা দেওয়া হয় তা হল চুক্তির প্রতিদান। প্রতিদান ব্যতীত কোন চুক্তিই প্রবর্তন-

যোগ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি আমরা পরে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করব। তবে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় প্রতিদান নীতি বর্হিভূত বা অবৈধ হলে চুক্তি বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ চুক্তির ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত প্রতিদান থাকা আবশ্যক।

(৪) **আইনমূলক সম্পর্ক**—যে চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় তাকে বৈধ চুক্তি বলে। বৈধ চুক্তিতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। অন্যথায় সেই চুক্তি বৈধ হয় না। যেমন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেবার প্রতিশ্রুতি অথবা বন্ধুর বিয়েতে থাকার প্রতিশ্রুতি আইনদ্বারা কোন মতেই বলবৎ করানো যায় না। কারণ এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো আইনমূলক সম্পর্ক নেই। কিন্তু বন্ধুকে বাড়ি বিক্রয়ের সম্মতি অথবা বন্ধুকে বিবাহ করবার সম্মতির ক্ষেত্রে বৈধ চুক্তি সংঘটিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে আইনমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়।

(৫) **স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়**—চুক্তিতে সায় সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রদত্ত হতে হবে। চুক্তির সময় যদি বল প্রয়োগ (coercion), অনুচিত প্রভাব (undue influence), ভুলে বোঝানো (misrepresentation) বা প্রতারণা (fraud) করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সম্মতিতে প্রকৃত সায় নেই বলে মনে করতে হবে। অর্থা যে চুক্তিতে বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, ভুল বোঝানো বা প্রতারণা মূলক সম্মতি আদায় করা হয়েছে তা আদালতে বলবৎ করানো যায় না।

(৬) **বৈধ বিষয়বস্তু**—সম্মতির বিষয়বস্তু কখনোই অবৈধ, অনৈতিক বা জনগণের স্বার্থের বিরোধী হবে না। সম্মতি অবৈধ, নীতিবহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী হলে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না।

(৭) **সম্পাদনের সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা**—চুক্তির মধ্যে কোনরূপ অনিশ্চয়তা থাকলে উহাকে বৈধ চুক্তি বলে ধরা যায় না। যদি চুক্তির অর্থ অলীক হয় বা স্পষ্টভাবে বোঝা না যায় তাহলে উহাকে আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। চুক্তি সম্পাদনযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। অসম্ভব কোনো কাজ করার প্রতিশ্রুতি কখনো বেধ চুক্তি হতে পারে না।

(৮) **বাতিল সম্মতি**—কোনো কোনো সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে তা দেশের আইনে অবৈধ বলে মনে করা হয়। যে সম্মতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হলে আইন দ্বারা অবৈধ বলে মনে করা হয়, চুক্তিতে সেই ধরনের কোন সম্মতি থাকলে আইন প্রবর্তিত করা যাবে না। ভারতীয় চুক্তি আইনে পাঁচ ধরনের সম্মতি অবৈধ বলে ঘোষিত। যেমন—

- বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (26 ধারা);
- বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (27 ধারা);
- মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি (28 ধারা);
- অনিশ্চিত সম্মতি (29 ধারা);
- বাজী ধরার সম্মতি (30 ধারা);

(৯) **লিখন ও নিবন্ধন**—চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয়, যথা জমি, বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত দলিলকে বৈধ রূপ দিতে হলে নিবন্ধন (Registration) দরকার হয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে, কোনো বৈধ চুক্তিতে উপরোক্ত সবকটি উপাদান থাকা আবশ্যক। উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না।

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি
- যোগ্যতা
- আইনসঙ্গত প্রতিদান
- আইনমূলক সম্পর্ক
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়
- বৈধ বিধয়বস্তু
- সম্পাদনের সম্ভাব্যতা ও নিশ্চয়তা
- বাতিল সম্মতি
- লিখন ও নিবন্ধন

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আলাদা ভাবে আলোচনপা করার পূর্বে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এমন কতগুলি শব্দ যেমন নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি আলোচনায় আসবে, সেগুলি তাই আগে থেকে জেনে রাখা ভাল।

২.ক.৬ চুক্তির শ্রেণীবিভাগ

চুক্তিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়—

১। আইনের বৈধতা অনুযায়ী
- বৈধ চুক্তি
- নিষ্ফল চুক্তি
- বালিত সম্মত্তি
- নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি
- অবৈধ সম্মতি
- অপ্রবর্তনযোগ্য চুক্তি

২। গঠন অনুযায়ী
- ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি
- ধারণামূলক বা বিবক্ষিত চুক্তি
- উপচুক্তি

৩। সম্পাদনের ধরন অনুযায়ী

- সম্পাদিত চুক্তি
- সম্পাদ্য চুক্তি
- এক পক্ষীয় চুক্তি
- দ্বিপাক্ষীক চুক্তি

১। আইনের বৈধতা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

আইনের বৈধতা অনুযায়ী চুক্তিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাবে ভাগ করা যায়।

- **বৈধ চুক্তি** : যে চুক্তি আইনের 10 নং ধারার আইনগত আবশ্যিকতা গুলি মেনে চলে, তাকে বৈধচুক্তি বলে। বৈধ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তন যোগ্য ও বলবৎযোগ্য।

- **বাতিল সম্মতি** : যে সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না তাই বাতিল সম্মতি 12(g) ধারা]। বালিত সম্মতির ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রভাব নেই। এর ফলে কোন ব্যক্তির ওপর কোন অধিকার বা দায় বর্তায় না। এই ধরনের সম্মতি যার আইনগত কোন প্রভাব নেই তা প্রথম থেকেই বাতিল (void abinition)।

উদাহরণ : নাবালকের সঙ্গে চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল। বিবাহে বাধা দান করার সম্মতি, ব্যবসায় বাধা দান করার সম্মতিও বাতিল সম্মতি।

- **নিষ্ফল চুক্তি** : যে চুক্তি আইন দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয় তা অবৈধ চুক্তি—2(j) ধারা। চুক্তি গঠনের সময় এটি আইনের দিক থেকে প্রবর্তনযোগ্য থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কারণে আইনগত দিক থেকে অপ্রবর্তনযোগ্য হয়ে পড়ে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে বিবাহ করার প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত কারণে 'ক' এর মৃত্যু হল। এই ক্ষেত্রে এটি নিষ্ফল চুক্তি।

- **নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি** : যে সম্মতি কোন এক পক্ষের সম্মতির দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য হয়, কিন্তু অপর পক্ষের দ্বারা প্রবর্তনযোগ্য নয়, এমন সম্মতিকে নিষ্ফলযোগ্য চুক্তি বলে।

উদাহরণ : 'ক' বলপ্রয়োগ করে 'খ' কে তার ঘোড়াটি বিক্রয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনযোগ্য হবে। অন্যথায় চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় হবে।

- **অবৈধ সম্মতি** : যে সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান ভারতীয় প্রচলিত আইন অমান্য করা, প্রতারণা করা, কোন ব্যক্তি বা তার সম্পতির ক্ষতি করা, জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করা—তাকে অবৈধ সম্মতি বলে।

উদাহরণ : খুন বা ডাকাতি করার সম্মতি, দেশ বিরোধী কোন কাজ করার সম্মতি অবৈধ সম্মতি।

- **অপ্রবর্তনীয় চুক্তি** : যে চুক্তিতে কৌশলগত (technical) ত্রুটি থাকার জন্য আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় না তাকে অপ্রবর্তনীয় চুক্তি বলে।

উদাহরণ : আইনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু বাহ্যিক শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। যেমন— কোন্ চুক্তি লিখিত হওয়া প্রয়োজন, অথবা চুক্তি নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন অথবা উপযুক্ত স্ট্যাম্প থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি আইনের দ্বারা প্রবর্তন করা যায় না।

২। আইনের গঠন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

• **ব্যক্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি :** আইনের 9 নং ধারা অনুযায়ী যখন কোন প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব বা স্বীকৃতি মুখে বলে বা লিখে করা হয়, তাকে প্রকাশ্য চুক্তি বলা হয়।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর সঙ্গে লিখিত ভাবে বাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল। ইহা প্রকাশ্য চুক্তি।

• **ধারণামূলক চুক্তি :** যখন কোন ব্যক্তির আচরণ থেকে চুক্তির জন্ম হয় তখন তাকে ধারণামূলক চুক্তি বলে।

উদাহরণ : 'ক' একটি মিষ্টির দোকান থেকে কিছু মিষ্টি খেলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আচরণ দ্বারা ধারণামূলক চুক্তির সৃষ্টি হয়েছে যে তিনি দোকানদারকে মিষ্টির জন্য মূল্য দেবেন।

• **উপচুক্তি :** কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও পক্ষেরা চুক্তির ন্যায় আচরণ করে। চুক্তি অধিনিয়মের (68-72) ধারায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি কারো থেকে কিছু পায় এবং সেই জন্য তার কিছু দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তাহলে কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আদালত তাকে উহা দিতে বাধ্য করবেন। এক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তির ন্যায় সম্পর্ক তৈরি হল তাকে উপচুক্তি বলে।

উদাহরণ : চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম কোন ব্যক্তি (বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন কোন ব্যক্তি) কে অন্য কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করেন তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে তার প্রাপ্য পাবে।

৩। সম্পাদনের ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

• **সম্পাদিত চুক্তি :** যখন চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের যা দায় ছিল তা সম্পাদিত করে তখন সেই চুক্তিকে সম্পাদিত চুক্তি বলে।

উদাহরণ : পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য দেবে এবং বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করবে— এই পণ্য বিক্রয় অধিনিয়মের প্রাথমিক শর্ত। যে ক্ষেত্রে নগদে পণ্য বিক্রয় হল সেক্ষেত্রে উভয় শর্তই পালিত হল।

• **সম্পাদ্য চুক্তি :** এই চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষের দায় ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষই চুক্তির ক্ষেত্রে তাদের যা দায় তা বর্তমানে সম্পাদন করে নি, ভবিষ্যতে কোন এক সময় করবে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক অপর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট টাকায় দু'মাস পরে তার বাড়িটি বিক্রয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইহা সম্পাদ্য চুক্তি-এর উদাহরণ।

• **এক পক্ষীয় চুক্তি :** কোন্ কোন চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত এক পক্ষকে তার দায় পালন করতে হয় যখন চুক্তিভুক্ত অন্য পক্ষ ইতিমধ্যে তার দায় পালন করে থাকে। এই ধরনের চুক্তিকে 'একপক্ষীয় চক্তি' বা 'একতরফা চুক্তি' বলে।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি তার প্রিয় একটি কুকুরকে হারিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার প্রিয় কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। 'খ' বিজ্ঞাপন পড়ে

কুকুরটি খুঁজে 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। যে মুহূর্তে 'খ' এই কাজটি সম্পাদন করল সেই মুহূর্ত হতে চুক্তিটি কার্যকর হবে। এবং 'ক' কে তার প্রতিশ্রুতি মত ১০০০ টাকা 'খ' কে দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

• **দ্বিপাক্ষিক চুক্তি :** যে চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উভয় পক্ষেরই দায় বাকি থাকে, অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনের সময় দায় পালন হবে তাকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে। এই চুক্তি অনেকটা সম্পাদ্য চুক্তির মত।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে প্রতিশ্রুতি দেয় ২০০ টাকার বিনিময়ে তার একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে, ইহা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উদাহরণ। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ' এর কোন একদিনের সমস্ত কাজ করে দেবে। এবং বিনিময়ে 'খ' 'ক' কে ২০০ টাকা দেবে।

২.ক.৭ চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা

ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 নং ধারা অনুসারে কোন চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হতে হবে। এই 10 নং ধারা অনুসারে— "চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত সায় দ্বারা গঠিত সকল সম্মতিই চুক্তি।" সুতরাং স্পষ্টতই প্রশ্ন ওঠে 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বলতে কী বোঝায়। 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' বলতে কোন ব্যক্তির সেই সময়কার যোগ্যতা বলতে বোঝায় যেসব গুণ বর্তমান থাকলে কোন একজন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। চুক্তি আইনের 11 নং ধারায় 'চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা' সম্পর্কে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

"প্রত্যেকটি ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক হন এবং তিনি সুস্থ মস্তিষ্কের হন এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হন।"

অন্যভাবে বললে বলা যায়, কোন ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে যদি

- তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন;
- তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকে;
- তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী তিনি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

২.ক.৭.১ নাবালক (Minor)

যে ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জন করেন নি তিনি নাবালক। সাধারণভাবে 18 বৎসর বয়স না হওয়া কোন ব্যক্তি নাবালক থাকেন এবং তিনি কোন রকম চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। 1875 সালের ভারতীয় সাবালকত্ব আইন (Indian Majority Act, 1875) অনুযায়ী—"18 বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে সাবালক বলে গণ্য করা হয় না।"

নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে 21 বৎসর বয়সে সাবালক বলা হয় :—

(ক) যখন আদালত কোন নাবালক অথবা তার সম্পত্তির তত্বাবধানের জন্য অভিভবাক নিযুক্ত করেন, এবং

(খ) যখন নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিপাল্য অধিকরণ (Court of Words) দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে।

নাবালক সম্পর্কিত আইন (Law Relating to Minor) :

নাবালকত্বের জন্য কোন ব্যক্তি চুক্তির ক্ষেত্রে অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে এই আইনটি হলো নাবালকদের আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আইনের 11 নং ধারায় নাবালকদের সম্মতির প্রচেষ্টা ও তার আইনগত ফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে আদালত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রায় বিশেষ উল্লেখ্য। **Mohori Bibee Vs. Dharamdas Ghose (1903)**—এই বিখ্যাত মামলার ঐতিহাসিক রায় ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের সম্মতির প্রকৃতি নির্দেশ করে। বহু ক্ষেত্রে নাবালকদের সম্মতি নিষ্ফল অথবা নিষ্ফল যোগ্য—এই নিয়ে দ্বিধা ছিল। কিন্তু এই বিখ্যাত মামলায় এই প্রশ্নটির সমাধান হয়ে যায়।

ধর্মদাস ঘোষ নামে এক নাবালক 20,000 টাকার একটি সম্পত্তি বন্ধক রেখে বন্ধক গ্রহীতার থেকে, 8,000 টাকা নেয়। পরবর্তীকালে সেই নাবালক বন্ধক রদ (Setting aside) করার জন্য মামলা দায়ের করে। একথা জানতে পেরে বন্ধকগ্রহীতা তার 8,000 টাকা ফেরত চান। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, নাবালক ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত সম্মতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। তাই নাবালককে দেওয়া 8,000 টাকা ফেরত দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্পতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-inition)।

নাবালকের সম্মতি (Minor's agreemet) :

নাবালকের সম্মতি সম্পর্কিত আইনগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) **নাবালকের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল**—নাবালকদের ক্ষেত্রে আইন অভিভাবকের কাজ করে। কারণ, নাবালকদের নিজেদের ভাল-খারাপ বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। তাই আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই নাবালকদের সঙ্গে সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল। নাবালকের সঙ্গে গঠিত সম্মতির দ্বারা সম্মতির সঙ্গে জড়িত কোন পক্ষেরই আইনগত কোন অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না।

(২) **প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নাবালকের দায়**—নাবালককে অথবা তার ওপর নির্ভরশীল কোন নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বা সেবা সরবরাহ করা হয় তাহলে নাবালকের উক্ত দ্রব্য বা সেবার জন্য দায় সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি করতে অসমর্থ এমন কোন ব্যক্তিকে অথবা তিনি যাদেরকে আইনত প্রতিফলন করতে বাধ্য তাদের কে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে থাকেন, তবে তিনি সেই ব্যক্তির (চুক্তি করতে অসমর্থ) থেকে সেই সমস্ত দ্রব্য বা সেবার মূল্য ফেরত পাবেন। তবে এক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়ী থাকবে, সে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ : একজন খাদ্য বিক্রেতা একজন নাবালককে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করেন। ঐ বিক্রেতা নাবালকের সম্পত্তি হতে খাদ্যের উচিত মূল্য পাবে। কিন্তু এরজন্য নাবালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে না।

(৩) **ব্যাক্তিগত ভুলের ক্ষেত্রে নাবালকের দায়**—

কোন নাবালক তার ব্যক্তিগত ভুল বা অপকারের (tort) জন্য দায়ী থাকবে। নাবালক দ্বারা

সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ কে ব্যক্তিগত ভুল বলা যায় না। এই ভুল চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র হবে। তা নাহলে পরোক্ষ ভাবে নাবালক দ্বারা বহু চুক্তিকে আইনদ্বারা বলবৎ করা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়ায় নেয় চড়ার জন্য। এবং ঘোড়াটিকে অনেক বেশি বার চড়ার জন্য ঘোড়াটি ক্ষতি গ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সে চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করেছে। বিচারে স্থির হয় যে, নাবালক যদি চুক্তি সম্পাদনে অবহেলা করে, তবে তাকে দায়ী করা যায় না। অন্য একটি ঘটনায় এক নাবালক একটি ঘোড়া ভাড়া করে চড়ার জন্য, সে প্রতিশ্রুতি দেয় ঘোড়াটি নিয়ে লাফালাফি করবে না। এরপর সে তার এক বন্ধুকে ঘোড়াটি ভাড়া দেয়, সে ঘোড়াটি নিয়ে ভীষণ লাফালাফি করে। এর ফলে ঘোড়াটি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। এখানে নাবালক চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে নি। বরঞ্চ, চুক্তিতে যা বারণ করা ছিল তা-ই করেছে। তাই এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনে নাবালকের ভুলের জন্য সে দায়ী হবে।

(৪) অনুসমর্থন দ্বারা চুক্তি হয় না—

'অনুসমর্থন' কথার অর্থ অনুমোদন করা। নাবালক থাকাকালীন সম্পাদিত কোন সম্মতি সাবালকত্ব অর্জন করার পরে অনুসমর্থন (ratify) করা যায় না। কারণ, নাবালক দ্বারা সম্পাদিত সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল এবং সেই জন্য পরবর্তী কালে সাবালকত্ব অর্জনের পর অনুসমর্থন দ্বারা বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৫) নাবালকের ক্ষেতেত্র স্বীকৃতির বাধা নাই—

"যদি কোন ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিক ভাবে বা তার আচরণের দ্বারা কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অপর কোন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস তৈরি করেন, তবে পরবর্তীকালে সেই ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না। পরবর্তীকালে এই স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এই যে বাধা—ইহাই স্বীকৃতি বাধা (Estoppel)। নাবালকের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর হয় না। কোন নাবালক যদি সাবালকত্বের মিথ্য পরিচয় দিয়ে কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণার দ্বারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, তথাপি তাকে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা যায় না। নাবালক তার নাবালকত্বের অজুহাতে স্বীকৃতি পালন অস্বীকার করতে পারে।

(৬) নাবালক প্রতিনিধি হতে পারে—

কোন নাবালক প্রধান (Principal) ও তৃতীয় পক্ষের (Third Person) মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার কাজের জন্য কোন ভাবেই ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজে প্রধানের নিকট দায়ী থাকবে না। কারণ ভারতীয় চুক্তি আইনের 184 নং ধারায় বলা হয়েছে—"প্রধান ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে যে কেউ প্রতিনিধি হতে পারে। কিন্তু সেই প্রতিনিধি যদি নাবালক হয়, অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন হয় তাহলে তার কাজের জন্য প্রধানের কাছে কোনভাবেই দায়ী করা যায় না।"

(৭) নাবালক দানগ্রাহী হতে পারে—

ভারতীয় চুক্তি আইনে নাবালকদের চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ নাবালকরা চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। কিন্তু দানগ্রাহী (Beneficiary) হবার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই, যেমন—প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (Promisee), পাওনাদার (Payce), অথবা হস্তান্তরগ্রহীতা। এই চুক্তিগুলি নাবালকের ইচ্ছা অনুসারে বলবৎ হবে। কিন্তু কখনোই অন্য পক্ষের ইচ্ছানুসারে ইহা বলবৎযোগ্য হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আইনে সুবিধা বা দান পাবার ক্ষেত্রে নাবালকদের কোন অযোগ্যতা নাই।

(৮) নাবালক দ্বারা অংশীদারী কারবার গঠন—

অংশীদারী আইন অনুযায়ী, অংশীদারদের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক সম্মতির মাধ্যমে অংশীদারী কারবার গঠিত হয়। কিন্তু নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য, তাই সে অংশীদারী কারবারের অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়।

(৯) নাবালক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে পারে—

নাবালক যেহেতু চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম, তাই কোম্পানির সাথে কোনভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং নাবালক কোন কোম্পানির সদস্য হতে পারে না। কোন নাবালক যদি কখনও কোনোভাবে কোম্পানির সদস্য হয়েও যায়, তথাপি কোম্পানি ঐ নাবালকের সঙ্গে লেনদেন রদ করতে পারে এবং কোম্পানির সদস্য তালিকা থেকে তাকে বাদ দিতে পারে।

(১০) নাবালককে দেউলিয়া ঘোষণা করা যাবে না—

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, নাবালককে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা দেওয়া হয় নি। তাই চুক্তি করে কোনভাবে কোন ব্যক্তির থেকে নাবালক ঋণ নিলে পরবর্তীকালে এজন্য নাবালককে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতার জন্য দেউলিয়া ঘোষণা করা যায় না। এমন কি, নাবালককে যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য নাবালকের সম্পত্তিকে দায়ী করা যাবে।

(১১) নাবালকের পিতা-মাতা ও অভিভাবকের স্থান—

নাবালকের কোন চুক্তির জন্য তার পিতা-মাতা কে দায়ী করা যাবে না, এমন কি যদি নাবালককে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা সরবরাহ করা হয়, তাহলেও নয়। কিন্তু পিতামাতা মূল্যবোধের তাগিদে ইচ্ছা করলে নাবালকের কোন আর্থিক দায় পরিশোধ করতে পারেন। কিন্তু ইচ্ছা না করলে তাঁদের জোর করা যায় না।

কোন কোন সময় নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে নাবালকের পিতা-মাতা, বা তার অভিভাবক বা তার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার কোন চুক্তি করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের মধ্যে থেকে নাবালকের প্রতিনিধি হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা নাবালকের ওপর বলবৎ করা যাবে।

(১২) নাবালক জামিনদার হতে পারে না—

কোন নাবালক অপর কোন ব্যক্তির জামিনদার হতে পারে না। কারণ নাবালককে চুক্তির কোন ঘটনার জন্য কোন আর্থিক দায় দ্বারা দায়ী করা যায় না বা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না।

(১৩) শিক্ষানবিশ ও কাজের চুক্তি—

1961 সালের শিক্ষানবিশ আইন অনুসারে এক নাবালক শিক্ষানবিশ হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হতে পারে। তবে নাবালকের বয়স 14 বছরের নীচে হবে না এবং নাবালকের হয়ে তার অভিভাবক চুক্তিবদ্ধ হবেন। এই আইনের দ্বারা নাবালকরা কোন কাজ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এবং যখন তারা পরিণত বয়সে পদার্পন করে, তারা সেই কাজ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ হয়ে যায়।

২.ক.৭.২ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি (Persons of Unsound Mind)

বৈধ চুক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হল এই যে, চুক্তিভুক্ত প্রতিটি পক্ষের চুক্তিবদ্ধ হবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। চুক্তি অধিনিয়মের 11 নং ধারায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য যদি তিনি যে আইনের অধীন সেই আইন অনুসারে সাবালক হয়ে থাকেন, যদি তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে থাকে এবং তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের দ্বারা অযোগ্য বিবেচিত না হন।" সুতরাং, চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য নয়।

এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে "সুস্থ মস্তিষ্ক" বলতে কী বোঝায়। ভারতীয় চুক্তি অধিনিয়মের 12 নং ধারায় 'সুস্থ মস্তিষ্ক" সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"কোন ব্যক্তি যদি চুক্তি সম্পাদন কালে চুক্তির অর্থ বুঝতে পারেন, এবং এই চুক্তির ফলে তার স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বিচার করতে পারেন, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে 'সুস্থ মস্তিষ্ক' বলা হয়।"

এই ধারায় আরও বলা হয়েছে যে,

(ক) "যে ব্যক্তি সাধারণত বিকৃত মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে সুস্থ থাকেন, তিনি যে সময় মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন সে সময় চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন।"

(খ) "যে ব্যক্তি সাধারণত সুস্থ মস্তিষ্ক কিন্তু মাঝে মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন, তিনি যে সময় বিকৃত মস্তিষ্ক থাকেন তখন চুকি সম্পাদন করতে পারেন না।"

সুতরাং, যে সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি জ্বরে বিকারগ্রস্ত, অথবা এমন এক ব্যক্তি যে এতটাই পানোন্মত্ত যে, চুক্তির শর্তাবলী বুঝতে পারেন না এবং চুক্তির ফলে তাঁর স্বার্থের ওপর কী প্রভাব পড়বে তা বুঝতে পারেন না, এরকম বিকারগ্রস্ত বা পানোন্মত্ত অবস্থায় কোন ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য। উপরের আলোচনা থেকে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে দুটি ঘটনা স্পষ্ট হয় :

(১) চুক্তর প্রকৃতি ও শর্তাবলী বুঝতে পারা;

(২) নিজে স্বার্থের ওপর চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি উপরোক্ত শর্তদুটি সিদ্ধ (satisfy) করতে পারেন না, তিনি চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য।

আইনের বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা দেওয়া হয়েছে :—

২.ক.৭.৩ জড়বুদ্ধি (Idiot)

যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং কোন রকম বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা নেই, তাকে জড়বুদ্ধি (Idiot) বলা হয়। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়ার ফলে এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের কোন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা নেই। তাই জড় বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তির অর্থ হবে নিষ্ফল চুক্তি।

২.ক.৭.৪ পানোন্মত্ততা (Drunkenness)

যে ব্যক্তি কোন উত্তেজক পানীয় অথবা মাদক দ্রব্য দ্বারা ভীষণ ভাবে আসক্ত, তাকে পানোন্মত্ত ব্যক্তি বলে। উত্তেজক পানীয় বা মাদক দ্রব্যের প্রভাব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ঐ ব্যক্তির সাময়িকভাবে অক্ষমতার সৃষ্টি হয়। এই নেশার প্রভাব যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে চুক্তির প্রকৃতি ও চুক্তির প্রভাব সম্বন্ধে কোন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বৈধ চুক্তি গঠন করতে পারেন না যতক্ষণ তাঁর মধ্যে পানোন্মত্তা বজায় থাকবে।

২.ক.৭.৫ উন্মত্ততা (Lunacy)

যখন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক ঘটিত কারণে মানসিক চিন্তাধারা বিকল (deranged) বা লোপ পায়, তখন সেই ব্যক্তিকে উন্মাদ বলা হয়। ইহা একধরনের মস্তিষ্ক ঘটিত ব্যধি। এই সময় কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা পুরোপুরি লোপ পায় না। এই ধরনের ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় থাকেন। শুধুমাত্র সেই অবস্থায় তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এবং এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও তাঁর সম্পত্তিকে দায়ী করা যায়। অন্য কোন সময় যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন তখন তিনি চুক্তি ভুক্ত হতে পারেন না।

বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সম্পাদিত চুক্তির ফলাফল (Effects of Agreements made by persons of Unsound Mind)—

ভারতীয় চুক্তি আইনের 11 নং ধারা অনুসারে, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য। অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোন সম্মতি (agreement) করলে তা নিষ্ফল বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্ক কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে বা তাঁর উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি (স্ত্রী, পুত্র) যাদের তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য, তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য চুক্তি করেন, তবে তা চুক্তি অধিনিয়মের 68 নং ধারা অনুসারে উপ-চুক্তি হিসাবে কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন না, ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি এই চুক্তিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

২.ক.৭.৬ অযোগ্য বা অক্ষম ব্যক্তি (Disqualified Persons)

নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ, তাঁরা যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী অযোগ্য বা অক্ষম, তাঁরা চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না।

(১) বিদেশী শত্রু (Alien Enemies)— ভারত ছাড়া অন্য যে কোন দেশের নাগরিককে বিদেশী নাগরিক বলে গণ্য করা হবে। বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় যে কোন ভারতীয় নাগরিক চুক্তি গঠন করতে পারে যদি না ভারতের সঙ্গে ঐ বিদেশী নাগরিকের দেশের যুদ্ধ লাগে। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে চুক্তি বলবৎ যোগ্য। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে বিদেশী

নাগরিকের সঙ্গে গঠিত চুক্তি ঐ দেশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধকালীন সময়ে চুক্তিটি রদ করা যায়। যুদ্ধ শেষ হলে তা পুনরায় বলবৎ করা যায়, যদি না অবশ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

(২) বিদেশী রাজা ও রাষ্ট্রদূত (Foreign Sovereigns and Ambassadors)— বিদেশীয় রাজা ও রাষ্ট্রদূত কে দেশীয় আদালতের নিকট অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু অতীত কালের বিদেশীয় রাজাকে দেশীয় আদালতে অভিযুক্ত করা যায়।

(৩) কর্পোরেশন ও কোম্পানি (Corporations & Companies)— কর্পোরেশন ও কোম্পানি আইনের বিশেষ ধারায় গঠিত 'কৃত্রিম ব্যক্তি'। কোম্পানি তার পরিমেল-বন্ধ (Memorandum of Association)-এ উল্লিখিত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না। একই রকম ভাবে কর্পোরেশন কে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে গিয়ে কর্পোরেশন কোন চুক্তি গঠন করতে পারে না।

(৪) দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি (Convicts)— আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি বিচারে যার মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাস ধার্য করা হয়েছে, তিনি কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তি গঠন করতে পারেন না। কিন্তু যদি দোষী ব্যক্তির শাস্তি যদি মকুব হয়ে যায়, অথবা তার বন্দিদশা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তিনি পুনরায় চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য ব্যক্তি বলে গণ্য হবেন।

২.ক.৮ সারাংশ

এই এককটি ভাল করে পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম

- চুক্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা;
- চুক্তি গঠন করতে হলে কোন্ কোন্ উপাদান থাকা আবশ্যক;
- বিভিন্নভাবে চুক্তির শ্রেণীবিভাগ;
- কারা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- নাবালক কীভাবে চুক্তি গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

২.ক.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(২) চুক্তির আবশ্যকীয় কয়েকটি উপাদানের নাম লিখুন।

(৩) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন?

(৪) চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুল বর্ণনা করুন।

(২) চুক্তির শ্রেণীবিভাগ করুন। সংক্ষেপে প্রত্যেকটি শ্রেণীর চুক্তির বর্ণনা দিন।

(৩) চুক্তি সম্পাদনের অক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৪) টীকা লিখুন—

(ক) নাবালকের সম্মতি; (খ) বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি; (গ) জড়বুদ্ধি; (ঘ) অযোগ্য ব্যক্তি।

২.ক.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ খ ❑ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

গঠন

২.খ.১ উদ্দেশ্য

২.খ.২ প্রস্তাবনা

২.খ.৩ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

২.খ.৪ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি

২.খ.৫ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী

২.খ.৬ স্বীকৃতির সংজ্ঞা

২.খ.৭ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী

২.খ.৮ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন

২.খ.৯ প্রস্তাব প্রত্যাহার

২.খ.১০ স্বীকৃতি প্রত্যাহার

২.খ.১১ সারাংশ

২.খ.১২ অনুশীলনী

২.খ.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

২.খ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- প্রস্তাব সম্পর্কে ধারণা;
- প্রস্তাব জানানোর বিভিন্ন পদ্ধতি;
- বৈধ প্রস্তাব হতে গেলে কোন্ কোন্ নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়;
- স্বীকৃতি সম্পর্কে ধারণা;
- স্বীকৃতি জানানোর বিভিন্ন উপায়;
- বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলীসমূহ;
- প্রস্তাব কখন ও কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;
- স্বীকৃতি কখন ও কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;

২.খ.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম উপাদান হল প্রস্তাব ও স্বীকৃতি। কোন একপক্ষের দেওয়া প্রস্তাব অপর পক্ষ স্বীকার করলে তবেই বৈধ চুক্তির উৎপত্তি হয়। প্রস্তাব ও স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ চুক্তি অধিনিয়মে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্পর্কিত যে সকল নিয়মাবলী আছে, সেই সকল নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। তাই বৈধ প্রস্তাব ও বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী জানা অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তাব সাধারণভাবে দু'প্রকারের হয়ে থাকে— প্রকাশ্য ও ধারণামূলক। চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে চুক্তির অপর পক্ষকে কোন বিষয়ে প্রস্তাব করে থাকেন। যিনি প্রস্তাব করেন তিনি প্রস্তাবকারী। অন্যদিকে যিনি প্রস্তাব গ্রহণ করেন তিনি প্রস্তাব-গ্রহীতা। প্রস্তাবগ্রহীতাও বিভিন্ন উপায়ে তাঁর স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারিকে জানান। প্রস্তাবজ্ঞাপন বা স্বীকৃতিজ্ঞাপন নির্দিষ্টভাবে কোন উপায়ে জানাতে হবে। আবার, নির্দিষ্ট উপায়ে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। সুতরাং, প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে এই এককটি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

২.খ.৩ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি

আগের এককে যখন আমরা চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি, আমরা জেনেছি বৈধ চুক্তি হতে হলে আইনসঙ্গত প্রস্তাব (Lawful offer) এবং আইনসঙ্গত স্বীকৃতি থাকতে হবে। যেমন—'ক', 'খ' কে বলল— "তুমি কি ১০০০ টাকায় আমার গাড়িটি কিনবে?" এটি একটি প্রস্তাব। যখন 'খ' বলল—"হ্যাঁ"। তখন তাকে বলা হয় স্বীকৃতি। এক্ষেত্রে চুক্তি গঠিত হল।

প্রস্তাব : চুক্তি অধিনিয়মের ২(ক) ধারায় 'প্রস্তাব' কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন কাজ করার বা কাজ হতে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন বলা হয় প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করেছে।

যে ব্যক্তি প্রস্তাব দেয় তাকে প্রস্তাবকারি বলে। যে ব্যক্তিকে প্রস্তাব করা হয় তাকে প্রস্তাবগ্রহীতা বলে। প্রস্তাবগ্রহীতা যখন প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে স্বীকৃতি প্রদান করে তখন তাকে স্বীকৃতি দাতা বলে।

প্রতিশ্রুতি : যখন কোন প্রস্তাবে সায় প্রকাশ করা হল তখন বলা হয় প্রস্তাবটি গৃহীত (Accepted) হলো। প্রস্তাব গৃহীত হলে তাকে প্রতিশ্রুতি (Promise) বলে।—২(খ) ধারা।

২.খ.৪ প্রস্তাব করার বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রস্তাব কী ভাবে করা যায় তা আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে। আইনের ৯ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব ব্যক্ত হয় তাকে 'প্রকাশ্য প্রস্তাব' বলে। অনেক সময় প্রস্তাব প্রকাশ্য নাও হতে পারে। ধারণা বা আচরণের দ্বারাও প্রস্তাবের প্রকাশ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকে ধারণামূলক বলে। উদাহরণ দিয়ে নীচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল—

(১) রাম শ্যামকে পঞ্চাশ টাকায় তার বইটি বিক্রয় করার প্রস্তাব দেয়। এটি প্রকাশ্য প্রস্তাব।

(২) সুধীনবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দেন যে তার প্রিয় কুকুরটি যে ব্যক্তিটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে তিনি পাঁচশত টাকা নগদ পুরস্কার দেবেন। এটি একটি প্রকাশ্য প্রস্তাব।

(৩) ভারতীয় রেল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল চালনা করে। নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাত্রীগণকে বহন করবে—ইহাই রেল কোম্পানির প্রস্তাব। যখন কোন ব্যক্তি রেলে ওঠে, তখন বলা হয় ঐ ব্যক্তি ভারতীয় রেলের আচরণমূলক বা ধারণামূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

২.খ.৫ বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলী

প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলী আছে যেগুলি ব্যতিরেকে প্রস্তাব বৈধ হতে পারে না। নিম্নে নিয়মাবলীগুলি আলোচনা করা হল :

(১) প্রস্তাব অন্য পক্ষের নিকট পৌঁছানো প্রয়োজন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব অন্য কোন ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায় সেই ব্যক্তি প্রস্তাবের প্রতি কোন স্বীকৃতি জানাতে পারে না। অর্থাৎ চুক্তিও হয় না। স্বীকৃতি জানানোর আগে প্রস্তাব পাওয়া জরুরি। শুধুমাত্র প্রস্তাব বা শুধুমাত্র স্বীকৃতির দ্বারা চুক্তির হয়না। কোন ব্যক্তি যদি স্বীকৃতির কথা না জেনে যদি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্বীকৃতিদাতা হিসাবে কোন আইনগত অধিকার জন্মে না।

উদাহরণ : 'ক' কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি তার হারনো কুকুরটি খুঁজে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার হিসাবে নগদ ১০০০ টাকা দেবে। 'ক' এর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি 'খ' প্রস্তাবের কথা না জেনেই কুকুরটি 'ক' এর কাছে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে 'খ' পুরস্কারের কথা জানতে পেরে পুরস্কার দাবি করেন। কিন্তু 'খ' যেহেতু প্রস্তাবের কথা জানতেন না, তাই তিনি প্রস্তাবের স্বীকৃতিও জ্ঞাপন করতে পারেন না। তাই এক্ষেত্রে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাই তিনি পুরস্কারের অর্থ পেতে পারেন না।

(২) প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক :

প্রস্তাবের শর্তাবলী সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ চুক্তির মধ্যে এমন কোন শর্ত থাকবে না যা সুনিশ্চিত নয় বা অস্পষ্ট। আইনের ২৭ ধারায় বলা আছে—"যে চুক্তির অর্থ নিশ্চিত নয় বা যে চুক্তি পালন করা সম্ভব নয় তা অবৈধ"। অর্থাৎ প্রস্তাব যথার্থভাবে ও যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে প্রস্তাব দিল যে, ৫০০০০ টাকা অথবা ৬০০০০ টাকা অথবা ৭০০০০ টাকায় তার পাঁচটি বাড়ির কোন একটি বিক্রি করবে। ইহা প্রস্তাব নয়। কারণ এক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ নিশ্চিত নয়। সুতরাং ইহা কোনভাবেই বৈধ প্রস্তাব নয়।

(৩) প্রস্তাব আইনমূলক সম্পর্কস্থাপনে সমর্থ হবে :

প্রস্তাব এমন হওয়া উচিত যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব কখনো এমন হওয়া উচিত নয় যার দ্বারা আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে অত্যাবশকীয় উপাদান হিসাবে আমরা জেনেছি যে, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্কস্থাপন হওয়া জরুরি। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে তার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানাল। এক্ষেত্রে এই সামাজিক

সম্পর্ক কে আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। অর্থাৎ খ যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ভঙ্গের অভিযোগ আনা যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন আইনমূলক সম্পর্ক নেই।

(৪) প্রস্তাব ধণাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে :

চুক্তি অধিনিয়মের ২(ক) ধারা অনুযায়ী যখন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করার বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা প্রকার করে, তখন বা হয় যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে একটি প্রস্তাব দিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন প্রস্তাব কোন কিছু করা বা না করাকে বোঝায়। প্রস্তাব ধনাত্মক হয় যখন কোন কিছু করতে বলা হয়। অন্যদিকে যখন কোন কাজ করতে বারণ করা হয় তখন তা ঋণাত্মক হয়।

(৫) প্রস্তাব কোন একটি ব্যক্তি, বা শ্রেণী অথবা সর্বসাধারণের নিকট হতে পারে :

একটি প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে হতে পারে। যেমন— রাম তার সুন্দর গাড়িখানি ১০০০০ টাকায় হরিকে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এক্ষেত্রে প্রস্তাবটি শুধুমাত্র হরি-ই গ্রহণ করতে পারে। অন্য কারো পক্ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করে চুক্তি গঠন করা সম্ভব নয়।

প্রস্তাব কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেও হতে পারে। যেমন—হিন্দুস্থান কো: লি: তার কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব দিল যে, আগামী সপ্তাহে কোম্পানি খুব কমদামে দুইখানি গাড়ি বিক্রয় করবে। ইচ্ছুক কর্মচারীরা কিনতে পারে। এক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি শুধুমাত্র কর্মচারীদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

প্রস্তাব কখনো কখনো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যে কেউ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। যেমন—রামবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রস্তাব দেয় যে, তার হারিয়ে যাওয়া সুন্দর কুকুরটি যে ব্যক্তি খুঁজে দিতে পারবে তাকে নগদ ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবেন।

(৬) প্রস্তাব করা উচিত স্বীকৃতি পাবার উদ্দেশ্যে :

যখন কোন প্রস্তাব করা হয় তখন প্রস্তাবকারী ইহা আশা করেন যে উক্ত প্রস্তাব কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বীকৃত হবে। প্রস্তাবের শর্তাবলীগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যাতে কোন ব্যক্তির মনে এরূপ সংশয় না থাকে যে এটি কি বৈধ প্রস্তাব, নাকি শুধুমাত্র ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ'—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে 'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবের আমন্ত্রণ' নিয়ে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে তার বাড়িটি ১ লক্ষ টাকার বিক্রয়ের কথা জানান তাহলে ইহা কোন প্রস্তাব নয় যেটা আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। ইহা প্রস্তাবের আমন্ত্রণ। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি তার বাড়ি বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। এবং তিনি ইচ্ছুক খরিদ্দারের থেকে উক্ত বাড়িটি ক্রয়ের প্রস্তাব পাবেন ইহা আশা করেন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি বাড়িটি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেননি, বরং প্রস্তাবের আমন্ত্রণ চেয়েছেন।

পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা থাকে তাকে বিক্রেতার পণয বিক্রয়ের প্রস্তাব বলা যাবে না। বরঞ্চ 'পণ্যতালিকা' অনুযায়ী তিনি খরিদ্দারের নিকট হতে প্রস্তাবের আশা করেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতা খরিদ্দারের প্রস্তাব 'পণ্য তালিকা' অনুযায়ী বিবেচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মাত্র। সুতরাং পণ্য তালিকায় যে দাম লেখা আছে তা প্রস্তাব নয়, প্রস্তাবের আমন্ত্রণ মাত্র।

(৭) শর্তাধীন প্রস্তাব :

কোন প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষ হতে পারে। অর্থাৎ শর্ত পূরণ হলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলা হয়।

অন্যথায় প্রস্তাব গৃহীত হয় না। প্রস্তাবের শর্তগুলি প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে। প্রস্তাবের সমস্ত শতগুলি কোনবাবে প্রস্তাবগ্রহীতাকে যদি জানানো হয় তবে প্রস্তাবকারী পরে শর্ত পূরণের দাবি করতে পারে না। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা নিজের কোন ভুলের জন্য যদি প্রস্তাবের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত না হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবকারীর ইচ্ছা সাপেক্ষে উক্ত শর্তাবলী পালনে বাধ্য থাকবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি একটি রেলওয়ে টিকিট ক্রয় করে। টিকিটের সামনে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল যে "পিছনে শর্তাবলী দেখুন"। শর্তাবলীর মধ্যে এরূপ একটি শর্ত ছিল যে যাত্রীগণ আরোহনকালে কোনভাবে আঘাত পেলে রেলওয়ে কোম্পানি কোনভাবে দায়ী থাকবে না। রেলের দুর্ঘটনার একজন বৈধ আরোহী আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। বিচারে স্থির হল, ঐ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি টিকিটের শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ। তাই এই দুর্ঘটনার জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাবে না। Thomson v. L. M. & S. Rly.

(৮) প্রস্তাবের মধ্যে এমন শর্ত থাকবে না যেটি পালিত না হলে মনে করা হবে যে প্রস্তাব স্বীকৃত হয়েছে :

একজন প্রস্তাবকারি কখনো এমন বলতে পারে না যে, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে যদি প্রস্তাবের স্বীকৃতি জানানো না হয় তাহলে মনে করা হবে যে প্রস্তাবটি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবগ্রহীতা যদি প্রস্তাবকারীর কথা মতো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কোনরূপ উত্তর না পাঠায় তবে কোন চুক্তি গঠিত হয় না। কারণ প্রস্তাবগ্রহীতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা যায় না।

(৯) দু'টি একই রকম বিপরীত-প্রস্তাবের দ্বারা প্রস্তাব হয় না :

যখন দুই পক্ষ নিজেদের অজান্তে একে অপরকে একই রকম প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, তখন তাকে বিপরীত-প্রস্তাব (cross-offer) বলে। বিপরীত প্রস্তাবের অর্থ কখনো এই নয় যে, একজনের প্রস্তাব অপরজন দ্বারা স্বীকৃত হল। প্রকৃতপক্ষে, দুই বিপরীত পক্ষ থেকে একইরকম দুই বিপরীত প্রস্তাবের সাহায্যে কোনরকম প্রকৃত প্রস্তাবই গঠিত হতে পারে না। বিপরীত প্রস্তাব (Cross-offer) তাই নিষ্ফল হয়ে যায়।

২.খ.৬ স্বীকৃতি

যার কাছে প্রস্তাব করা হয়, যখন তিনি প্রস্তাবটিকে সায় প্রকাশ করেন, বা, সম্মতিপ্রদান করেন, তখন বলা হয় প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাব গৃহীত হলে, তাকে প্রতিশ্রুতি বলে। —২(খ) ধারা।

যেমন—রামবাবু তার বাড়িটি তার বন্ধু যদু বাবুকে ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। যদু বাবু উক্ত প্রস্তাবে রাজি হয়ে তার সায় দেন। এক্ষেত্রে রামবাবুর প্রস্তাবটি যদুবাবু দ্বারা স্বীকৃত হল।

প্রস্তাব কে গ্রহণ করতে পারে?

একটি প্রস্তাব কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি বা সেই সকল ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে যাকে বা যার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ, কোন একটি প্রস্তাব সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে, যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে, অন্য কোন ব্যক্তি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু, কোন প্রস্তাব যদি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে থেকে যে কেউ সেই প্রস্তাব করতে পারে। স্বীকৃতিকে বৈধ রূপ দিতে হলে স্বীকৃতিদাতার সায় প্রস্তাবকারীর কাছে অতি অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

২.খ.৭ বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলী

স্বীকৃতি সম্পর্কিত কতকগুলি নিয়মাবলী আছে। কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্বীকৃতিকে আইনত কার্যকরী করতে হলে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে—

(১) স্বীকৃতি সম্পূর্ণ (absolute) ও নিঃশর্ত (Unqualifed) হওয়া আবশ্যক—

স্বীকৃতিকে বৈধ হতে গেলে সেটি অবশ্যই সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত হতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবের অন্তর্গত শর্তগুলির কোনরূপ পরিবর্তন না করেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রস্তাবের শর্তগুলির মধ্যে কোনো একটিরও যদি সামান্যতম পরিবর্তন করেও প্রস্তাবের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তাহলে তা বৈধ চুক্তি হয় না। কোন স্বীকৃতি যদি শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বৈধ স্বীকৃতি বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাবের অর্থ হল প্রতি-প্রস্তাব (counter-offer)।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে তার গাড়িটি ১৫০০০ টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। 'খ' ১২০০০ টাকায় সম্মত হল। বিচারে স্থির হল যে, এটি কোন নিঃশর্ত স্বীকৃতি নয়। তাই কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি।

(২) স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে :

স্বীকৃতি তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতিদাতা তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে জানায়। স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীকে না জানিয়ে যদি নিজের মনের মধ্যেই থেকে যায়, তাহলে স্বীকৃতি বৈধ হয় না। এই ধরনের স্বীকৃতিকে 'মানসিক স্বীকৃতি' বলে। এই ধরনের স্বীকৃতি আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়।

(৩) মানসিক স্বীকৃতি :

যে ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবের স্বীকৃতি প্রস্তাবকারীর কাছে পাঠানো বা জানানো না হয়, সেক্ষেত্রে এই ধরনের নীরব স্বীকৃতির দ্বারা কোন চুক্তি গঠিত হয় না। প্রস্তাবগ্রহীতা যদি নীরব থাকেন, অর্থাৎ কোনভাবে তার স্বীকৃতির কথা প্রস্তাবকারীর কাছে প্রকাশ না পায়, তাহলে সেই স্বীকৃতি বৈধ হয় না।

উদাহরণ : কয়লা সরবরাহের জন্য একটি প্রস্তাব করে রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হয়। ম্যানেজার প্রস্তাবটি অনুমোদন (Approved) করে অফিসের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেন। ভুলবশত সেটি ড্রয়ারেই থেকে যায়। বিচারে স্থির হল কোন চুক্তি হয়নি।

–Brogden Vs. Metropolitan Railway Co. (1877)

(৪) প্রস্তাবকারীর প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে স্বীকৃতি জানাতে হবে—

প্রস্তাবকারী যে ভাবে স্বীকৃতি জানাতে বলেছেন, স্বীকৃতি সেই নির্দেশিত পথেই হতে হবে। এর কোন অন্যথা হলে চুক্তি হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন প্রস্তাবকারী যদি চিঠি দিয়ে স্বীকৃতি জানানোর কথা উল্লেখ করেন, তাহলে প্রস্তাবগ্রহীতা যদি টেলিফোনে স্বীকৃতির কথা জানায় তাহলে প্রস্তাবকারীর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বৈধ হয়, বা হয় না। অর্থাৎ প্রস্তাবকারী এই বলে সম্মতিটি বাতিল করতে পারেন, যে সম্মতিটি নির্দেশিত পথে করা হয় নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুক্ত আইনে প্রস্তাবকারীকে ইচ্ছানুযায়ী স্বীকৃতির পদ্ধতি স্থির করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম মেনেও নিতে পারেন।

(৫) যার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে তিনিই কেবল স্বীকৃতি জানাতে পারেন :

প্রস্তাব যাকে করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন ও প্রস্তাব

সম্পর্কিত স্বীকৃতি জানাতে পারেন। অন্য কোন ব্যক্তি যাকে প্রস্তাব করা হয় নি তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলে তা কখনোই বৈধ চুক্তি হয় না।

(৬) প্রস্তাবের সময় সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে বা প্রস্তাব বাতিল করার পূর্বে সম্মতি জানাতে হবে;

প্রস্তাব সম্মতি জানানোর ক্ষেত্রে যদি কোন সময় সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সম্মতি বাতিল বলে গ্রাহ্য হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন সময় সীমা নেই, সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত (reasonable) সময়ের মধ্যে সম্মতি জানাতে হবে। ঘটনার বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতির উপর যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা নির্ভর করে।

(৭) প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর হিসাবেই স্বীকৃতি জানাতে হবে :

কোন প্রস্তাব না থাকলে তাতে স্বীকৃতি জানানো যায় না। অর্থাৎ, প্রস্তাবের আগে স্বীকৃতি জানানো যায় না। স্বীকৃতি প্রস্তাবের পরেই জানাতে হয়। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—'খ' নামক ব্যক্তি 'ক' এর বাড়িটি কিনবে বলে 'ক' কে তার সম্মতি প্রকাশ করে। যদিও এক্ষেত্রে বাড়ি বিক্রয়ের সম্পর্কে 'ক' এর কোন প্রস্তাবই ছিলো না। তাই 'খ' এর সম্মতি বৈধ নয়।

২.খ.৮ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি কীভাবে জানাতে হবে

প্রস্তাব জ্ঞাতকরণ : একজন প্রস্তাবকারী তাঁর প্রস্তাবকে বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাবগ্রহীতা বা প্রস্তাবগ্রহীতা গণের নিকট জানাতে পারেন। প্রস্তাবকারী যে কোন ভাবেই তাঁর প্রস্তাবকে প্রস্তাবগ্রহীতার নিকট পৌঁছাতে পারেন যার দ্বারা তিনি প্রস্তাবগ্রহীতাকে কোন কিছু কাজ করার বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যাঁর উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে, যখন সেই প্রস্তাবটি তাঁর গোচরে আসে, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল। যখন ডাকযোগে প্রস্তাব করা হয়, প্রস্তাবের চিঠি যখন প্রস্তাবগ্রহীতার হাতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন বলা হয় প্রস্তাব জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হল।

উদাহরণ : রাম তাঁর সুন্দর বাড়িটি শ্যামকে বিক্রয় করবে বলে ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করেন। শ্যাম যখন পত্রখানি পাবেন তখন বলা হবে প্রস্তাব সম্পূর্ণ হল। নচেৎ নয়।

স্বীকৃতি জ্ঞাপন : প্রস্তাবগ্রহীতা কোন কিছু কাজ করে বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থেকে তাঁর স্বীকৃতি জানাতে পারেন।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবগ্রহীতার হাতছাড়া হয় এবং যখন প্রস্তাবকারীর আর কিছুই করার থাকে না। আর, প্রস্তাবগ্রহীতার বেলায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর নিকট পৌঁছায়।

সুতরাং ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে স্বীকৃতির জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি দিক আছে—

(i) প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে এবং

(ii) প্রস্তাবগ্রহীতার ক্ষেত্রে।

উদাহরণ : 'ক' পত্র দ্বারা তাঁর বাড়ি খানি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয়ের জন্য 'খ' কে প্রস্তাব দেন। 'খ' পত্র দ্বারা প্রস্তাবের স্বীকলতি জানান।

প্রস্তাবকারীর কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন 'খ' তাঁর স্বীকৃতির পত্রখানি ডাকে প্রেরণ করেন।

প্রস্তাবগ্রহীতার কাছে স্বীকৃতি জ্ঞাপন সম্পূর্ণ হয় যখন 'খ' এর স্বীকৃতির পত্রখানি 'খ' পাবেন। তার আগে নয়।

২.খ.৯ প্রস্তাব প্রত্যাহার

চুক্তি আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, তা আর গ্রহণযোগ্য থাকে না।

- **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা**— স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাবকারী যে কোন সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রস্তাব বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়ে যায়, তবে সেক্ষেত্রে প্রস্তাব আর বাতিল করা যায় না। সেক্ষেত্রে উহা বৈধ চুক্তিতে পরিণত হয়।

- **সময় উত্তীর্ণ হলে**— প্রস্তাবকারী যদি প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেন, তাহলে সেই সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সময় সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রস্তাব আর গ্রহণ করা যায় না

- **যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে**— যে ক্ষেত্রে প্রস্তাব গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হলে প্রস্তাবটি আর গ্রহণযোগ্য থাকে না, প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। বিষয়ের পরিস্থিত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত সময় সীমা স্থির হয়।

- **মৃত বা উন্মাদ হলে**— প্রস্তাব স্বীকৃতির পূর্বে প্রস্তাব গ্রহীতা যদি জানতে পারেন যে প্রস্তাবকারী মারা গেছেন বা উন্মাদ হয়ে গেছেন, তবে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

- **শর্ত পূরণ না করলে**— প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে যদি কোন শর্ত পূরণের ব্যাপার থাকে, সেই শর্ত পূরণ না হলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

- **প্রতি প্রস্তাব** (Counter-Offer)— কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কোন প্রতি প্রস্তাব করে থাকেন, তাহলে সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যায়।

- **প্রস্তাবগ্রহীতা দ্বারা প্রত্যাখান হলে**— যদি কোন প্রস্তাবগ্রহীতা প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেন, তাহলে সেই প্রস্তাব সেখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রস্তাব একবার প্রত্যাখান করা হলে তা পরবর্তীকালে আর গ্রহণ করা যায় না।

২.খ.১০ স্বীকৃতি প্রত্যাহার

আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবার আগে যে কোন সময়ে স্বীকৃতিদাতা তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন। কিন্তু, স্বীকৃতির সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে গেলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' পত্র দ্বারা 'খ' কে তাঁর বাড়ি বিক্রয়ের প্রস্তাব জানাল। 'খ' স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর পত্রখানি ডাকে পাঠাল। 'খ' তাঁর স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর স্বীকৃতি

সংবাদ প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু, একবার স্বীকৃতির সংবাদ যদি প্রস্তাবকারীর কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহার করা যায় না।

প্রত্যাহার জ্ঞাপন— নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা সম্ভব। স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হলে তা অবশ্যই প্রস্তাবকারীকে জানাতে হবে।

যিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করছেন, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হবে যখন স্বীকৃতি প্রত্যাহারের সংবাদ প্রস্তাবকারী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছাড়া হয়েছে। এর পরে সেই সংবাদের ওপর প্রত্যাহারকারীর আর কোন ক্ষমতা থাকে না। অর্থাৎ, এর পর প্রত্যাহার আর তিনি বাতিল করতে পারেন না।

যাঁর নিকট প্রত্যাহার জানানো হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হয় যখন প্রত্যাহারের সংবাদ তার জ্ঞানগোচরে আসে।

২.খ.১১ সারাংশ

এই এককটি বিস্তারিত ভাবে পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানলাম—

- প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা;
- বৈধ প্রস্তাব ও বৈদ স্বীকৃতির নিয়মাবলী;
- প্রস্তাবের প্রকারভেদ;
- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি জ্ঞাপনের পদ্ধতিসমূহ;
- প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার উপায় সমূহ।

২.খ.১৩ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন

২) প্রস্তাব ও স্বীকৃতির একটি করে উদাহরণ দিন।

৩) ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়?

৪) শর্তাধীন প্রস্তাবের একটি উদাহরণ দিন।

৫) মানসিক স্বীকৃতির সংজ্ঞা দিন।

৬) স্বীকৃতি জ্ঞাপন কখন সম্পূর্ণ হয়?

৭) প্রস্তাব প্রত্যাহারের যে কোন উপায়ের কথা উল্লেখ করুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

প্রস্তাব জ্ঞাপনের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।

২) বৈধ প্রস্তাবের নিয়মাবলীগুলি কী কী?

৩) বৈধ স্বীকৃতির নিয়মাবলীগুলি কী কী?

৪) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলা হয়?

২.খ.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ গ ❑ প্রতিদান এবং উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা

গঠন

২.গ.১ উদ্দেশ্য

২.গ.২ প্রস্তাবনা

২.গ.৩ সংজ্ঞা

২.গ.৪ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী

২.গ.৫ প্রতিদানের নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ

২.গ.৬ চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি

২.গ.৭ উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা

২.গ.৮ সারাংশ

২.গ.৯ অনুশীলনী

২.গ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.গ.১ উদ্দেশ্য

এই একক বিস্তারিতভাবে পাঠ আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- প্রতিদানের সংজ্ঞা;
- প্রতিদানের প্রকারভেদ;
- বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী;
- বৈধ প্রতিদানের নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ;
- চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তির ধারণা;
- উদ্দেশয ও প্রতিদানের বৈধতা;

২.গ.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে আইনসঙ্গত প্রতিদান অন্যতম প্রধান। চুক্তির দুটি পক্ষ থাকে—প্রস্তাবকারী ও প্রস্তাবগ্রহীতা। চুক্তির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষই কিছু দেয় এবং কিছু পায়। চুক্তির জন্য যা কিছু পাওয়া যায়, বা যা কিছু দেওয়া হয়, তাকেই বলে প্রতিদান। কোন কিছু করা, কোন কাজ হতে বিরত থাকা, কোন কাজ করার বা না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে প্রতিদান বলে। চুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। চুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের মধ্যে কোন একটি আইনসঙ্গত না হলে চুক্তি নিষ্ফল হয়ে যায়। অনেক সময় কিছু কিছু চুক্তি প্রতিদান ব্যতিরেকেই সংঘটিত হয়। এগুলি বৈধ

প্রতিদান সম্পর্কিত নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম। এই একক পাঠের মাধ্যমে বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী, প্রতিদান-নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ ও প্রতিদানের বৈধতা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

২.গ.৩ সংজ্ঞা

বৈধ চুক্তির একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্রতিদান। সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রতিশ্রুতি দাতা তাঁর প্রতিশ্রুতি জন্য যা দাবি করেন, তা হল প্রতিদান। চুক্তি নিয়ম অনুযায়ী, বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চুক্তিতে আবদ্ধ প্রতিটি পক্ষই কিছু দেবে এবং কিছু পাবে। যা কিছু দেওয়া হয়, বা পাওয়া যায়, তাকেই প্রতিদান বলে।

Currie Vs. Misa (1875) : একটি বিখ্যাত ইংরেজি মামলার প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহা এক পক্ষের অর্জিত কোন অধিকার, স্বার্থ, লাভ বা উপকার; অন্য পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, অনুমোদিত বা গৃহীত কোন বিরতি, অন্তরায়, ক্ষতি বা দায়িত্ব।"

"a valuable consideration in the sense of the Law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forebearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other."

চুক্তির আইনের ২ (ডি) ধারা অনুযায়ী প্রতিদানের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।— ''প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করেছেন বা কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকছেন, অথবা কোন কার্য করার বা কার্য হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন, তখন এরূপ কার্য বা প্রতিশ্রুতি কে বলা হয় ঐ প্রতিশ্রুতিদাতার প্রতিদান।''

উপরের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে প্রতিদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি স্পষ্ট হয়—

- প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়।
- প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে কোন কিছু করা হয় বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা হয়।
- প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কাজ করেন বা ঐ কাজ করা থেকে বিরত থাকেন।
- এই কাজ করা বা কাজ থেকে বিরত থাকার ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে এমনও হতে পারে, অথবা ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ :—

(১) 'ক' নামক এক ব্যক্তি 10,000 টাকায় তাঁর গাড়ি খানি তাঁর বন্ধু 'খ' কে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এখানে 'ক' এর প্রতিদান হচ্ছে 10,000 টাকা। আর 'খ' এর প্রতিদান হচ্ছে 'ক' এর গাড়ি-খানি।

(২) একটি ঘোড়ার মালিক 1,000 টাকার বিনিময়ে একটি আরোহীকে একদিনের জন্য ভাড়া দিতে সম্মত হন। এক্ষেত্রে ঘোড়ার মালিকের প্রতিদান হল 1,000 টাকা। আর আরোহীর প্রতিদান হল 1,000 টাকার বিনিময়ে একদিনের জন্য ঘোড়াটি ভাড়াতে পাওয়া।

(৩) একজন অফিসের মালিক 1500 টাকা মাসিক মাহিনা দিয়ে একজন কর্মচারী রাখেন। এক্ষেত্রে মালিকের প্রতিদান হবে কর্মচারী দ্বারা প্রদত্ত সেবাকার্য। আর কর্মচারীর প্রতিদান হবে মাসিক 1500 টাকা।

২.গ.৪ বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলী

বৈধ প্রতিদানের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(১) প্রতিদান প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে হতে হবে :

চুক্তি আইনের ২ (ডি) ধারা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছানুসারে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কিছু করেন বা কিছু করা থেকে বিরত থাকেন, তখন তাকে প্রতিদান বলে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছানুসারে যদি কার্য সম্পাদন করা না হয় তাহলে তাকে বৈধ প্রতিদান বলা হয় না। তাই নিজের ইচ্ছানুসারে বা তৃতীয় পক্ষের ইচ্ছানুসারে যদি কোন কার্য করা হয়, বা সেবা প্রদান করা হয়, তবে তাকে বৈধ প্রতিদান বলা যায় না।

উদাহরণ : 'ক' এর বাড়িতে আগুণ লেগেছে দেখে 'খ' আগুন নেভাবে শুরু করেন। কিন্তু 'ক' কখনোই এ ব্যাপারে 'খ' এর সাহায্য চায় নি। 'খ' নিজে থেকেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। তাই 'খ' তাঁর কাজের জন্য 'ক' এর কাছে কোন অর্থ দাবি করতে পারে না।

(২) প্রতিদান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হতে পারে—

চুক্তি আইনের ২ (ডি) ধারা অনুসারে প্রতিদানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে প্রতিদান অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের হতে পারে। প্রতিদানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—". . . . . কোন কার্য করেছেন বা কোন কার্য থেকে বিরত রয়েছেন (অতীত), অথবা কোন কার্য করেন বা কার্য থেকে বিরত থাকেন (বর্তমান), অথবা কোন কার্য করার বা কোন কার্য থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন (ভবিষ্যত) . . . . . ।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিদান তিন রকমের—(ক) অতীত প্রতিদান, (খ) বর্তমান প্রতিদান ও (গ) ভবিষ্যত প্রতিদান।

(ক) অতীত প্রতিদান : প্রতিশ্রুতি করার পুর্বে কোনো পক্ষের প্রতিদান দেওয়া হয়ে গেলে ঐ প্রতিদানকে অতীত প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর একটি মূল্যবান হারানো বই খুঁজে দেন। 'খ' প্রতিশ্রুতি দেন 'ক' কে একটি পেন উপহার দেবেন। এখানে 'খ' এর প্রতিশ্রুতি হল 'ক' এর অতীত প্রতিদানের জন্য।

(খ) **বর্তমান প্রতিদান :** যে প্রতিদান প্রতিশ্রুতির সাথে একই সঙ্গে চলতে থাকে, তাকে বর্তমান বা সম্পন্ন (executed) প্রতিদান বলে।

উদাহরণ : একটি ছাত্র 50 টাকায় দোকান থেকে একটি পুস্তক ক্রয় করলেন। এটি বর্তমান প্রতিদান। এক্ষেত্রে ছাত্রটি 50 টাকার বিনিময়ে প্রতিদান হিসাবে বইটি পেলেন। আর দোকানদার বইটার বিনিময়ে প্রতিদান স্বরূপ 50 টাকা পেলেন।

(গ) **ভবিষ্যত প্রতিদান :** প্রতিদানের তারিখ ভবিষ্যত কালে নির্ধারতি থাকলে তাকে ভবিষ্যত প্রতিদান বা সম্পাদ্য প্রতিদান (Executory consideration) বলে।

উদাহরণ : 'ক' দু'মাস পরে নির্দিষ্ট দামে তাঁর সুন্দর বাড়িটি 'খ' কে বিক্রিয় করতে সম্মত হল। 'খ' দু'মাস পর বাড়িটি ক্রয় করার সময় ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত হয়। এখানে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, যা 'ক' এর প্রতিদান ও বাড়িখানি, যা 'খ' এর প্রতিদান, ভবিষ্যতে দু'মাস পরে হস্তান্তর হবে।

(৩) প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া অনাবশ্যক :

কোন কিছুর পরিবর্তে যা কিছু দেওয়া হয় তা হল প্রতিদান। প্রতিদান হিসাবে যা কিছু দেওয়া হয়, তা আবশ্যিক ভাবে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। কোন চুক্তিকে বৈধ হতে গেলে প্রতিদান পর্যাপ্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ প্রতিদান পর্যাপ্ত ছিল না বলে চুক্তি প্রত্যাহার করা যাবে না। চুক্তি আইনে প্রতিদানের মূল্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত পক্ষদ্বয়ই স্থির করে থাকেন। এক্ষেত্রে যদি অপর্যাপ্ত প্রতিদান স্থির হয়ে থাকে, তাহলেও চুক্তি নিষ্ফল হয় না। আইন দ্বারা চুক্তি বলবৎ যোগ্য হতে গেলে প্রতিদান থাকা আবশ্যক। কিন্তু কখনোই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিদানের প্রয়োজন হয় না।

২৫ ধারার ২ নং ব্যাখ্যা অনুসাবে "যে সম্মতিতে স্বেচ্ছাকৃত সায় আছে, সেই সম্মতি শুধুমাত্র অপর্যাপ্ত প্রতিদানের জন্য নিষ্ফল হয় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিদাতা স্বেচ্ছায় তাঁর সায় দিয়েছেন কিনা, এই ব্যাপারটি বিবেচনা করতে গিয়ে আদালত প্রতিদানের অপর্যাপ্ততা বিচার করে দেখতে পারেন।"

উদাহরণ : 'ক' তাঁর সুন্দর বাড়িখানি (দাম ৫ লক্ষ টাকা) 'খ' কে মাত্র ২ লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে রাজি হলেন। এক্ষেত্রে 'ক' স্বেচ্ছায় তাঁর বাড়িখানি বিক্রি করতে চান। এ ক্ষেত্রে প্রতিদানে অপর্যাপ্ততা থাকলেও সম্মতিটি চুক্তি হিসাবে প্রবর্তনযোগ্য হবে।

(৪) প্রতিদান যথার্থ (real) হওয়া প্রয়োজন : যদিও সম্মতির ক্ষেত্রে প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া আবশিক নয়, তথাপি আইনের চোখে প্রতিদানের কোন মূল্য থাকা দরকার। প্রতিদান মিথ্যা (sham) বা ছলনাময় (illusory) হওয়া চলবে না।

উদাহরণ : ০ 'ক' তাঁর বন্ধু 'খ' কে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি সূর্যের উপর থেকে একটা পাথর এনে দিবে। পরিবর্তে 'খ' এর থেকে 1000 টাকা নেবে। 'খ' তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু 'ক' এর প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, অসম্ভব ও ছলনাময়। কারণ সূর্য থেকে কোন কিছুই আনা সম্ভব নয়।

০ 'ক' তাঁর মূল্যবান গাড়ি খানি বিনা মূল্যে স্বেচ্ছায় 'খ' কে দিতে সম্মত হলেন। 'ক' এর এই প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল। কারণ প্রতিদান না থাকলে কোন চুক্তি হয় না।

(৫) প্রতিদান বিধিসংগত হতে হবে :—

কোন প্রতিশ্রুতিতে প্রতিদান অবশ্যই বিধিসংগত হতে হবে। কোন প্রতিদানকে অবিধিসংগত বলা হবে যদি—

- ০ ইহা নীতি বর্হিভূত হয়, অথবা
- ০ ইহা প্রতারণামূলক হয়, অথবা
- ০ ইহার বিষয়বস্তু যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়, অথবা
- ০ ইহা রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ হয়।

(৬) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন পক্ষের থেকে প্রতিদান আসতে পারে :

প্রতিশ্রুতি দাতা যায় উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি করে থাকেন তিনি হলেন প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা। ভারতীয় আইনে প্রতিদান প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকেও আসতে পারে। কিন্তু

ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে প্রতিদান শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিগ্রহীতার কাছ থেকেই আসতে হবে। অন্যথায় বৈধ চুক্তি গঠিত হয় না।

(৭) প্রতিদান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে?

প্রতিদান বলতে কোন কিছু করা বা কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিদান কোন কিছু করা (ধনাত্মক) বা কোন কিছু না করা কে (ঋণাত্মক) বোঝায়।

(৮) প্রতিশ্রুতিদাতা অতীতে যা করতে বাধ্য ছিল, তা প্রতিদান হতে পারে না :

কোন একজন ব্যক্তি আইনের দ্বারা কোনকিছু করতে বাধ্য থাকতে পারেন, কোন ব্যক্তি যখন তার অফিসের পদমর্যাদ বলে বা আইনের অধীনে কোন কর্তব্য পালন করেন, তখন তা প্রতিদান হিসাবে গ্রাহ্য করা হয় না।

২.গ.৫ "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ

আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদান না থাকলে চুক্তি বৈধ হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৫(১) ধারায় এই নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হয়েছে। নীচে এই ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করা হল—

১। ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি

চুক্তি আধিনিয়মের ২৫(১) ধারা অনুযায়ী—"প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হয় না, যদি না তা লিখিত হয় এবং সেই সময় প্রযোজ্য নিবন্ধন আইন অনুসারে দলিলটি নিবন্ধীকৃত হয় এবং নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তি হয়।"

নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় উপাদানগুলি উপস্থিত থাকলে ভালবাসা ও স্নেহের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদান ছাড়াও চুক্তি বৈধ হয় :

১. চুক্তিটি লিখিত হতে হবে।

২. লিখিত দলিলটি সেই সময়কার প্রচলিত নিবন্ধন আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

৩. চুক্তিটি স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহবশত হতে হবে।

৪. চুক্তিভুক্ত পক্ষ সমূহকে পরস্পরের নিকট আত্মীয় হতে হবে।

উদাহরণ : বিবাদ থাকাকালীন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটি চুক্তি হল। চুক্তিতে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কিছু সম্পত্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি করলেন। চুক্তিটি নিষ্ফ হবে কারণ যখন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সে সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা ও স্নেহ উপস্থিত ছিল না। –Rajlukhy Debee Vs. Bhoothnath (1990)।

২। স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিপূরণ

চুক্তি অধিনিয়মের ২৫(২) ধারা অনুসারে প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি বৈধ হবে যদি "কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় করা কোন কার্যের দ্বারা উপকৃত হয়ে অপর কোন ব্যক্তি যদি তাঁকে পারিশ্রমিক বা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতি দেন তবে তা আইন দ্বারা বলবৎ হবে।"

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর হারিয়ে যাওয়া টাকার থলিটি খুঁজে পেয়ে 'খ' কে ফেরত দিলেন। 'ক' এর স্বেচ্ছায় এই কাজের জন্য 'খ' 'ক' কে 200 টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এটি একটি বৈধ চুক্তি।

৩। **তামাদিদোষে দুষ্ট ঋণ**

চুক্তি আইনের ২৫(৩) ধারা অনুযায়ী তামাদিদোষে দুষ্ট ঋণ আদায় করা যায়। তাই এই ঋণ পরিশোধের প্রতিদানশূন্য প্রতিশ্রুতি (অলিখিত) আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু তথাপি দেনাদার অথবা তার ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এইরূপ ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যদি লিখিত স্বাক্ষরিত কোন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায়।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' এর কাছে 10,000 টাকার জন্য ঋণী আছেন। এই ঋণ তামাদিদোষে দুষ্ট। 'ক' 50000 টাকা দেবেন বলে একটি লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা আইন দ্বারা বলবৎ যোগ্য।

৪। **প্রতিনিধি**—চুক্তি আইনের ১৮৫ ধারা অনুযায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত করার সময় প্রতিদান প্রয়োজন হয় না।

৫। **দান**—২৫ ধারায় ১ নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"দান প্রকৃতপক্ষে হয়ে গিয়ে থাকলে, দাতা ও দানগ্রহীতার মধ্যে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়, তারা এই ধারার কোন অংশের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না।" অর্থাৎ, বৈধ ভাবে কোন একক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে যদি কোন সম্পত্তি দান করে থাকেন, তবে প্রতিদান ছিল না বলে সম্পত্তি ফেরত নেবার দাবি করতে পারেন না।

২.গ.৬ চুক্তি বর্হিভুত ব্যক্তি

যদি প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিশ্রুতিগ্রহীতাকে প্রতিদান বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Starnger to consideration) বলা হবে। একইভাবে, যে ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত নয় তাকে চুক্তি বহির্ভুক্ত ব্যক্তি (Staranger to contract) বলে। চুক্তি বর্হিভুত ব্যক্তি নিজের অধিকার জানানোর জন্য মামলা দায়ের করতে পারে না। কিন্তু প্রতিদান বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হলে চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

চুক্তি-বহির্ভুত ব্যক্তি চুক্তিমূলে নালিশ করতে পারেন না—এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। এই সব ব্যতিক্রমগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

১। **অছি ব্যবস্থা ও বৃত্তিভোগী**—অছি ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা বৃত্তিভোগী কর্তৃক প্রবর্তিত হতে পারে। এই চুক্তিতে, যে ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করেন তিনি চুক্তিভুক্ত পক্ষ হতে পারেন না।

২। **বিবাহ নিষ্পত্তি, বিচ্ছেদ ও পারিবারিক আপোষরফা**—

যখন বিবাহ সংক্রান্ত ঝামেলার নিষ্পত্তি,পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগি ও পারিবারিক বিবাহ-কলহ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, তখন যে সমস্ত ব্যক্তি এক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষভুক্ত হন নাই, তাঁরাও চুক্তি প্রবর্তনের জন্য মামলা করতে পারেন।

উদাহরণ : একটি পরিবারের দুই ভাই পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগির (Partitior) সময়

স্থির করে যে, তাঁরা মায়ের জন্য সমপরিমাণ খরচ করবেন। বিচারে স্থির হল তাঁদের মা তাঁর জন্য ছেলেদের খরচ করার জন্য মামলা করতে পারেন—Shuppu Ammal Vs. Subhramaniyan (1910).

৩। প্রতিনিধির সঙ্গে চুক্তি—

যে ক্ষেত্রে প্রতিনিধির (agent) সঙ্গে কোন চুক্তি হয়, সেক্ষেত্রে প্রধান (Principal) চুক্তি পালনের জন্য মামলা করতে পারেন।

৪। ঋণের দায়ভার স্বীকার করা—

কিছু কিছু সময় চুক্তির এক পক্ষ তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধের কথা স্বীকার করেন বা অন্যথায় নিজেকে তৃতীয় পক্ষের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ ঐ পক্ষের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করতে পারেন।

উদাহরণ : ভাড়াটিয়া 'ক' এবং উপ-ভাড়াটিয়া 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হল যে 'খ' সরাসরি ভাড়া বাড়ির মালিককে দেবে। চুক্তি মতো 'খ' কিছুদিন এইভাবে ভাড়া দেবার পর ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁর ভাড়া বাকি হতে থাকে। বিচারে স্থির হল বাড়ির মালিক অনাদায়ী ভাড়া সরাসরি 'খ' এর থেকে আদায় করতে পারেন। — Kshirod Behari Dutt Vs. Man Gobinda Panda (1933).

২.গ.৭ উদ্দেশ্য এবং প্রতিদানের বৈধতা

কোন সম্মতিকে আইনত গ্রাহ্য হতে হলে তার প্রতিদান ও উদ্দেশ্য উভয়ই আইনসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন, না হলে ঐ সম্মতি বাতিল বলে গণ্য হবে। কোন সম্মতির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান কখন বৈধ হবে, বা কখন বৈধ হবে না, এই সম্পর্কে ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৩ ধারায় বলা হয়েছে। নিম্নলিখিত অবস্থায় উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবৈধ বলে গণ্য করা হয়—

(১) যদি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়—

(ক) যদি ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে তা দণ্ডনীয় হয়;

(খ) যদি তা কোন অধিনিয়ম দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে;

(গ) যদি আইনসভা থেকে অধিকার প্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ নিয়ম রচনা করে এটাকে নিষিদ্ধ করে থাকে।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি খুন করার চুক্তি। ইহা ভারতীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। সুতরাং ইহা আইনসঙ্গত হতে পারে না।

(২) যদি চুক্তি সম্পাদন করতে কোন আইনের বিধান ব্যর্থ হয়ে থাকে

যদি কোন সম্মতি ও প্রতিদানের উদ্দেশ্য এমন হয়, যেখানে পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে বা ভঙ্গ করার প্রশ্রয় দেয় তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে একটা চাকরি দিল। চাকরির শর্ত ছিল যে, 'খ' পাবে সপ্তাহে ১৩ পাউন্ড মাইনে এবং ৬ পাউন্ড খরচ। কিন্তু এই খরচ অত্যধিক। ইংল্যান্ড কোর্ট রায়ে বলেছিলেন যে, খরচের

শর্ত আয়কর বিভাগকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। ইহা প্রতারনামূলক কাজ। সুতরাং দুটি শর্তই নিষ্ফল হবে।

[Napier Vs. National Business Agency Ltd.]

(৩) যদি ইহা প্রতারনা মূলক হয়—

যদি প্রতারণা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সম্মতি সম্পাদন করা হয় তাহলে তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'X' কে প্রতারনা করে যা লাভ হবে তা 'A' 'B' এবং 'C' এর মধ্যে ভাগ হবে। ইহা নিষ্ফল সম্মতি।

(৪) সম্মতি যদি অন্য কোন ব্যক্তি বা তাঁর সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়—

কোন সম্মতি যদি কোন ব্যক্তির নিজস্ব বা তার সম্মতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, তবে তা নিষ্ফল সম্মতি বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : একজন দেনাদার চুক্তি করল যে, যতদিন তার দেনাপরিশোধ না হবে ততদিন সে মহাজনের চাকর হিসাবে কাজ করবে। এই চুক্তি বলবৎযোগ্য হবে না।

[Ram Sarup Vs. Bausi]

(৫) সম্মতি যদি আদালত দুর্নীতিমূলক বলে মনে করেন—

কোন সম্মতির উদ্দেশ্য বা প্রতিদান যদি দুর্নীতিমূলক হয় তবে সম্মতি নিষ্ফল হবে।

(৬) আদালত যদি সম্মতিকে লোকনীতি বিরুদ্ধ মনে করেন—

কোন সম্মতি যদি জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, বা সামাজিক স্বার্থবিরোধী হয়, তবে সেই সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধে বলে বিবেচিত হবে।

নিম্নলিখিত সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়—

দেশের শত্রুর সঙ্গে বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

- **দেশের শত্রুর সঙ্গে বাণিজ্য**—যুদ্ধে রত দুইদেশের নাগরিকদের মধ্যে বাণিজ্য চুকি নিষ্ফল। যদি সেই দেশের সরকার বিশেষ অনুমতি দান করেন, তবে এই চুক্তি বৈধ হবে।
- **আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করা**— বিচারের পথে বাধা সৃষ্টিকরা অপরাধ। কোন ব্যক্তি যদি আদালতের বিচারে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, তা লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং সেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। কোন ব্যক্তি যদি অপরাধ করেন তাকে শাস্তি পেতে হবে কিন্তু তার পরিবর্তে যদি কেউ সম্মতিবদ্ধ হয়ে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে তবে তা হবে লোকনীতি বিরুদ্ধ।
- **সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয়**— সরকারি চাকুরি ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি লোকনীতির বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এবং তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'A' একজন সরকারি চাকুরিজীবী। 'A' এবং 'B' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'A' সরকারি চাকুরি দিলে 'B' একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 'A' কে দিবে। এটি নিষ্ফল সম্মতি।

- **যে সম্মতি ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক**— যদি কোন সম্মতি অন্যায় ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবে তা লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি মহাজনের কাছে কায়িক পরিশ্রম করতে স্বীকৃত হয়।

- **যে সম্মতি পিতা-মাতার কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**— পিতা-মাতার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর হয় না। এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন সম্মতি হলে তা নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি তার নাবালক পুত্রকে শ্রীমতি এ্যানি বেসান্তের অভিভাবকত্বে দিলেন। এই কর্তৃত্ব কোনদিন প্রত্যাহার করা যাবে না বলে রাজি ছিলেন। পরে পিতা ঐ নাবালক পুত্রের দাবি করলেন। আদালত বিচারে বললেন যে, পিতার অভিভাবকত্ব কোন দিন নষ্ট হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রকে ফেরৎ পেলেন।

[Giddu Narayanish Vs. Mrs. Annic Basant]

- **যে সম্মতি দাম্পত্য কর্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে**— কোন সম্মতির ফলে যদি দাম্পত্য কর্তব্য বিঘ্নিত হয়, তবে তাকে লোকনীতি বিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হবে এবং নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে তাকে বিবাহ করার জন্য অর্থ প্রদানে সম্মতি জানায় তবে তার নিষ্ফল হবে।

[Roshan Vs. Mahomad]

- **বিবাহ দালালি সম্মতি**— ইংরাজি আইনে বিবাহ ঠিক করে দেওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ এবং তা নিষ্ফল। কারণ সেখানে মনে করা হয় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের নিজের জীবনসঙ্গী পছন্দ করার অধিকার আছে, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে এই নির্বাচন ব্যাহত হবে। কিন্তু ভারতে এই নিয়মের প্রচার নেই। ভারতে পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করেন এবং সেজন্য ঘটক নিযুক্ত করাও হয়ে থাকে। সুতরাং, এই সম্পর্কে ইংরাজি আইন বলবৎ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। Baksi Das Vs Nadu Das মামলায় কলকাতার হাইকোর্ট বলেছেন যে, বিবাহ স্থির করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে অর্থ প্রদানের সম্মতি লোকনীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং প্রবর্তনীয় নয়।

উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের অংশিক বৈধতা—

প্রতিদান ও উদ্দেশ্য যদি অংশিকভাবে অবৈধ হয়, তবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযুক্ত হবে।

(১) যেখানে একাধিক উদ্দেশ্য, কিন্তু একটিমাত্র প্রতিদান, সেখানে একটি মাত্র উদ্দেশ্য অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(২৪ ধারা)

(২) যেখানে একটিমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু একাধিক প্রতিদান সেখানে একটি প্রতিদান অবৈধ হলেই সম্মতি নিষ্ফল হবে। —(২৪ ধারা)

(৩) যেখানে বৈধ এবং অবৈধ কাজ করার জন্য দু'পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হন, এবং ঐ সম্মতির বৈধ এবং অবৈধ অংশ পৃথক করা যায়, সেখানে অবৈধ অংশ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে। —(৫৭ ধারা)

(৪) যদি সম্মতিতে বিকল্প অঙ্গীকার থাকে, এবং যদি তার একটি বৈধ এবং অপরটি অবৈধ হয়, তা হলে শুধু বৈধ অংশ প্রবর্তনীয় হবে। —(৫৮ ধারা)

উদাহরণ : A এবং B একটি চুক্তি সম্পাদন করে। সম্মতি অনুযায়ী A, B কে কাপড় বা চোরাই মাল সরবরাহ করবে এবং বিনিময়ে B 5000 টাকা প্রদান করবে। এখানে কাপড়ের সম্মতি বৈধ কিন্তু চোরাই মালের ক্ষেত্রে নিষ্ফল।

২.গ.৮ সারাংশ

এই এককটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- প্রতিদান বলতে কী বোঝায়;
- প্রতিদান বৈধ হতে হলে কী কী নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়;
- প্রতিদান নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ;
- প্রতিদানের ক্ষেত্রে চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তির অধিকার;
- উদ্দেশ্য প্রতিদানের বৈধতা;
- লোকনীতি বিরুদ্ধ সম্মতি সমূহ;
- উদ্দেশ্য প্রতিদানের অংশিক বৈধতা।

২.গ.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) প্রতিদানের সংজ্ঞা দিন। প্রতিদানের দু'টি উদাহরণ দিন।

(২) প্রতিদান কত রকমের হয়?

(৩) অতীত প্রতিদানের একটি উদাহরণ দিন।

(৪) প্রতিদান ব্যতিরেকে চুক্তি হয় এমন একটি উদাহরণ দিন।

(৫) চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তি বলতে কী বোঝেন?

(৬) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) বৈধ প্রতিদানের নিয়মাবলীগুলি বর্ণনা করুন।

(২) "প্রতিদান নাই, চুক্তিও নাই"—নিয়মের ব্যতিক্রম সমূহ উল্লেখ করুন।

(৩) কোন্ কোন ক্ষেত্রে চুক্তি বহির্ভূত ব্যক্তি চুক্তি মূলে নালিশ করতে পারেন?

(৪) উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা বলতে কী বোঝেন? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা ক্ষুণ্ণ হয়, উদাহরণ সহযোগে বর্ণনা করুন।

২.গ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ ঘ ❑ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় এবং বলপ্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারণা ইত্যাদি।

গঠন

২.ঘ.১ উদ্দেশ্য

২.ঘ.২ প্রস্তাবনা

২.ঘ.৩ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়

২.ঘ.৪ বলপ্রয়োগ

২.ঘ.৫ অনুচিত প্রভাব

২.ঘ.৫.১ বলপ্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা

২.ঘ.৬ প্রতারনা

২.ঘ.৭ মিথ্যাবর্ণন

২.ঘ.৭.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারণার পার্থক্য

২.ঘ.৮ ভুল

২.ঘ.৯ সারাংশ

২.ঘ.১০ অনুশীলনী

২.ঘ.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.ক.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের ধারণা;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের পথে বাধা;
- সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে চুক্তি কীভাবে প্রভাবিত হয়;
- চুক্তির ওপর বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের প্রভাব;

২.ঘ.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির ক্ষেত্রে সকল পক্ষের "স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়" প্রয়োজন। অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না। 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেক সময়ই চুক্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হলে চুক্তিতে তাঁদের 'সায়' আছে বলে মনে করা হয়। যখন চুক্তির সকল পক্ষই একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়, তখন তাদের ইচ্ছা একই রকম বলে মনে

হয়। যে ক্ষেত্রে সায় বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাকে "স্বেচ্ছা প্রদত্ত' সায় বলা হয় না। অর্থাৎ, যে সায় বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা, বা ভুলের প্রভাব থেকে মুক্ত, তাকেই 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত' সায় বলা হয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত হলে এবং চুক্তির অন্যান্য উপাদান সঠিক থাকলে চুক্তি বৈধ হয়, অন্যথায় চুক্তি বৈধ হয় না। যদি স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় না থাকে, তাহলে চুক্তি কীভাবে প্রভাবিত হয়, সেটাই এই এককের আলোচ্য বিষয়।

২.ঘ.৩ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়

ভূমিকা ও সংজ্ঞা : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' হল চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষেরা যখন একই অর্থে ও একই বিষয়ে একমত হয়, তখন বলা হয় চুক্তিতে সায় বিদ্যমান। ইহার অর্থ চুক্তির অন্তর্গত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই। চুক্তি বলবৎ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সায় বিদ্যমান থাকলেই হয় না, সায়টি স্বেচ্ছা প্রদত্ত কিনা সেটাও লক্ষণীয়। সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে চুক্তি বৈধ হয় না।

অধিনিয়মের ১৩ ধারায় 'সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে— "যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয় তাঁরা সায় দিয়েছেন বলা হবে।"

উদাহরণ : 'ক' এর দুই খানি ঘোড়া আছে, একটি কালো আর অন্যটি সাদা। 'ক' এর সাদা ঘোড়াটি 'খ' কে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দেওয়ায় 'খ' তাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু 'খ' মনে মনে ভাবেন যে কালো ঘোড়াটি ক্রয় করছেন। এক্ষেত্রে 'ক' যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, 'খ' অন্যটি বুঝেছেন। তার ফলে 'খ' যে সম্মতি জানিয়েছিল সেখানে সায় নেই মনে করা হবে। তাই সায়-এর অনুপস্থিতিতে চুক্তি বৈধ হয় না।

অধিনিয়মের ১৪ ধারায় 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' সম্পর্কে বলা হয়েছে—যে সায় বল প্রয়োগ (Coercion) [১৫ ধারা],অনুচিত প্রভাব (Undue influence) [১৬ ধারা] প্রতারনা (Fraud) [১৭ ধারা], মিথ্যাবর্ণন (misrepresentation) [১৮ ধারা] ভুল (mistake) [২০, ২১, ও ২২ ধারা],-র দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাকে 'স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়' বলা যায় না।

স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়-এর অনুপস্থিতিতে যখন উভয় পক্ষই ভুলের বশবর্তী হয়ে সায় প্রদান করেন, তখন তা নিষ্ফল সম্মতি। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা ও মিথ্যাবর্ণনার ক্ষেত্রে সায় স্বেচ্ছা প্রদত্ত না হলে সম্মতি নিষ্ফল যোগ্য হয়। অর্থাৎ ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি বৈধ হয়।

২.ঘ.৪ বল প্রয়োগ

বল প্রয়োগের অর্থ হল জোর করে কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ করা। কোন ব্যক্তিকে জোর করে অথবা ভয় দেখিয়ে চুক্তিভুক্ত করাকে বল প্রয়োগ বলে।

আইনের ১৫ ধারায় বল প্রয়োগের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

"যদি কোন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কার্য

করে বা করার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা কোন ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল সম্পত্তি অবৈধভাবে আটক রাখে বা রাখার ভীতি প্রদর্শন করে অপর কোন ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করে, তবে তাকে বলপ্রয়োগ বলা হবে।"

উপরের বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা থেকে বলা যায়, নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি ঘটনা ঘটলে বলা হবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে :

(১) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে; অথবা

(২) ভারতীয় দণ্ড সংহিতা দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করার ভীতি প্রদর্শন করা হলে; অথবা

(৩) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটক রাখা হলে;

(৪) অবৈধ ভাবে কোন সম্পত্তি আটকে রাখার ভীতি প্রদর্শন করা হলে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হল যে,

(১) উপরের বর্ণিত (১-৪) উপায়ে কোন প্রকার কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তিকে চুক্তিভুক্ত হতে বাধ্য করা হলে তা বল প্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

(২) যে স্থানে ঐ সকল কার্য (১-৪) করা হয়েছিল সেখানে ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বলবৎ না থাকলেও তাকে বল প্রয়োগ বলে মনে করা হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে ভয় দেখিয়ে তার (খ-এর) সুন্দর বাড়িটি বিক্রি করার চুক্তি করলেন। এক্ষেত্রে 'ক' বল প্রয়োগ দ্বারা 'খ' এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি প্রবতর্নীয় নয়।

(২) একটি ১৩ বৎসরের বিধবা বালিকাকে বলা হয় যে, তার স্বামীর আত্মীয়ের এক পুত্রকে দত্তকে নিতে। অন্যথায় তার স্বামীর মৃতদেহ সৎকার করতে দেওয়া হবে না। বিচারে স্থির হয়, এক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে সংঘটিত চুক্তি প্রবতর্নীয় নয়।

Renganayakamma Vs. Alwar Chetty (1927).

(৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যবসায়ের হিসাবের খাতা পত্র নতুন প্রতিনিধির হাতে দিতে অস্বীকার করেন। ঐ প্রতিনিধি দাবি করেন যে, পূর্বেকার সমস্ত লেনদেন সম্পর্কিত দায় থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। প্রতিনিধির দাবি মেনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট এ-ব্যাপারে রায় দেন যে, প্রধানের (Principal) ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তন যোগ্য হবে, কারণ এই ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ হয়েছে।

[Muthiah Chettiar Vs. Karupper Chetty (1927)]

- **মামলা করার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন ব্যক্তির কৃতকার্যের জন্য দেওয়ানী (Civil) বা ফৌজদারি (Criminal) মামলা দায়ের করার ভীতি প্রদর্শন কে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অজুহাতে মামলা দায়ের ভীতি প্রদর্শন কে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করে তা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (Indian Penal Code) কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

- **আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন :**

কোন কোন সময় আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির থেকে সায় (Consent) গ্রহণ করে। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে আত্মহত্যার চেষ্টা দণ্ডনীয়, কিন্তু আত্মহত্যা

দণ্ডনীয় নয়। কারণ মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতায়-নিষিদ্ধ কোন কার্য করা বা ঐরূপ কোন কার্য করার ভীতি প্রদর্শন করা হল বল প্রয়োগ। সেই অর্থে আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন বল প্রয়োগ ছাড়া কিছু নয়।

একটি বিখ্যাত মোকদ্দমার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন করে তার স্ত্রী ও পুত্রকে তাঁর ভাই-এর অনুকূলে (infavour of) একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। বিচারে চুক্তিটিকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

[Chikkam Ammiraju Vs. Chikkam Seshamma (1918).]

বলপ্রয়োগের পরিণাম (Effects of Coercion)—বল প্রয়োগ দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে পক্ষের সম্মতি বল প্রয়োগ দ্বারা পাওয়া গেছে, সেই পক্ষের ইচ্ছা অনুসারে (at the option of the party) নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ক্লিষ্ট পক্ষ যদি মনে করেন, তাহলে চুক্তি রদ করতে পারেন। যে পক্ষ বল প্রয়োগের কারণের জন্য চুক্তি রদ করতে চান, সেই পক্ষকে তাঁর উপর বল প্রয়োগের প্রমান দিতে হবে।

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯ ও ৭২ ধারায় বল প্রয়োগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা আছে।

১৯ ধারায় বলা হয়েছে— "বল প্রয়োগের দ্বারা চুক্তি সম্পাদিত হলে যে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে।"

৭২ ধারায় বলা হয়েছে— "বল প্রয়োগের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অর্থ বা কোন বস্তু দেওয়া হলে, সেই ব্যক্তি উহা অবশ্যই ফেরত দেবেন।"

বলপূর্বক অবরোধ (Duress) —ইংরেজি আইনে বল প্রয়োগের (Coercion) প্রায় সমার্থক হিসাবে 'বল পূর্বক অবরোধ' (Duress) কথাটি ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় আইনে ব্যবহৃত বল প্রয়োগ (Coercion) শব্দের অর্থ ইংরেজি আইনে ব্যবহৃত বল পূর্বক অবরোধ (Duress) অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। 'বল পূর্বক অবরোধ' শব্দটির অর্থ শারীরিক ভীতি প্রদর্শন করে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করা। কিন্তু সম্পত্তি আটক বা নষ্টের ভীতি প্রদর্শন ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বল প্রয়োগ ও বল পূর্বক অবরোধের পার্থক্য—

বল প্রয়োগ বলপূর্বক অবরোধ অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অবৈধভাবে পণ্য আটক করা বল প্রয়োগের অন্তর্গত। কিন্তু বল পূর্বক অবরোধ বলতে অবৈধবাবে পণ্য আটক বোঝায় না। ইহা শারীরিক ক্ষতি বা শারীরিক ভাবে ভীতি প্রদর্শনকে বোঝায়।

২.ঘ.৫ অনুচিত প্রভাব

উর্দ্ধতন ক্ষমতার (superior power) অপব্যবহার করে অধস্তন ব্যক্তির কাছ থেকে চুক্তির সায় আদায় করা হলে বলা হয় অনুচিত প্রভাব (Undue Influence) ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি ভুক্ত পক্ষেরা একজন অপরজনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পর্ক যুক্ত যে, একজন অন্যজনের ওপর কর্তৃত্ব করেন। অনেক সময় চুক্তির একপক্ষ অন্যপক্ষকে প্ররোচনার দ্বারা প্রভাবিত করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুক্তিভুক্ত করতে বাধ্য করেন।

অধিনিয়মের ১৬(১) ও ১৬(২) ধারায় 'অনুচিত প্রভাব' শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অধিনিয়মের ১৬(১) ধারা অনুযায়ী, "কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত যখন (১) চুক্তিভুক্ত

পক্ষেরা পরস্পর এমনভাবে সম্পর্কিত যে, একজন তাঁর কর্তৃত্বের দ্বারা অপরজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রভাবিত করেন এবং (২) অন্যজনের উপর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন।

অধিনিয়মের ১৬(২) ধারায় "নিজের ক্ষমতা দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা"— কথাটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষমতার দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করা হয়েছে বলে ধরা হয় :

(১) যখন এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত (real) বা আপাত (apparent) কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

উদাহরণ : প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(২) যখন এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের পরম বিশ্বাসের (Fiduciary) সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদাহরণ : পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক, ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

(৩) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে সাময়িক বা চিরকালের জন্য মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উদাহরণ : রোগে জীর্ণ অতি বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসকের চুক্তি।

অনুচিত প্রভাবের অনুমান (Presumption of Undue Influence)

নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, অনুচিত প্রভাব বর্তমান আছে:

(i) যখন এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের কোন প্রকৃত বা আপাত কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে।

(ii) যখন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন রকম বিশ্বাসের সম্পর্কে থাকে।

(iii) যখন এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করা হয় যিনি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা শারীরিক কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত।

অনুচিত প্রভাবের পরিণাম (Consequences of Undue Influence)

অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হয়েছে তাঁর ইচ্ছানুসারে সেই চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মনে করলে চুক্তিটি রদ করতে পারেন। ১৯(ক) ধারায় অনুচিত প্রভাবের পরিণাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

"যখন অনুচিত প্রভাব দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মত হন, তখন ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফল যোগ্য হবে।"

"অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত এইরূপ চুক্তি সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে, বা যে ব্যক্তি ইহা পরিহার করতে পারেন তিনি যদি এই চুক্তি থেকে কোন প্রকার উপকার পেয়ে থাকেন, তাহলে আদালত ন্যায্য শর্তে চুক্তিটি রদ করতে পারেন।"

প্রমাণ ভার (Burden of Proof)

কোন কোন সময় কোন চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত, এই অভিযোগ জানিয়ে আদালতে মামলা করা হয়। এক্ষেত্রে যে পক্ষ অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত তাঁর দায়িত্ব হবে অনুচিত প্রভাবের সত্যতা আদালতে প্রমাণ করা। এ বিষয়ে ক্লিষ্ট (Aggrieved) পক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ করতে হবে;

(১) চুক্তির অপর পক্ষ যিনি অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধতন (Superior) তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এবং

(২) ঊর্দ্ধতন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে চুক্তিতে তাঁর সায় আদায় করা হয়েছে।

২.ঘ.৫.১ বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বল প্রয়োগ ও অনুচিত প্রভাবের তুলনা করা হল :

(১) **সংজ্ঞা** (Definition) : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় নিষিদ্ধ ও শাস্তি যোগ্য কোনরকম কার্য করে বা করার ভীতি প্রদর্শন করে তা হল বল প্রয়োগ। অন্যদিকে চুক্তি আইনের ১৬ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতাবলে অন্য ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে চুক্তিতে সম্মত করান, তাহলে তাকে বলা অনুচিত প্রভাব।

(২) **পক্ষ** (Partics) : চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তিও বল প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু চুক্তিভুক্ত এক পক্ষ অন্য পক্ষকে অনুচিত ভাবে প্রভাবিত করেন। চুক্তি বহির্ভুত ব্যক্তি তা করতে পারেন না।

(৩) **অধিকার সমূহ** (Rights) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি পরিহার করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি কোন সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তবে অন্য পক্ষের জন্য সুবিধা বহাল বা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। অনুচিত প্রভাব দ্বারা প্রণোদিত চুক্তি ক্লিষ্ট পক্ষের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রদ হতে পারে অথবা আদালত যে কোন ন্যায্য শর্তে চুক্তি রদ করতে পারেন।

(৪) **দায়িত্ব** (Onus) : বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁর উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষকে অন্য পক্ষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক (fiduciary relation) প্রমাণ করতে হবে। চুক্তির অন্য পক্ষকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি চুক্তিতে কোন অনুচিত প্রভাব ব্যবহার করেন নি, বা, অন্যায় ভাবে কোন সুবিধা গ্রহণ করেন নি।

(৫) **শাস্তি** (Punishment) : বল প্রয়োগ ভারতীয় দণ্ডসংহিতা (Indian Penal Code) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। কিন্তু অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে এরকম কোন শাস্তির বিধান নেই।

২.ঘ.৬ প্রতারনা

চুক্তি গঠনের সময় চুক্তির অপরিহার্য উপাদান সম্পর্কে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা দেওয়া হয় তবে তাকে প্রতারণা (Fraud) বলে। চুক্তির এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে ঠকানোর জন্য ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবর্ণনা করেন, এবং যদি অন্যপক্ষ তা সত্যি বলে মনে করেন, তবে তাকে প্রতারনা বলে। প্রতারনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনা করা। অনিচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যাবর্ণনাকে প্রতারনা বলা হয় না।

চুক্তি অধিনিয়মের ১৭ ধারায় প্রতারনার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

"চুক্তির কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে, বা তাঁর প্রতিনিধি (agent) কে চুক্তিভুক্ত করার জন্য কোনোরকম চুক্তির মিথ্যাবর্ণনা দিলে তা প্রতারনা বলে গণ্য করা হয়।"

১৭ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত যে কোন কার্য করলেই তাকে প্রতারনা বলে গণ্য করা হবে :

(১) যা সত্য নয়, অর্থাৎ এরূপ কোন তথ্য যা কোন ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তাকে সত্য বলে বর্ণনা করা।

(২) কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও সেই বিষয় কারসাজি করে গোপন রাখা।

(৩) অঙ্গীকার পালন না করার ইচ্ছা নিয়ে অঙ্গীকার করা।

(৪) ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করা।

(৫) আইন দ্বারা প্রতারনামূলক বলে ঘোষিত কোন কার্য করা বা বিচ্যুত হওয়া।

ব্যাখ্যা (Explanation) : চুক্তি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারনা বলা চলে না। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে নীরবতা প্রতারনা হিসাবে গণ্য করা হবে। সুতরাং বলা যায় নীবতা মাত্রেই প্রতারনা নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কথা বলা কর্তব্য, সেক্ষেত্রে নীরবতার অর্থ প্রতারনা।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' নিলামের দ্বারা 'খ' কে একটি গাড়ি বিক্রি করেন। গাড়িটায় কোন দোষ বা খুঁত নেই মনে করে 'খ' গাড়িটি কেনেন। 'ক' গাড়িটার খুঁত সম্পর্কে 'খ' কে কিছুই জানায়নি। এটি কোন প্রতারনা নয়।

(খ) 'খ' গাড়িটি কেনার সময় 'ক' কে বলল, "তুমি যদি অস্বীকার না কর, তবে মনে করব গাড়িটিতে কোন খুঁত নাই।" 'ক' কিছুই বলল না। এক্ষেত্রে 'ক' এর নীরবতা মুখরতার সামিল। গাড়িটিতে সত্যিই যদি খুঁত থাকে, তবে 'ক' এর নীরবতা প্রতারনামূলক।

নীরবতা ও প্রতারনা (Silence and Fraud)

অধিনিয়মের ১৭ ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী "প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারও চুক্তি করার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করাকে প্রতারনা বলা যায় না। কিন্তু সেখানে তথ্য প্রকাশ করা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বা যেখানে নীরবতা মুখরতার সামিল, সেখানে নীরবতা প্রতারনা হিসাবে গণ্য করা হবে।"

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বলা হয় নীরবতাই প্রতারনা :

১. যেখানে কথা বলা কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

২. যেখানে নীরবতা মুখরতা সামিল।

প্রতারনা পরিনাম (Consequences of fraud)

অধিনিয়মের ১৯ ধারায় প্রতারনার পরিণাম ও প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে

"প্রতারনা দ্বারা যে ব্যক্তি সম্মত হয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রতারনা দ্বারা প্রবর্তিত চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হয়ে থাকে।" অন্যভাবে বলা যায়—

কোন ব্যক্তি যদি প্রতারনার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হন, তবে তিনি নিম্নলিখিত উপায়ে প্রতিকার পেতে পারেন :

১. তিনি চুক্তি পালন নাও করতে পারেন।

২. চুক্তির অপর পক্ষকে তিনি চুক্তি পালনে বাধ্য করতে পারেন এবং চুক্তি পালন হলে তিনি যে সকল সুবিধা ভোগ করতে পারতেন, সেইরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য তিনি অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারবেন।

৩. প্রতারনা একধরনের দেওয়ানী অপরাধ (Civil wrong or tort) হওয়ার জন্য ক্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন।

- **চুক্তি রদ করার অধিকার হারানো** (Loss of Right of Rescission) :

প্রতারনার দ্বারা চুক্তি হয়ে থাকলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্তিত চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হয়ে থাকে। ইচ্ছানুযায়ী তিনি চুক্তিটি রদ করতে পারেন বা চুক্তি পালনের জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু প্রতারনার প্রতিকারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে চুক্তি রদের অধিকার লোপ পায় :

১. **সময়ের অতিবাহন** (Lapse of Time) :

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারনা ধরা পড়ার পর যথাযোগ্য সময় (Reasonable Time) -র মধ্যে ক্লিষ্ট পক্ষ যদি চুক্তিটি রদ (Rescind) না করেন, তাহলে যথাযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে চুক্তিটি রদ করার অধিকার থাকে না। এক্ষেত্রে যথাযোগ্য সময় ঘটনার পরিস্থিতি ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

২. **তৃতীয় পক্ষের অধিকার** (Right of Third Parties) :

কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ যথেষ্প পরিমাণ প্রতিদান দিয়ে অতি বিশ্বাসের সঙ্গে কোন বিষয়ের উপর তাঁর অধিকার লাভ করেন। কিন্তু যদি অন্য দুই পক্ষের মধ্যে কোনরূপ প্রতারনার কথা তাঁর জানা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ (aggrieved party) চুক্তি রদ করার অধিকার হারান।

৩. **পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়** (Restitution not Possible) :

যে পক্ষ চুক্তি রদ করতে চাইছেন, তিনি যদি চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ফেরত বা ফিরিয়ে দেবার অবস্থায় না থাকেন, তাহলে তিনি আর চুক্তি রদ করতে পারেন না।

২.ঘ.৭ মিথ্যাবর্ণন

চুক্তি সম্পাদনের সময় বা আগে চুক্তির এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেন, তাকে 'বিবৃতি' (Statement) বা 'বর্ণনা' (Representation) বলে। বিশ্বাসের সঙ্গে এবং ঠকাবার কোন অভিসন্ধি না নিয়ে যদি কোন ভ্রান্ত বিবৃতি দেওয়া হয়, তবে তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresentation) বলা হয়।

অনিচ্ছাকৃত ভাবে (innocently) বা ইচ্ছাকৃতভাবে (intentionally) মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হতে পারে। যখন অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঠকানোর অভিসন্ধি না নিয়ে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে মিথ্যাবর্ণন (Misrepresntation) বলা হয়। কিন্তু, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঠকাবার অভিসন্ধি নিয়ে যখন মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয় তখন তাকে প্রতারনা (Fraud) বলে।

অধিনিয়মের ১৮ ধারায় "মিথ্যাবর্ণন"-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অধিনিয়মের ১৮ ধারা অনুসারে মিথ্যাবর্ণনকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কোন সংবাদ যা সমর্থনযোগ্য নয়, এরূপ অসত্য কথা সত্য ভেবে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা।

২. ঠকাবার উদ্দেশ্য না নিয়ে কোন ব্যক্তির কর্তব্যের ত্রুটির দ্বারা অপর ব্যক্তির যদি স্বার্থহানি হয় এবং এর ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি কোন সুবিধা ভোগ করেন।

৩. চুক্তি এক পক্ষ অনিচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে যদি চুক্তির অপর পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

মিথ্যাবর্ণনের পরিণাম (Consequences of Misrepresentation) :

কোন এক পক্ষের মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ—

১. চুক্তি পরিহার বা রদ করতে পারেন, বা

২. চুক্তিটি গ্রহণ করে অপর পক্ষকে চুক্তিটি মানতে বাধ্য করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের দ্বারা যে সকল শর্ত ও বর্ণনার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পালন করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করতে পারেন।

মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করতে পারেন না। কিন্তু মিথ্যাবর্ণনে যিনি সায় দিয়েছেন তাঁর পক্ষে যদি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত তথ্য জানার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনের কোন প্রতিকার থাকে না।

২.ঘ.৭.১ মিথ্যাবর্ণন ও প্রতারনার পার্থক্য

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা হল :

১. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু প্রতারনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকাবার উদ্দেশ্য থাকে।

২. ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে মিথ্যাবর্ণনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতারনা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩. মিথ্যাবর্ণন হল অনিচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয়, তা অতি বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যি মনে করেই দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতারনা হল ইচ্ছাকৃত ভুল। এক্ষেত্রে, যে ভুল বিবৃতি দেওয়া হয় তা সত্যি নয় জেনেও দেওয়া হয়।

৪. মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষতি পূরণের মামলা করতে পারেন না। কিন্তু প্রতারনার ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষ চুক্তি রদ করতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মামলাও করতে পারেন।

৫. সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সত্যি জানার যদি কোন উপায় থাকত, তাহলে মিথ্যাবর্ণনের ক্ষেত্রে প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু, প্রতারনার ক্ষেত্রে যদি সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যদি প্রকৃত সত্যি জানার উপায় থাকে, তা সত্ত্বেও চুক্তিটি ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য হবে।

২.ঘ.৮ ভুল

চুক্তি অধিনিয়মের ২০, ২১ ও ২২ ধারায় 'ভুল' সম্পর্কীয় আইনগত দিকগুলি আলোচনা করা হয়েছে :

১. অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে "চুক্তির উভয় পক্ষ যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়।"

২. অধিনিয়মের ২১ ধারায় বলা হয়েছে,—"ভারতীয় আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, তাহলে চুক্তি নিষ্ফল হয় না। কিন্তু বিদেশী আইন সম্বন্ধীয় কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করলে তা তথ্য সম্বন্দীয় ভুল বলে গ্রাহ্য করা হবে এবং চুক্তি নিষ্ফল হবে।"

৩. অধিনিয়মের ২২ ধারায় বলা হয়েছে,—"চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হলে চুক্তি নিষ্ফল হবে না।"

'ভুল' কে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. তথ্য সম্পর্কীয় ভুল, ২. আইন সম্পর্কীয় ভুল, ত. একতরফা ভুল ও ৪. দ্বি-তরফা ভুল।

দ্বি-তরফা ভুল (Bilateral Mistake) :

চুক্তি অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে, চুক্তির উভয় পক্ষই যখন চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন বিষয় বস্তু সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়।

দ্বি-তরফা ভুলকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল;

২. চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল।

১. **চুক্তির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistake as to the subject-matter) :

বিষয়বস্তুর পরিচয় ও প্রকৃতি প্রত্যেকটি চুক্তির ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। চুক্তির-বিষয়-বস্তু সম্পর্কে দ্বি-তরফা ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণত নিম্নলিখিত ভুল গুলি লক্ষ্য করা যায় :

- **বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the existance of the Subject-matter) :

চুক্তির বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে মনে করে চুক্তির উভয় পক্ষ অনেক সময় চুক্তিভুক্ত হন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যখন চুক্তি হয়েছে তখন চুক্তির বিষয় বস্তুর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হয়।

উদাহরণ :

স্যালোনিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের অভিমুখে জাহাজে করে গম আনার পথে গম বিক্রির চুক্তি হয়। কিন্তু উভয় পক্ষেরই অজানা ছিল যে, ইতিমধ্যেই গম নষ্ট হয়ে গেছে। তার ফলে মাঝ পথে অন্য একটি বন্দরে সমস্ত গম বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সময় কোন পক্ষেরই এই ঘটনা জানা ছিল না। আদালতে স্থির হয়, চুক্তিটি নিষ্ফল।

[Couturies Vs. Hastie (1856)]

⊙ **বিষয় বস্তুর পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the identity of the subject matter) :

চুক্তির কোন এক পক্ষ ঠিক যে অর্থে চুক্তিভুক্ত হতে চান চুক্তির অন্য পক্ষ যদি ঠিক সেই অর্থে সম্মতি হয়ে চুক্তিভুক্ত না হন, তাহলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সকল পক্ষ যখন একই জিনিস সম্পর্কে একই অর্থে সম্মত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তখনই চুক্তি বৈধ হয়। ভুল থাকলে চুক্তিবদ্ধ পক্ষগণ একই বিষয়ে একই অর্থে একমত হয়েছেন বলা যায় না।

উদাহরণ

বোম্বাই হতে Peerless নামক একটি জাহাজ আসার কথা ছিল। 'ক' ঐ জাহাজ থেকে কিছু সুতো 'খ' এর কাছ থেকে কিনতে সম্মত হন। Peerless নামক দু'খানি জাহাজ বোম্বাই থেকে আসছিল। একটি অক্টোবর মাসে, অন্যটি ডিসেম্বর মাসে। 'ক' প্রথম জাহাজটির কথা ভেবেছিল, অন্যদিকে 'খ' দ্বিতীয় জাহাজটির কথা ভেবেছিল। 'ক' চুক্তিটি অস্বীকার করে। বিচারে ধার্য হয়, পক্ষদ্বয় একই অর্থে একই জিনিসের জন্য একমত হয় নি। সুতরাং, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত সায় নেই। তাই চুক্তিটি নিষ্ফল।

[Raffles V. Wichelhaus.]

⊙ **বিষয় বস্তুর গুণমান সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to Qualitiy of the Subject-Matter) :

চুক্তির উভয় পক্ষ যখন বিষয় বস্তুর গুণমান সম্পর্কে ভুল করেন, তখন চুক্তি নিষ্ফল হয়।

⊙ **বিষয় বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Quantity of the Subject Matter) :

যদি চুক্তির উভয়-পক্ষ চুক্তির পরিমাণ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন, তবে তাহা নিষ্ফল হবে।

২. **সম্পাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে দ্বি-তরফা ভুল** (Bilateral Mistakes as to the Possibility of Performance) :

চুক্তির উভয়পক্ষ যখন কোন বিষয়ের সম্পাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়টি সম্পাদনের কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তখন চুক্তিটি নিষ্ফল হয়ে যায়।

দ্বি-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effects of Bilateral Mistake) :

চুক্তি অধিনিয়মের ২০ ধারা অনুসারে চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সম্পর্কে যদি উভয় পক্ষের ভুল হয়, তাহলে চুক্তিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল হয়। এক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি বলবৎ করানো যায় না।

এক তরফা ভুল (Unilateral Mistake) :

অধিনিয়মের ২২ ধারা অনুযায়ী, চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন এক পক্ষের ভুলের দ্বারা চুক্তি নিষ্ফল হবে না। সুতরাং কোন এক পক্ষের ভুল চুক্তির বৈধতা ক্ষুন্ন করে না। কিন্তু ঐ ভুল যদি সায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে এক পক্ষের ভুলের দ্বারাও চুক্তি নিষ্ফল হবে। এক তরফা ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি অপর পক্ষ আইনত মানতে বাধ্য থাকবেন, যদি না সেই ভুল মিথ্যাবর্ণনা বা প্রতারনা দ্বারা করা হয়ে থাকে।

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ নিজের বিচার-বিবেচনা দিয়ে চুক্তির বিষয় বস্তু সম্পর্কে অবগত না হয়ে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে চুক্তি করেন, তবে তিনি পরবর্তী সময়ে চুক্তিটি পরিহার করতে পারবেন না।

উদাহরণ :

সরকার একটি মাছের ব্যবসায় (Fishery) ইজারা (Lease) দেওয়ার জন্য নিলাম আহ্বান করেন। এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ দর (Highest bid) দিয়ে ঐ ব্যবসায়ের ইজারার অধিকার লাভ করেন। ঐ ব্যক্তির ধারণা ছিল যে, এই ইজারাটির সময়সীমা তিন বছর। কিন্তু প্রকৃত সময়-সীমা এক বছর। এক্ষেত্রে, এক তরফা ভুলের জন্য ঐ চুক্তি পরিহার করতে পারবেন না। চুক্তি করার আগে ঐ ব্যক্তির উচিত ছিল চুক্তি সম্পর্কীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

[A. A. Singh Vs. Union of Indian (1970)]

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, চুক্তির কোন এক পক্ষ কোন মৌলিক (fundamental) ভুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সায় দিলে মনে করা হবে সেক্ষেত্রে তাঁর সায় নেই। অর্থাৎ, এর ফলে কোন চুক্তি গঠিত হয় না, যদিও এটি একতরফা ভুল।

১. **ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল** (Mistake as to the Identity of the Party) :

যে ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার ইচ্ছা ছিল, ভুলবশত অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে ঐ চুক্তি গঠিত হলে চুক্তি নিষ্ফল হয়। চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং, চুক্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে ভুল হলে তা নিষ্ফল হয়। যেমন—'ক' 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু 'গ' কে 'খ' ভেবে 'ক' চুক্তি করে। এক্ষেত্রে 'ক' কোনভাবেই 'গ' এর সাথে চুক্তি করতে চায় নি, চেয়েছিল 'খ' এর সঙ্গে চুক্তি করতে। সুতরাং, 'ক' এর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে এই ভুলের দ্বারা গঠিত চুক্তি নিষ্ফল।

উদাহরণ :

এক মহিলা নিজেকে সম্ভ্রান্ত এক মহাশয়ের স্ত্রী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এক জহুরীর কাছ থেকে দুটি মুক্তোর হার নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঐ মহিলা এক ব্যক্তিকে কোন কিছু না জানিয়ে ঐ হার দু'টি বিক্রি করে দেয়। বিচারে স্থির হয় মহিলা ও জহুরীর মধ্যে কোন চুক্তি হয় নি। তাই ঐ ব্যক্তি যিনি হার দুটি কিনেছিলেন তিনি অবশ্যই হার দুটি জহুরীকে ফেরত দেবেন। কারণ, জহুরী সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের স্ত্রীকে হার দুটি দিতে চেয়েছিলেন, ঐ মিথ্যা পরিচয়ধারী মহিলাকে দিতে চান নি।

[Lake Vs. Simmons (1927)]

২. লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল (Mistake as to the Nature of the Transaction)

চুক্তির কোন এক পক্ষের ভুলের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ যে অর্থে চুক্তি সম্পাদন করেছিল, লেনদেনের প্রকৃতি যদি তা থেকে পৃথক হয়, তবে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ :

'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন এক বৃদ্ধকে জামিনের কাগজ বলে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বাক্ষর করিয়ে নেন। পরবর্তীকালে 'ক' ঐ হুণ্ডিটি 'গ' কে হস্তান্তর করেন।

বিচারে ধার্য হয় যে, 'খ' কে লেনদেনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিথ্যা বলে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এটি কোন চুক্তি নয়।

[Foster Vs. Mackinnon (1869)]

এক-তরফা ভুলের পরিমাণ (Effect of Unilateral Mistake) :

চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতারনার দ্বারা অপর পক্ষকে ভুল বুঝিয়ে সম্মতি আদায় করলে সেই চুক্তিকে নিষ্ফল চুক্তিরূপে গণ্য করা হবে। এরূপ চুক্তির দ্বারা তৃতীয় পক্ষ কোন রকম অধিকার লাভ করে না।

২.ঘ.৯ সারাংশ

এই এককটি বিস্তারিতভাবে পাঠ করে আপনারা স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায় এবং এর সঙ্গে চুক্তির গভীর সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পেরেছেন। এই এককে আমরা যা শিখলাম খুব সংক্ষেপে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- সায় (Consent)-এর ধারনা;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের ধারণা;
- বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের উপস্থিতি বৈধ চুক্তি গঠনে কীভাবে বাধা দান করে;
- স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের অনুপস্থিতির পরিণাম;

২.ঘ.১০ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(২) স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের সংজ্ঞা দিন।

(৩) কোন্ কোন্ উপাদান বর্তমান থাকলে সায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হয় না?

(৪) বল প্রয়োগ, অনুচিত প্রভাব, প্রতারনা, মিথ্যাবর্ণনা ও ভুলের একটি করে উদাহরণ দিন।

(৫) বল পূর্বক অবরোধ ও বল প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা প্রদত্ত সায়ের অনুপস্থিতিতে চুক্তি গঠনে বাধার সৃষ্টি হয় আলোচনা করুন।

(২) আত্মহত্যার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা গঠিত চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নীরবতা কে প্রতারনা বলে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে আপনার মতামত লিখুন।

(৪) মিথ্যাবর্ণনা ও প্রতারনার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(৫) ভুল কত রকমের? উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

২.ঘ.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৩ ক ❑ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি, উপচুক্তি, ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

গঠন

৩.ক.১ উদ্দেশ্য

৩.ক.২ প্রস্তাবনা

৩.ক.৩ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

- ৩.ক.৩.১ বৈধ চুক্তি
- ৩.ক.৩.২ নিষ্ফল চুক্তি
- ৩.ক.৩.৩ নিষ্ফল সম্মতি
- ৩.ক.৩.৪ নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

৩.ক.৪ নিষ্ফল চুক্তি ও নিষ্ফল সম্মতির পার্থক্য

৩. ক.৫ উপচুক্তি

- ৩. ক.৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবারহ
- ৩. ক.৫.২ ঋণ পরিশোধকারীর প্রাপ্য শোধ
- ৩. ক.৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া
- ৩. ক.৫.৪ প্রাপ্তবস্তুর দখলকার
- ৩. ক.৫.৫ ভুল বা বল প্রয়োগ দ্বারা প্রদত্ত অর্থ

৩. ক.৬ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

- ৩. ক.৬. সংজ্ঞা
- ৩. ক.৬. বৈশিষ্ট্য
- ৩. ক.৬. ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী

৩. ক.৭ সারাংশ

৩. ক.৮ অনুশীলনী

৩. ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.ক.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- বৈধ চুক্তি এবং বৈধ চুক্তি কীভাবে নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়;
- নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফলযোগ্য সম্মতির ধারণা;
- নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির মধ্যে পার্থক্য;
- কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল;

- বাজী ধরার সম্মতি কীভাবে গ্রহণ করা হয়;
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির মতো কোন সম্পর্ক না থাকলেও কীভাবে চুক্তির উদ্ভব হয়;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তির ধারণা;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তি কীভাবে আনুষঙ্গিক ঘটনার ওপর নির্ভর করে;
- ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী।

৩.ক.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির মূল চারিত্রিক উপাদান হল এর বৈধতা। অর্থাৎ চুক্তি যদি কোন ভাবেই আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে চুক্তির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং আইনের চোখে ও সমাজের চুক্তির গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে আমাদের সকলেরই খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা জেনেছি চুক্তি কী, এর উপাদান, গঠন, প্রকারভেদ ইত্যাদি। এখন এই এককের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো একটি চুক্তি কখন, কীভাবে বৈধ হয়। কীভাবে একটি চুক্তি তার বৈধতা হারিয়ে নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়। নিষ্ফল চুক্তি আবার আইন দ্বারা বলবৎ-যোগ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও চুক্তির মতো দায় সৃষ্টি হয়। এগুলিকে উপচুক্তি বলে। আবার কখনো কখনো ভবিষ্যত এবং অনিশ্চিত কোন ঘটনা সম্পাদনের ওপর চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভবিষ্যতে ঐ অনিশ্চিত ঘটনা ঘটলেই চুক্তি বলবৎযোগ্য হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তির বৈধতা নির্ভর করে। একে নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি বলে। এই একক ভালো পাঠ করলে আমরা চুক্তি কখন, কীভাবে তার বৈধতা হারায়, চুক্তি না থাকলেও কী ভাবে চুক্তির মত দায় জন্মায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারব।

৩.ক.৩ বৈধ চুক্তি, নিষ্ফল চুক্তি, নিষ্ফল সম্মতি, নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি

৩.ক.৩.১ বৈধ চুক্তি (Valid Contract)

যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবকটি অপরিহার্য উপাদান আছে তাহাই আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়। আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য এরূপ চুক্তিকে বৈধ চুক্তি বলে।

৩.ক.৩.২ বৈধ চুক্তি (Void Contract)

যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ চিল কিন্তু, চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে বিশেষ কোনো কারণে আইন দ্বারা আর বলবৎযোগ্য থাকে না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।

৩.ক.৩.৩ বৈধ চুক্তি (Void Agreement)

যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয়, তাকে নিষ্ফল সম্মতি বলা হয়।—[২(জি) ধারা]। নিষ্ফল সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)। নিষ্ফল সম্মতির দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না। সুতরাং, নিষ্ফল সম্মতির দ্বারা কোন আইনগত অধিকার বা দায় সৃষ্টি হয় না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ১০ নং

ধারায় যে সমস্ত শর্ত দেওয়া আছে, সেগুলি মেনে যে সম্মতি গঠিত হয়, সেগুলিই কেবল মাত্র আইন দ্বারা প্রবর্তন করা যায়। চুক্তি আইনে নির্দিষ্ট কিছু কিছু সম্মতিকে নিষ্ফল বলে উল্লেখ করা আছে।

৩.ক.৩.৪ নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি (Voidable Agreement)

চুক্তির কোন এক পক্ষের সম্মতি পরিহার করার সুবিধা থাকলে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে যদি সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হয়, তবে তা হবে নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।

বলপ্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব, বিকৃত বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত করে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মতি আদায় করা হলে ক্লিষ্ট পক্ষের ইচ্ছানুসারে সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হবে।

যেমন—'ক' বল প্রয়োগ করে 'খ' কে তাঁর বাড়ি বিক্রয় করার জন্য চুক্তি করল। এক্ষেত্রে 'খ' এর ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে। সুতরাং এটি নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।

৩.ক.৪ নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির পার্থক্য

নিম্নে নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির পার্থক্য আলোচনা করা হল :

পার্থক্যের বিষয়—	নিষ্ফল সম্মতি	নিষ্ফল চুক্তি
সংজ্ঞা—	১) যে সম্মতি আইন দ্বারা প্রবর্তনীয় নয় এবং যার দ্বারা আইনগত কোন সম্পর্ক তৈরি হয় না, তাকে নিষ্ফল সম্মতি বলে।	১) যে চুক্তি গঠনের সময় বৈধ থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে এক বা একাধিক কারণে চুক্তিটি অপ্রবর্তনীয় হয়ে পড়লে তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে।
বৈশিষ্ট্য—	২) সম্মতিটি প্রথম থেকেই নিষ্ফল (Void ab-initio)।	২) কোন চুকি যা কোন এক সময় প্রবর্তনীয় ছিল পরবর্তীকালে আইনের পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে আর প্রবর্তনযোগ্য থাকে
বৈধতা	৩) নিষ্ফল সম্মতি কখনো কোনভাবেই বৈধ নয়।	না, তাকে নিষ্ফল চুক্তি বলে। ৩) চুক্তি যতক্ষণ না অপ্রবর্তনীয় হচ্ছে (নিষ্ফল) ততক্ষণ তা বৈধ থাকে।

নিষ্ফল সম্মতি (Void Agreements)

কোন কোন সম্মতি প্রতিদানের অভাব, চুক্তি করার অযোগ্যতার কারণে, বা ভুলের জন্য নিষ্ফল হয়ে থাকে। এই ধরনের সম্মতির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :

১. চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সম্মতি (১১ ধারা)।
২. চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে উভয় পক্ষের ভুল (২০ ধারা)।
৩. অবৈধ প্রতিদান দ্বারা গঠিত সম্মতি (২৩ ধারা)।
৪. সম্মতির বিষয়বস্তু যদি আংশিক অবৈধ হয় (২৪ ধারা)।
৫. প্রতিদান ছাড়া সম্মতি (২৫ ধারা)।

চুক্তির আবশ্যকি উপাদান হিসাবে বলা আছে যে, কোন চুক্তি যেন সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত না হয়। সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতি বৈধ চুক্তির উপাদান হতে পারে না। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কোন্ সম্মতিগুলি সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত। ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত সম্মতিগুলি নীচে বলা হল।

৬. বিবাহ প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৬ ধারা)।

৭. বাণিজ্য-প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৭ ধারা)।

৮. মামলায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী সম্মতি (২৮ ধারা)।

৯. অনিশ্চিত সম্মতি (২৯ ধারা)।

১০. বাজি ধরার সম্মতি (৩০ ধারা)।

১১. অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি (৫৬ ধারা)।

উপরে বর্ণিত (১-৮) নং সম্মতিগুলি পূর্ববর্তী কয়েকটি এককে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককে অন্যান্য সম্মতিগুলি আলোচনা করা হল।

৯. **অনিশ্চিত সম্মতি** (Uncertain Agreements)—"যে সম্মতির অর্থ সুস্পষ্ট নয়, অথবা, যে সম্মতি সম্পাদনের কোন নিশ্চয়তা নেই, তা অনিশ্চিত সম্মতি।"—২৯ ধারা। বৈধ সম্মতির ক্ষেতে আইন সম্মতির উভয়পক্ষের অধিকারের প্রকৃতি ও পরিধি এবং দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

উদাহরণ :

০ 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে দশ কেজি চাল বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে 'ক' কী ধরনের চাল বিক্রি করতে চায় তার কথা সম্মতিতে উল্লেখ ছিল না। স্বাভাবিখভাবেই সম্মতিটির বিষয়বস্তু অনিশ্চিত। তাই, এটি একটি অনিশ্চিত সম্মতি।

০ একজন বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট বস্তু খুব সামান্য দামে ক্রেতাকে বিক্রি করতে সম্মত হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট নয়। দাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্য সম্মতিটি অনিশ্চিত সম্মতি রূপে গণ্য হবে।

১০. **বাজি ধরার সম্মতি** (Agreements by way of Wager)—"বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি এবং বাজির অর্থ পাবার জন্য মামলা করা যায় না।"—৩০ ধারা।

বাজি ধরার সম্মতি অনিশ্চিত ঘটনা সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। যেমন-ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভবিষ্যতে সম্পাদিত কোন ক্রিকেট ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বাজি ধরার সম্মতি বাতিল সম্মতি। কারণ, ঐ ম্যাচের ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যে কোন দেশ এই খেলায় জিততে পারে। তাই খেলার ফলাফল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত ঘটনার উপর বাজি ধরলে সেটি বাতিল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে।

১১. **অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের সম্মতি** (Agreements for Impossible Events)—"কোন অসম্ভব ঘটনা সম্পাদনের উপর কোন কিছু করা বা কোন কিছু না করার সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।"—৫৬ ধারা।

উদাহরণ :

০ 'ক' যদি লাফিয়ে চাঁদ স্পর্শ করতে পারে 'খ' তাকে 5000 টাকা দিতে সম্মত হয়। লাফিয়ে চাঁদ স্পর্শ করা অসম্ভব ঘটনা। সুতরাং এই সম্মতি নিষ্ফল সম্মতি।

⊙ 'ক' যদি নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে 'খ' তাকে 2000 টাকা দিতে সম্মত হয়। কোন মানুষের পক্ষেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং নিষ্ফল সম্মতি।

৩.ক.৫ উপ-চুক্তি

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, পক্ষগণের মধ্যে সাধারণ রীতি অনুসারে, কোন চুক্ত সম্পাদিত হয় নি; যেমন, প্রস্তাব উত্থান বা প্রস্তাব দেওয়া, প্রস্তাব গ্রহণ, সায়দান বা প্রতিশ্রুতি না থাকা সত্ত্বেও দুই পক্ষের আচরণ দ্বারা চুক্তির মতোই দায় সৃষ্টি হয়। এইরকম ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হলে পক্ষদের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন হতো, সেই শর্তই আরোপ করা হবে। এইরূপ চুক্তিকে উপচুক্তি (Quasi Contract) বলে। ভারতীয় চুক্তি আইনের ৬৮-৭২ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত চুক্তিকে উপচুক্তি বলা হয়।

৩.ক.৫.১ অক্ষম ব্যক্তিকে জীবনধারনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ

চুক্তিতে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম এমন কোন ব্যক্তি অথবা আইনত যাকে তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকেন, তাকে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করেন, তা হলে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য সরবরাহ করলেন, তিনি ঐ চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তাঁর পাওনা পাবেন। —৬৮ ধারা।

উদাহরণ : 'A' 'B' নামক একজন উন্মাদ ব্যক্তিকে তার মান অনুসারে জীবন ধারনের জন্য আবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে 'B' এর সম্মতি থেকে 'A' এই দ্রব্যের মূল্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৩.ক.৫.২ ঋণপরিশোধকারীর প্রাপ্য শোধ

এক ব্যক্তি যে টাকা প্রদান করতে আইনত বাধ্য, তিনি টাকা প্রদান না করলে যে ব্যক্তির স্বার্থ ঐ কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তিনি ঐ টাকা প্রদান করলে প্রথম ব্যক্তির থেকে ঐ টাকা পাওয়ার অধিকারী। —৬৯ ধারা।

উদাহরণ : 'A' এর দেয় বকেয়া রাজস্ব মেটানোর জন্য ভুলবশত 'B' এর পন্য ক্রোক্ করা হয়েছিল। পন্য বাঁচানোর জন্য 'B' রাজস্ব মিটিয়ে দেয়। 'A' 'B' এর থেকে টাকা পাওয়ার অধিকারী। [Tulsa Kunwar Vs. Jageshor Prasad]

৩.ক.৫.৩ একতরফা উপকারের টাকা দেওয়া

যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য কিছু কাজ করেন অথবা বিনামূল্যে না করার উদ্দেশ্য

নিয়ে কোন কোন দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অপর ব্যক্তি যদি তার সুবিধাভোগ করেন, তাহলে সুবিধাভোগ করার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন অথবা পন্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। —৭০ ধারা।

উদাহরণ : 'A' একজন ব্যবসায়ী, ভুলক্রমে 'B' এর গৃহে কিছু দ্রব্য রেখে যায় এবং 'B' তা ব্যবহার করে। 'B' ঐ দ্রব্যের মূল্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

৩.ক.৫.৪ প্রাপ্তবস্তুর দখলকার

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দ্রব্য পেয়ে নিজের হেপাজতে রেখে দেন, তাহলে তিনি গচ্ছিত গ্রহীতার (Bailee) সকল দায় পালনে বাধ্য থাকবেন। —৭১ ধারা।

৩.ক.৫.৫ ভুল বা বল প্রয়োগদ্বারা প্রদত্ত অর্থ

ভুলবশত বা বল প্রয়োগদ্বারা কোন ব্যক্তিকে টাকা বা কোন বস্তু প্রদান করা হলে যে ব্যক্তি অর্থ বা বস্তু পেয়েছেন, তিনি সেই টাকা বা বস্তু দিতে বাধ্য থাকবেন। —৭২ ধারা।

উদাহরণ : 'A' এবং 'B' একসঙ্গে 'C' এর হাতে 100 টাকা ধার করে। 'A' একাই ঐ 100 টাকা 'C' কে প্রদান করে। পরে 'B' না জেনে 'C' কে আবার 100 টাকা প্রদান করে। 'C' 'B' কে ঐ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৩.ক.৬ ঘটনাপেক্ষ চুক্তি

৩.ক.৬.১ সংজ্ঞা

ঘটনাপেক্ষ চুক্তি বলতে এমন চুক্তিকে বোঝায় যেখানে কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা সংঘটিত হলে বা না হলে, কোন কাজ সম্পাদন করা বা না করা বোঝায় তাকে ঘটনাপেক্ষ চুক্তি বলে। —৩১ ধারা।

উদাহরণ : 'রাম' এবং 'শ্যাম' এর মধ্যে চুক্তি হলো 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 দেবে। ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ।

আনুষঙ্গিক ঘটনা : আনুষঙ্গিক ঘটনা বলতে চুক্তির দ্বারা প্রতিশ্রুত কোন কাজ বা প্রতিদান ছাড়া অন্য ঘটনাকে বোঝায়। নিম্নে বর্ণিত চুক্তিটি ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নয়।

উদাহরণ : 'ক' যদি 'খ' কে বিবাহ করে তবে 'গ' তাকে 5,000 টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

এখানে 'খ' কে বিবাহ করার পরে অঙ্গীকার প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ওপরে বর্ণিত উদাহরণে শ্যামের বাড়ি পুড়ে গেলে 'রাম' তাকে 10,000 টাকা প্রদান করবে, সুতরাং এটা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি। কারণ 'শ্যাম' এর বাড়ি পুড়ে যাওয়া আনুষঙ্গিক ঘটনা।

৩.ক.৬.২ ঘটনাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

ঘটনাপেক্ষ চুক্তির বৈশিষ্ট্য দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) চুক্তির সম্পাদনা কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এবং

(২) ঘটনাপেক্ষ চুক্তি যে ঘটনার উপর নির্ভর করে তা অনিশ্চিত। ঘটনা ঘটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে চুক্তি সম্পাদিত হবেই। সুতরাং ইহা ঘটনাপেক্ষ চুক্তি নয়।

৩.ক.৬.৩ ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলী

ঘটনাপেক্ষ চুক্তির নিয়মাবলীগুলি নিম্নরূপ—

(১) অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা হওয়া— কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনার উপরে চুক্তি নির্ভর করে। যতদিন পর্যন্ত ঐ ঘটনা সংঘটিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সেই চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু ঘটনা যদি অসম্ভব হয় তা হলে চুক্তিটি নিষ্ফল হবে। —৩২ ধারা।

উদাহরণ : যদি 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু ঘটে তবে 'A' 'C' এর ঘোড়টি ক্রয় করবে। এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'A' এর জীবনদশায় 'B' এর মৃত্যু না হলে এই চুক্তি বলবৎ করা যায় না।

(২) **অনিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনা না হওয়া**—কোন ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিতে হবে না এই মর্মে, চুক্তি বদ্ধ হলে যখন ঐ ঘটনা অসম্ভবে পরিণত হয় তখনই চুক্তিটি প্রবর্তনীয় হবে, তার পূর্বে নয়। —৩৩ ধারা।

উদাহরণ : কোন নির্দিষ্ট একটি জাহাজ যদি সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তন না করে তবে 'A' নামক ব্যক্তি 'B' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানে সম্মত হয়। জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। সুতরাং জাহাজের প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই চুক্তিটি প্রবর্তনীয়।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ের ফল**— কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কী কাজ করবে তার ওপর যদি চুক্তি নির্ভর করে তাহলে যদি ঐ ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ঐ কাজ অসম্ভবে পরিণত হয়, বা অন্য কোন ঘটনার সাপেক্ষে হয় তাহলে পূর্বের কাজ অসম্ভব বলে গণ্য হবে। —৩৪ ধারা।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' কে বিবাহ করে 'A' তবে 'B' কে কিছু অর্থ দিতে সম্মত হয়। 'B' 'D' কে বিবাহ করে। ফলত 'B' এবং 'C' এর বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন হতে পারে 'D' এর মৃত্যু হলে 'B' 'C' কে বিবাহ করতে পারে।

(৪) **নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠন**— যে চুক্তির কোন অনিশ্চিত ঘটনা নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সংগঠন সাপেক্ষ তা নিষ্ফল হবে। যদি ঐ ঘটনা নির্দিষ্ট কাল শেষে সংগঠিত না হয় বা তার পূর্বে অসম্ভবে পরিণত হয়।

(৫) **অসম্ভাব্যতা**— কোন অসম্ভব কাজ করা বা না করার জন্য যখন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে চুক্তির সময়ে উভয় পক্ষ এর অসম্ভব্যতা সম্পর্কে অবহিত থাকুক বা না থাকুক চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ : 'B' যদি 'C' এর কন্যা 'D' কে বিবাহ করে তবে 'C' 'B' কে 1,000 টাকা নগদ পুরস্কার দিবে। এই চুক্তির সময়ে 'C' জীবিত ছিল না। তাই এই চুক্তি নিষ্ফল হবে।

৩.ক.৭ সারাংশ

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম

- যে চুক্তির মধ্যে বৈধ চুক্তির সবক'টি অপরিহার্য উপাদান বর্তমান তাকে বৈধ চুক্তি বলে।
- বৈধ চুক্তি গঠনের পর অপরিহার্য উপাদানগুলির কোন একটি পরিবর্তন হয়ে গেলে চুক্তির বৈধতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন ইহা নিষ্ফল চুক্তিতে পরিণত হয়।
- যে সম্মতি প্রথম থেকেই নিষ্ফল তা নিষ্ফল সম্মতি।
- কোন এক পক্ষের ইচ্ছানুসারে যদি সম্মতিটি প্রবর্তনীয় হয় তাহা নিষ্ফলযোগ্য সম্মতি।
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি না থাকলেও উপচুক্তির দ্বারা চুক্তির মত সম্পর্ক তৈরি হয়।
- আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্পাদনের ওপর ভিত্তি করে ঘটনাপেক্ষ চুক্তি গঠিত হয়।

৩.ক.৮ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) বৈধ চুক্তি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন।

(২) নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফলযোগ্য সম্মতির সংজ্ঞা দিন।

(৩) বাজি ধরার সম্মতি কী ধরনের সম্মতি?

(৪) উপচুক্তি বলতে কী বোঝেন? ইহার একটি উদাহরণ দিন।

(৫) ঘটনাপেক্ষ চুক্তির উদাহরণ দিন।

(৬) ঘটনাপেক্ষ চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) নিষ্ফল সম্মতি ও নিষ্ফল চুক্তির সংজ্ঞা দিন। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(২) নিষ্ফল সম্মতিগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে আইনানুসারে উপচুক্তির সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করুন।

(৪) ঘটনাপেক্ষ চুক্তি কী? ইহার নিয়মাবলীগুলি লিখুন।

৩.ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৩ খ ❑ চুক্তি পালন, চুক্তি ভঙ্গ ও চুক্তির পরিসমাপ্তি

গঠন

৩.খ.১ উদ্দেশ্য

৩.খ.২ প্রস্তাবনা

৩.খ.৩ চুক্তি পালনের সংজ্ঞা

- ৩.খ.৩.১ চুক্তি পালনের প্রস্তাব
- ৩.খ.৩.২ বৈধ দাখিলের শর্ত সমূহ
- ৩.খ.৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

৩.খ.৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

- ৩.খ.৪.১ পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

৩.খ.৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

- ৩.খ.৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন;
- ৩.খ.৫.২ কোন কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই;

৩.খ.৬ চুক্তি ভঙ্গ

- ৩.খ.৬.১ চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

৩.খ.৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

- ৩.খ.৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি
- ৩.খ.৭.২ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

৩.খ.৮ সারাংশ

৩.খ.৯ অনুশীলনী

৩.খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.খ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা চুক্তি আইনরে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করব—

- চুক্তি পালন বলতে কী বোঝায়;
- কে বা কারা চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন;
- পরস্পর প্রতিশ্রুতির ধারনা ও তা পালনের নিয়মাবলী;
- প্রতিশ্রুতি পালনে স্থান ও সময়ের ভূমিকা;
- কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি পালনের প্রয়োজন হয় না;
- চুক্তিভঙ্গ কী, ইহার প্রকারভেদ, ইহার প্রতিকার;

- চুক্তিভঙ্গের খেসারত;
- চুক্তির পরিসমাপ্তি কীভাবে হয়;

৩.খ.২ প্রস্তাবনা

চুক্তির ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা যখন তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন, তখন বলা হয় চুক্তি পালন করা হয়েছে। চুক্তি পালনের সময় অবশ্যই চুক্তি পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী মানতে হবে। অন্যথায় বলা হবে চুক্তি পালন অবৈধ। চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে অসমর্থ হলে বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হলে বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার ক্ষতির আর্থিক মূল্য খেসারত হিসাবে পাওয়ার অধিকারী। আদালত নির্দিষ্ট উপায়ে এই খেসারতের পরিমান নির্ধারণ করেন। চুক্তির অন্তর্গত পক্ষসমূহের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি হল। বিভিন্ন উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে, যেমন—চুক্তি পালন, চুক্তির সকল পক্ষের সম্মতি দ্বারা, চুক্তির নবীকরণ দ্বারা, ...ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা। ভবিষ্যতে কোন কারণে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়লে উহাকে উত্তরাকালীন অসম্ভাব্যতা বলে। এই এককটি পাঠ করলে এইসব ব্যাপারে আরো গভীর ধারণা লাভ করতে পারব।

৩.খ.৩ সংজ্ঞা

চুক্তির দ্বারা আইনগত দায় সৃস্টি হয়। চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা উল্লিখিত সময় ও পদ্ধতি মেনে যখন নিজ নিজ দায় পালন করেন তখন বলা হয় চুক্তি পালন হল। চুক্তি অধিনিয়মের ৩৭ ধারায় (১ অনুচ্ছেদে) বলা হয়েছে, "যে সকল ক্ষেত্রে এই অধিনিয়ম বা অন্য কোন আইনের বিধান অনুসারে প্রতিশ্রুতি পালনের দায় হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করবেন অথবা পালন করার প্রস্তাব করবেন।"

৩.খ.৩.১ চুক্তি পালনের প্রস্তাব

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতা অনেক সময় সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। চুক্তি পালনের এই ধরনের প্রস্তাবকে দাখিল (tender) বলা হয়। যে ক্ষেত্রে এই রকম প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতাকে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। এমনকি চুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর যা অধিকার ছিল তা পূর্বের ন্যায় বর্তমান থাকে। বরঞ্চ প্রতিশ্রুতিদাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারেন। চুক্তি পালনের প্রস্তাব আসলে চুক্তির-ই প্রয়াস। —৩৮ ধারা।

৩.খ.৩.২ বৈধ দাখিলের শর্তসমূহ

নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালিত হলে বলা হয় দাখিল বিধিসম্মত হয়েছে :

(১) চুক্তি পালনের প্রস্তাব শর্তহীন হবে। চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিলের সঙ্গে কোন শর্ত আরোপ করা হলে দাখিল বিধিসম্মত হবে না।

উদাহরণ :

একটি বাসের আরোহী 50 পয়সা ভাড়ার জন্য একখানি এক টাকার নোট দাখিল করেন। একে বিধিসম্মত দাখিল বলে গণ্য করা হবে না। কারণ এর ফলে নোট গ্রহীতার উপর টাকার বাকি পয়সা ফেরত দেবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

[Bireswar V. The Emperor]

(২) চুক্তি পালনের প্রস্তাব যথাসময়ে ও যথাস্থানে করতে হবে। যথাসময়ে ও যথাস্থান বলতে কী বোঝাবে তা চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের অভিপ্রায় এবং চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারা সমূহ দ্বারা নির্ধারিত হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে বা চুক্তির উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে স্থান স্থির হয়েছে, তাছাড়া অন্যকোন স্থানে চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৩) কোন চুক্তির ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা থাকলে যে কোন একজন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব সকল প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট বৈধ প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে গণ্য হবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সরবরাহকৃত দ্রব্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে কিনা তা অপর পক্ষকে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ দিতে হবে।

(৫) এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকেই চুক্তি পালনের প্রস্তাব করতে হবে যিনি তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অন্য কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব করলে তা বিধিসম্মত হয় না।

(৬) কোন ব্যক্তি চুক্তি পালনের প্রস্তাব উত্থাপনের স্থানে ও সময়ে যে সমগ্র প্রতিশ্রুতি পালন করতে সমর্থ ও ইচ্ছুক তা নির্ধারণের জন্য, যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা হয়েছে, তাকে ন্যায্য সুযোগ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে আংশিক প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গণ্য করা হবে না।

(৭) চুক্তি পালনের প্রস্তাব প্রকৃত আকারে ও প্রকৃত ব্যক্তিকেই (প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধি) করতে হবে।

৩.খ.৩.৩ কে চুক্তি পালন করবেন?

(১) প্রতিশ্রুতি দাতা স্বয়ং (Promisor himself) — যেক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা নিজের চুক্তি পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন—(৪০ ধারা। যে সকল চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার ব্যক্তিগত নিপুনতা (Personal Skill), রুচি বা দক্ষতা বা সুনামের প্রশ্ন জড়িত, সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিজে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন।

উদাহরণ : 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' নামক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট তৈল চিত্র এঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এখানে 'ক' 'খ' কে ছবিটি এঁকে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) **প্রতিনিধি** (Agent) — যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা সুনামের ব্যাপারে জড়িত সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি চুক্তি পালন করতে পারেন— (৪০ ধারা)।

(৩) **আইনগত প্রতিনিধি** (Legal representatives) — যে চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিপুনতা, রুচি বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিশ্রুতি পালনের দায় শেষ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বা বিধিগত প্রতিনিধিদের (legal representatives) ওপর এই দায় বর্তায় না। ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় 'actio personalis persona'। এর অর্থ ব্যক্তিগত দায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু, যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে কোনরূপ ব্যক্তিগত নিপুনতা বা দক্ষতার প্রয়োজন লাগে না, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির বিধিগত প্রতিনিধিদের ওপর প্রতিশ্রুতি পালনের দায় বর্তাবে।

বিধিগত প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। [New India Motor (Pvt.) Ltd. V. Smt. S. P. Duggal, (1982)]

উদাহরণ :

(ক) 'ক' কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে 5,000 টাকার বিনিময়ে 'খ' কে নির্দিষ্ট একটি বস্তু দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বেই 'ক'-এর মৃত্যু হয়। 'ক' এর বিধিগত প্রতিনিধিরা পূর্ব নির্ধারিত দিন ও পূর্বনির্ধারিত স্থানে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু 'খ' কে সরবরাহ দিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যদিকে 'খ' 5,000 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) 'ক' 'খ' কে একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি ছবি এঁকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বে 'ক' এর মৃত্যু ঘটল। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন 'ক' এর ব্যক্তিগত নিপুনতার সঙ্গে জড়িত। তাই 'ক' এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধিগত প্রতিনিধিরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবেন না।

(৪) **তৃতীয় পক্ষ** (Third Party) — প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রতিশ্রুতি পালন স্বীকার করলে, পরে তিনি প্রতিশ্রুতি পালন বলবৎ করতে পারেন না (৪১ ধারা)।

(৫) **যৌথ প্রতিশ্রুতি দাতা** (Joint Promisor) —দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যুগ্মভাবে প্রতিশ্রুতি দিলে, তারা যুগ্মভাবে ঐ প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য থাকবেন, যদি না চুক্তিতে বিরুদ্ধ কোন মতের কোন উল্লেখ থাকে। যুগ্মভাবে যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাদের কোন একজনের মৃত্যু হলে ঐ মৃতু ব্যক্তির দায় তাঁর বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের (legal representatives) ওপর বর্তাবে এবং মৃত ব্যক্তির ঐ প্রতিনিধিবর্গ জীবিত প্রতিশ্রুতি দাতা বা প্রতিশ্রুতিগণের সঙ্গে যুগ্মভাবে ঐ দায় পালনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন। যেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাদের মধ্যে কেউই আর জীবিত নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিধিগত প্রতিনিধিবর্গের ওপর যুগ্মভাবে দায় বর্তাবে ও প্রতি সংক্রামিত হবে — (৪২ ধারা)।

৩.খ.৪ পরস্পর প্রতিশ্রুতি

একজনের প্রতিদান সাপেক্ষে যখন অন্যজনের প্রতিদান সম্পাদিত হয়, তাকে 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি' বলে—[২(এফ্)ধরা]। যেমন- 'খ' এর কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'ক' যখন

কিছু করা বা না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন এই ধরনের প্রতিশ্রুতিকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলে। Jones V. Barkley বিখ্যাত মোকদ্দমায় রায় দান কালে Lord Mansfield পরস্পর প্রতিশ্রুতিকে নিম্নলিখিত তিনভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছেন :

(১) পৃথক এবং স্বাধীন (Mutual and independent) — এক্ষেত্রে প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর অপেক্ষা না করে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

উদাহরণ : কোন একটি বিক্রয় চুক্তিতে, 'ক' মাসের প্রথম পণ্যের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। 'খ' মাসের ১৫ তারিখে 'ক' কে পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিগুলি পৃথক ও স্বাধীন।

(২) শর্তাধীন ও নির্ভরশীল (Conditional and dependent) —এক্ষেত্রে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনের উপর নির্ভরশীল। এক পক্ষ যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করেন তাহলে অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করেন না।

উদাহরণ : 'ক' পঞ্চাশ (50) টাকা আগাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে 'খ' 'ক' এর একখানি কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক্ষেত্রে 'খ' আগাম অর্থ না পেয়ে 'ক' এর কাজ খানি করবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি শর্তাধীন ও নির্ভরশীল।

(৩) পৃথক ও যুগপৎ (Mutual and concurrent) —এক্ষেত্রে চুক্তির উভয়পক্ষ একই সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করে থাকেন।

উদাহরণ : বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে নগদে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পৃথক ও যুগপৎ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়ে থাকে।

৩.খ.৪.১ পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী

চুক্তি আইনের ৫১ থেকে ৫৪ ধারায় পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলীর উল্লেখ আছে। নিয়মাবলীগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

(১) পরস্পর প্রতিশ্রুতি যুগপৎ পালন (Simultaneous performance of reciprocal promises) —৫১ ধারা।

যে চুক্তির ক্ষেত্রে উভয় প্রতিশ্রুতি একই সঙ্গে পালন করতে হবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তার প্রতিশ্রুতি পালনে সম্মত এবং প্রস্তুত না হলে, প্রতিশ্রুতিদাতার নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে 'ক' একটি নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করবে এবং 'খ' বস্তুটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে 'ক' এর ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না যদি 'খ' ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট মূল্য দিতে সম্মত বা প্রস্তু না হন। অথবা 'খ'-র নির্দিষ্ট মূল্য করার প্রয়োজন নেই যদি 'ক' ঐ নির্দিষ্ট বস্তু সরবরাহে সম্মত বা প্রস্তুত থাকেন।

(২) পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের পর্যায়ক্রমে (Order of performance of reciprocal promises) —৫২ ধারা।

যেক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন্‌টি আগে পালন করতে হবে, তার ক্রম (order) চুক্তিতে

ব্যক্ত ভাবে উল্লেখ করা আছে, সেক্ষেত্রে সেইরকম ক্রমানুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। যেক্ষেত্রে এরূপ কোন ক্রম ব্যক্তভাবে উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে লেনদেনের প্রকৃতি বিচার করে প্রতিশ্রুতি পালনের ক্রম নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ :

(i) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে, 'ক' 'খ'-র পছন্দমতো একটি অলংকার গড়ে দিলে 'খ' তাকে নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করবে। এক্ষেত্রে 'খ'-র টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালনের আগে 'ক'-র অলংকার গড়ার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

(ii) 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে, 'খ' নির্দিষ্ট মূল্যের কোন সম্পত্তি জমা (security) হিসাবে রাখলে 'ক' তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন। 'খ' যদি ঐ নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি জমা না রাখেন তাহলে 'ক'-র প্রতিশ্রুতি পালনের প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে চুক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে 'খ' তার প্রতিশ্রুতি মত সম্পত্তি জমা রাখলে তবেই 'ক' নির্দিস্ট পরিমাণ টাকা ধার দেবেন।

(৩) **কোন এক পক্ষের কার্য দ্বারা অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা** (Effect of one party preventing another from performing promises) —৫৩ ধারা।

পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তির কোন এক পক্ষ অপরপক্ষকে প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত পক্ষের ইচ্ছানুসারে চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে। চুক্তি পালন না হওয়ার জন্য বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হবে তা তিনি অপর পক্ষের থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবার অধিকারী।

উদাহরণ : 'ক' ও 'খ'-র মধ্যে চুক্তি হল যে 'ক' 500 টাকার বিনিময়ে 'খ'-র নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে দেবেন। 'ক' ঐ কাজ করতে সম্মত ও প্রস্তুত। এমন অবস্থায় 'খ' 'ক' কে তার প্রতিশ্রুতি পালনে বাধা দান করেন। এক্ষেত্রে 'ক'-র ইচ্ছানুসারে, চুক্তিটি নিষ্ফলযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি পালিত না হওয়ার জন্য 'ক'-র ক্ষতি হল তাহা 'খ'-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী।

(৪) **প্রথমে প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যর্থতার পরিণাম** (Effect of default as to promise to be performed first) —৫৪ ধারা।

যখন পরস্পর প্রতিশ্রুতির কোন চুক্তি এমনভাবে সম্পাদিত হয় যে এক পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালিত না হলে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব নয়, তখন অপর পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রতিশ্রুতি দাতা অপর পক্ষকে পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করতে পারেন না। এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য অপর পক্ষের যে ক্ষতি হবে তাহা তিনি পূরণ করবেন।

উদাহরণ : 'ক' এর সঙ্গে মিষ্টির দোকানের মালিকের সঙ্গে চুক্তি হল তিনি 'ক' কে নির্দিষ্ট মূল্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিষ্টি সরবরাহ করবেন। এদিকে 'ক' অন্য এক ব্যক্তির ('গ') সঙ্গে অনুষ্ঠান বাড়িতে মিষ্টি সরবরাহের জন্য চুক্তি বদ্ধ হন। চুক্তি পালন করতে না পারলে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের কথাও চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দিষ্ট দিনে মিষ্টির দোকানের মালিক চুক্তিমত মিষ্টি সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় 'গ' কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। 'ক' এই আর্থিক ক্ষতিপূরণ মিষ্টির দোকানের মালিকের থেকে পাবার অধিকারী।

(৫) বৈধ ও অবৈধ কার্যের পরস্পর প্রতিশ্রুতি (Legal and illegal performanece of reciprocal promise) — ৫৭ ধারা।

যদি পরস্পর চুক্তিতে বৈধ ও অবৈধ উভয় রকম কার্য করার প্রতিশ্রুতি থাকে তাহলে বৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি হল বলবৎ যোগ্য চুক্তি। কিন্তু, অবৈধ কার্যের প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে।

৩.খ.৫ প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময়

কোন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের সময় ও স্থান সাধারণত চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের দ্বারা নির্ধারিত হবে। চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালনের স্থান ও সময় সম্পর্কীয় সাধারণ নিয়মাবলী চুক্তি আইনের ৪৬-৫০ ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(১) যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়, এবং যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দিষ্ট কোন সময় দেওয়া থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকে যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। কোন চুক্তির ক্ষেত্রে 'যুক্তিসঙ্গ ত সময়' ঐ চুক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থা তা স্থির করে—৪৬ ধারা।

(২) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে রাজি হয়েছেন, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা ঐ নির্দিষ্ট দিনের স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করবেন—৪৭ ধারা।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি পালনে রাজি হন নি, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতাকে উপযুক্ত স্থানে ও স্বাভাবিক কাজ কর্মের সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আবেদন করতে হবে। উপযুক্ত স্থান ও সময় বলতে কী বোঝাবে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থান উপর নির্ভর করবে—৪৮ ধারা।

(৪) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার বিনা আবেদনে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে এবং প্রতিশ্রুতি পালনের কোন স্থান নির্ধারিত হয় নাই, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার নিকট যুক্তিসঙ্গত স্থান নির্ধারণের জন্য আবেদন করা এবং ঐ নির্ধারিত স্থানে প্রতিশ্রুতি পালন করা প্রতিশ্রুতি দাতার কর্তব্য — ৪৯ ধারা।

(৫) প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার ব্যবস্থা মতে বা অনুমোদনক্রমে যে কোন ভাবে বা যে কোন সময়ে চুক্তি পালন করা যেতে পারে—৫০ ধারা।

৩.খ.৫.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালন

অনেক সময় চুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ে বা তার পূর্বে চুক্তি পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে লেনদেনের স্বরূপ বিবেচনা করে আদালত স্থির করবেন যে, চুক্তিতে উল্লিখিত সময় চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা। চুক্তিতে সময়ের উল্লেখ করা থাকলেই তা চুক্তির অপরিহার্য অংশ হতে পারে না। চুক্তির গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করলেই বোঝা যায় 'নির্দিষ্ট সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ কিনা।

চুক্তিতে বর্ণিত সময় অনুসারে চুক্তি পালিত না হলে তার যা পরিণাম হয়, তা চুক্তি আইনের ৫৫ ধারায় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

(১) 'সময়' যদি চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিশ্রুতি পালিত না হয়, তাহলে ঐ চুক্তি (বা তার যে অংশ পালিত হয় নাই) প্রতিশ্রুতি-গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে নিষ্ফলযোগ্য (Voidable) হবে।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রতিশ্রুতি পালন গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এই প্রকার গ্রহণের সময়, বিলম্বে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে 'সময়' চুক্তির অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচিত হয় না, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুকি পালিত না হলে চুক্তি বাতিলযোগ্য হবে না। কিন্তু এর জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

৩.খ.৫.২ কোন চুক্তি পালন করার প্রয়োজন নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তি আর পালন করার প্রয়োজন হয় না :

(১) চুক্তি সম্পাদন যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে—৫৬ ধারা।

(২) চুক্তিভুক্ত পক্ষদের পারস্পরিক সম্মতিতে যখন চুক্তির নবীকরণ, পরিবর্তন বা রদকরণ করা হয়, তখন পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না—৬২ ধারা।

(৩) চুক্তি মকুব করা হলে পুরানো চুক্তি আর পালন করতে হয় না—৬৩ ধারা।

(৪) যে চুক্তি কোন একপক্ষের ইচ্ছানুসারে বাতিলযোগ্য সেক্ষেত্রে কোন একপক্ষ যদি চুক্তি রদ বা বাতিল করেন তাহলে চুক্তির অপর পক্ষকে আর চুক্তি পালন করতে হয় না—৬৪ ধারা।

(৫) যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা প্রতিশ্রুতি দাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপযুক্ত ও যুক্তি সঙ্গত সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন না, সেক্ষেত্রে এই উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করা থেকে অব্যহতি পেতে পারেন—৬৭ ধারা।

৩.খ.৬ চুক্তিভঙ্গ

চুক্তির ক্ষেত্রে যে দায় থাকে তা ভঙ্গ করার অর্থই হল চুক্তিভঙ্গ করা। আইনগত কোন কারণ ছাড়া যখন চুক্তিভঙ্গ কোন পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী দায় পালন করেন না তখন বলা হয় চুক্তিভঙ্গ হল।

চুক্তিভঙ্গ কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (১) প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ (Actual Breach of Contract) এবং (২) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract)।

(১) **প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ** (Actual Breach of Contract) —চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে বা চুক্তি পালনের সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে

অথবা প্রতিশ্রুতি পালন করতে অস্বীকার করলে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ দুটি সময় হয়ে থাকে

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে, এবং

(খ) চুক্তি পালন করার সময়।

(ক) চুক্তি পালনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে যখন চুক্তির কোন পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালনের দায় অস্বীকার করেন, তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট মূল্যে 100 বস্তা সিমেন্ট ১৫ই মার্চে সরবরাহ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। ১৫ই মার্চে সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'ক' দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হল।

এক্ষেত্রে যদি সিমেন্ট সরবরাহের 'সময়' চুক্তির অত্যাবশ্যক অংশ না হয়, এবং 'ক' যদি ১৫ই মার্চের পর তার প্রতিশ্রুতি পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে 'খ' তা গ্রহণ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে 'খ' এর যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি তা দাবি করতে পারেন। তখন এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে 'ক' কে অবশ্যই আগাম নোটিশ দিতে হবে।

(খ) যদি চুক্তি পালন করার সময় চুক্তির কোন এক পক্ষ তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে অসমর্থ হন বা প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করেন তখন বলা হয় প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ হল।

উদাহরণ : 'ক' একটি রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে 3000 টন রেলওয়ে চেয়ার সরবরাহ করতে সম্মত হন। 1787 টন চেয়ার সরবরাহের পর রেলওয়ে কোম্পানি 'ক' কে আর চেয়ার সরবরাহ করতে বারণ করেন। এক্ষেত্রে রেলওয়ে কোম্পানি তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে চুক্তিভঙ্গ করেছে। এক্ষেত্রে 'ক' চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারের জন্য মামলা করতে পারেন।

[Cort V. Ambergate etc. Rly. Co. (1851)]

(২) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ (Anticipatory Breach of Contract) —

চুক্তি পালনের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই যদি প্রতিশ্রুতি দাতা চুক্তি পালনের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন বা চুক্তির দায় প্রত্যাখান করেন, অথবা নিজের কার্যদ্বারা নিজেকে চুক্তি সম্পাদনে অসমর্থ করে তোলেন, তবে তখন পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ ঘটে।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' 'খ' ২৭ শে নভেম্বর-এ বিবাহ করার জন্য সম্মত হয়। ২৫ শে অক্টোবরে 'খ' 'গ' কে বিবাহ করেন। এক্ষেত্রে 'খ' পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ করেন।

(খ) 'ক' 'খ' কে ২২ শে মার্চ তারিখ তার ভ্রমন সংস্থার কাজে নিযুক্ত করেন। চুক্তিতে স্থির হয় ১ লা জুন হতে সে কাজে যোগদান করবে। কিন্তু ১লা জুনের পূর্বেই ২০শে মে তারিখে 'ক' চিঠি দিয় 'খ' এর নিযুক্তি বাতিল করে দেন। 'খ' 'ক'-র বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে আদালতে নালিশ করেন ও আদালতের বিচারে জয়লাভ করেন। [Hachester V. Delatour]

পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ হলেই যে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে এমন কোন কথা নেই। পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গের ফলে যে পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত (Aggrieved Party) হল তিনি যদি তখন তাকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ বলে মেনে নেন, তবেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং তখন প্রয়োজনে চুক্তিভঙ্গের জন্য মোকাদ্দমা করতে

পারেন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ (aggrieved party) পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গকে প্রকৃত চুক্তিভঙ্গ না মেনে চুক্তি বজায় রাখতেও পারেন এবং অপরপক্ষ পরে চুক্তি পালন করতে পারেন।

আইনগত কারণে যদি চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবির অধিকার থাকে না।

৩.খ.৬.১ চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার

চুক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায় সৃষ্টি হয়। চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার পাওয়া না গেলে চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট অধিকারের কোন মূল্য নেই। চুক্তিভঙ্গের প্রতিকার বলতে বোঝায় আইনের দ্বারা চুক্তির সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ভাবে প্রতিকার পেয়ে থাকেন :

১. চুক্তি রদ করা (Rescission of the contract);
২. খেসারতের জন্য মোকদ্দমা (Suit for damages);
৩. অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা (Suit upon Quantum Meruit);
৪. নির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific Performance of the Contract);
৫. নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা (Suit for Injunction);

১। চুক্তি রদ করা (Rescission of the contract) ঃ

কোন এক পক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গ হলে চুক্তির অপর পক্ষ চুক্তিটি বাতিল বলে মনে করতে পারেন এবং চুক্তি পালনের দায় থেকে অব্যাহতি দ্বারা চুক্তির অন্তর্গত সকল প্রকার দায় থেকে মুক্তিলাভ করেন।

উদাহরণ :

(ক) এক দোকানদার এক বাড়ি নির্মাতাকে বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের দিন নির্দিষ্ট মূল্যে ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করতে সম্মত হন। নির্দিষ্ট দিনে দোকানদার ১০০ বস্তা সিমেন্ট সরবরাহ করেন নি। বাড়ি নির্মাতা অন্য জায়গা থেকে সিমেন্ট কিনে তার কাজ চালিয়ে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাতা চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য করবেন এবং সিমেন্টের মূল্য প্রদানের জন্য কোন দায় তাঁর থাকবে না।

(খ) এক বাড়ির মালিক একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে তার বাড়ি মেরামতির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বাড়ির মালিক কোন কোন জায়গা মেরামতি করতে হবে তা দেখিয়ে দিতে অবহেলা করেন বা অস্বীকার করেন। বাড়ির মালিকের এই অবহেলার জন্য ঐ মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি। এই অবহেলার জন্য মিস্ত্রীর পক্ষে মেরামতি কার্য সম্ভব না হলে মিস্ত্রী এই চুক্তি পালন করা থেকে অব্যাহিত পাবে।

চুক্তি আইনের ৬৭ ধারা অনুসারে, প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা যদি প্রতিশ্রুতিদাতাকে প্রতিশ্রুতি পালনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন, সেই সুযোগের অভাবে প্রতিশ্রুতি পালন যতটুকু সম্ভব না হয় তার জন্য প্রতিশ্রুতি দাতার কোন দায় থাকে না।

২। খেসারতের জন্য মোকদ্দমা (Suit for Damages) ঃ

চুক্তিভঙ্গের জন্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ

দেওয়া হয় তাকে খেসারত বলে। চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা দূর করার জন্য তাকে খেসারত দেওয়া হয়। চুক্তিভঙ্গ না হয়ে যদি চুক্তি সম্পাদিত হত, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে) যে সুবিধা ভোগ করতেন চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে তার সমতুল্য খেসারত তাকে দেওয়া হয়। এটাকে তাই অনেক সয়ম পুনরুদ্ধারের নীতি বলা হয় (The doctrine of restitution or restitutio in integrum)।

উদাহরণ :

'ক' 500 টাকা দরে 5 কুইন্টাল চাল 'খ' বিক্রয় করতে সম্মত হন। চাল সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ই 'খ' চালের মূল্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। চালের দাম বেড়ে 550 টাকা প্রতি কুইন্টাল হওয়ায় 'ক' 'খ' কে চাল বিক্রয় করতে অস্বীকার করেন। 'খ' প্রতি কুইন্টাল 50 টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

(৩) অর্জিত পরিমাণ সূত্রানুযায়ী মামলা (Suit upon Quantum Meruit) ঃ

"Quantum Meruit" কথার আভিধানিক অর্থ হল "যত খানি উপার্জন করা হয়েছে"। যখন কোন ব্যক্তি চুক্তির অংশ হিসাবে কিছু কার্য (আংশিক কার্য) করেন এবং চুক্তির অপর চুক্তি রদ করেন বা এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার দ্বারা চুক্তির বাকি কার্য করা সম্ভব হয় না, তখন যে ব্যক্তি চুক্তির অধীনে আংশিক কার্য করেছেন, তিনি পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করা নাও থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে করা যেতেই পারে যে কাজে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। তাই এক্ষেত্রে নিয়োগকারী জন্য বা অন্য কোন কারণে চুক্তি বাতিল হলে কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি তার কার্যের আনুপাতিক হারে মূল্য বা পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য মোকদ্দমা করতে পারেন।

(৪) বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালন (Specific Performance of the Contract) ঃ

কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য খেসারতের (damages) পর্যাপ্ত প্রতিকার হয় না। এই সব ক্ষেত্রে আদালত কোন পক্ষকে চুক্তির শর্ত অনুসারে চুক্তি পালন করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন—

(ক) যে চুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ (damages) কে চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার বলে মানা হয় না।

(খ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের কারণে যে ক্ষতি হয় তা পরিমাপ করার, কোন নির্ধারিত পদ্ধতি (Standard measures) নেই।

(গ) যে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গের জন্য কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন সম্ভাবনা নেই।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত বিনির্দিষ্ট চুক্তি পালনের নির্দেশ দেন না। যেখানে—

(ক) খেসারত চুক্তিভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার;

(খ) চুক্তি উভয় পক্ষের কাছে অনিশ্চিত ও অপর্যাপ্ত;

(গ) অছি (trustee) বিশ্বাসভঙ্গ করে চুক্তিস্থাপন করে;

(ঘ) ব্যক্তিগত ব্যাপারে চুক্তি, যেমন বিবাহের চুক্তি;

(ঙ) চুক্তি বাতিলযোগ্য প্রকৃতির;

(চ) কোম্পানির পরিমেল বন্ধ (Memorandum of Association) -র ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন কার্য করা হয়।

৫) **নিষেধাজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা** (Suit for Injunction) ঃ

চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি চুক্তি বর্হিভূত কোন কার্য করেন তাহলে আদালত ঐ পক্ষকে ঐ রকম কার্য হতে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারি করতে পারেন।

উদাহরণ :

(ক) 'ক' নামক ব্যক্তি 'খ' এর থিয়েটারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গান গাওয়ার চুক্তি করেন। চুক্তিতে এটাও স্থির হয় যে, তিনি অন্য কোথাও গান গাইবেন না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই 'ক' অন্য একটি ব্যক্তি 'গ'-র থিয়েটারে অধিক পারিশ্রমিকে গান গাওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত হন এবং 'খ'-র থিয়েটারে গান গাইতে অস্বীকার করেন। আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'ক' কে 'গ'-র থিয়েটারে গান গাওয়া হতে বিরত করতে পারেন [Lumely V. Wagner]।

(খ) 'ক' নামে এক অভিনেত্রী এক বৎসরের জন্য শুধুমাত্র Warner Bros-এর সঙ্গেই অভিনয় করতে চুক্তি বদ্ধ হন। সেই বছরের মধ্যেই অন্য এক সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। বিচারে ধার্য হয়, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা 'ক' কে Warner Bros ছাড়া অন্য কোন সংস্থার সঙ্গে অভিনয় করা হতে বিরত করা যেতে পারে।

[Warner Bros. V. Nelson]

খেসারতের প্রকারভেদ (Types of Damages)

কোন চুক্তিভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ চুক্তিভঙ্গকারী পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ পায়, তাকে ক্ষতিপূরণ বা খেসারত (Damage) বলে। আদালত যে তিন ধরনের খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন তা নীচে আলোচনা করা হল :

(১) **পূরক খেসারত** (Compensatory Damage) —চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে যথার্থ ক্ষতির সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হলে তাকে পূরক খেসারত বলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চুক্তিভঙ্গের ফলে কোন পক্ষের যদি 25,000 টাকা ক্ষতি হয়, এবং আদালত যদি চুক্তিভঙ্গকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেন যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 25,000 টাকা দিতে, তখন তাকে পূরক খেসারত বলা হবে।

(২) **নামমাত্র খেসারত** (Nominal Damage) — যে ক্ষেত্রে আদালত মনে করেন বাদীর ক্ষতির পরিমাণ বেশি নয় বা আদালতের মতে বাদী পক্ষের প্রকৃত কোন ক্ষতি হয় নি, সেক্ষেত্রে আদালত বাদী পক্ষকে ডিক্রী পাবার অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে নামমাত্র খেসারত (যেমন ১ পয়সা বা ১ টাকা) মঞ্জুর করে থাকেন।

(৩) **শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত** (Punitive, Exemplary, or Vindictive Damages) —শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই আদালত প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি খেসারত প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকেন। বিবাদী পক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যই এরূপ শাস্তিমূলক খেসারতের আদেশ দেওয়া হয়। একে শাস্তিমূলক শিক্ষনীয় বা প্রতিহিংসামূলক খেসারত বলে। সাধারণত, বিবাহের চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে ও ব্যাঙ্কে টাকা থাকা সত্ত্বেও চেক ফেরত যাবার ক্ষেত্রে এই জাতীয় খেসারত বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৩.খ.৭ চুক্তির পরিসমাপ্তি

সংজ্ঞা : চুক্তিভুক্ত পক্ষদের মধ্যে যখন আইনগত সম্পর্ক শেষ হয় তখন বলা হয় চুক্তির পরিসমাপ্তি (termination of contract) বা চুক্তির দায়মুক্তি (discharge of contract) হয়েছে। চুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্ট অধিকার ও দায় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বলা হয় চুক্তির দায়মুক্তি ঘটেছে। সাধারণত নিম্নলিখিত উপায়ে চুক্তির পরিসমাপ্তি বা দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

১. চুক্তি পালন দ্বারা (Discharge by Performance) ঃ

চুক্তিতে যা করতে বলা হয়েছে যদি তা করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বলা হয় চুক্তি পালন হয়েছে। এইভাবে চুক্তি পালন দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। চুক্তির অন্তর্গত সকল পক্ষই যখন তার চুক্তিগত দায় পালন করেন, তখন সকল পক্ষই চুক্তির দায়মুক্ত হন এবং চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

চুক্তি পালনের প্রস্তাব বা দাখিল (tender) দ্বারা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। [এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

২. সকল পক্ষের সম্মতির দ্বারা (Discharge by Mutual Agreement) ঃ

কোন চুক্তি যেমন চুক্তিভুক্ত পক্ষের মধ্যে সম্মতির দ্বারা সৃষ্টি হয়, তেমনি আবার পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বোঝাপড়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা যায়। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন চুক্তি গঠনের দ্বারা পুরনো চুক্তি পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তির পক্ষসমূহের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে চুক্তির রদকরণ (Rescision), পরিবর্তন (Alteration), নবীকরণ (Novation), মকুব (Remission), স্বেচ্ছা ও সন্তুষ্টি (Accord & Satisfaction) বা পরিহার (Waiver) দ্বারা পুরাতন চুক্তির অব্যাহতি ঘটে। চুক্তি আইনের ৬২ ধারা অনুসারে চুক্তি রদকরণ (Rescission) বা পরিবর্তন (Alteration) করা হলে মূল চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চুক্তির উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে :

(i) নবীকরণ (Novation) [৬২ ধাণা] ঃ

নিম্নলিখিত দুটি ক্ষেত্রে চুক্তির নবীকরণ হতে পারে যখন—

(ক) চুক্তির পক্ষসমূহ পুরনো বিদ্যমান চুক্তির পরিবর্তে নতুন চুক্তি গঠন করেন, বা

(খ) চুক্তির পক্ষ সমূহ বিদ্যমান চুক্তি রদ করেন এবং কোন একজন নতুন পক্ষের সঙ্গে নতুন ভাবে চুক্তি গঠন করা হয়। এইরূপ ঘটনার সবথেকে পরিচিত উদাহরণ হল—যখন কোন দেনাদার (Creditor) মূল পাওনাদারের (debtor) অনুরোধে অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পাওনাদার বলে মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মূল পাওনাদার তার দায় পালন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তবে এই নবীকরণের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষের সায় প্রয়োজন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 2000 টাকার জন্য 'খ'-র নিকট ঋণী। এবং 'খ' 2000 ক্ষাকার জন্য 'গ'-র কাছে

ঋণী। সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে 'খ'-র নিকট 'ক'-র ঋণ এবং 'গ'-র নিকট 'খ'-র ঋণ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং 'গ' 'ক' কে নবীকরণের দ্বারা ঘাতকরূপে গ্রহণ করেন।

(২) 'ক' 'খ'-এর নিকট হতে 20,000 টাকা ধার করল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দেবার চুক্তি হল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তে 'ক' 'খ'-র ঋণ পরিশোধ করতে পারল না। 'খ' 'ক'-র সঙ্গে নতুনভাবে এই চুক্তির করল যে 'ক' তাহার সুন্দর গাড়িখানি 'ক' কে দেবে, পরিবর্তে 'খ' 'ক' কে ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেবে। 'ক' সম্মত হল। ফলে নবীকরণ সম্ভব হল।

(ii) পরিবর্তন (Altertion) [৬২ ধাণা] ঃ

যে ক্ষেত্রে চুক্তির পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে বিদ্যমান চুক্তির এক বা একাধিক শর্ত পরিবর্তন করা হয় তখন বিদ্যমান চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে তার বাড়ি বিক্রি করার চুক্তি করেন। তারা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার দ্বারা চুক্তির বেশ কিছু শর্ত পরিবর্তন করেন। এর ফলে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(iii) রদকরণ (Rescission) [৬২ ধাণা] ঃ

চুক্তির অন্তর্গত কয়েকটি বা সবকটি শর্ত বাতিল করা হলে বলা হয় চুক্তি রদকরণ হয়েছে। রদকরণ নিম্নলিখিত ভাবে হয়ে থাকে—

(১) চুক্তির পক্ষ সমূহের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে, বা

(২) চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালন না করলে বা চুক্তি পালন করতে ব্যর্থ হলে, চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে চুক্তি রদকরণ করতে পারেন।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে নির্দিষ্ট মূল্যে তার বাড়ি খানি বিক্রির জন্য চুক্তি করেন। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে 'ক' ও 'খ' পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা চুক্তিটি বাতিল করে দেন। এক্ষেত্রে বলা হবে, চুক্তির রদকরণ করা হয়েছে।

(২) 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে চুক্তি হয় যে 'ক' জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে একটি অলংকার প্রস্তুত করে দেবেন। এবং অলংকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'খ' উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করবেন। কিন্তু 'ক' নির্দিষ্ট দিনে 'খ' কে অলংকার সরবরাহ করতে পারে নি। 'খ' এখানে চুক্তি রদ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চুক্তি পালনের দায় মেটাতে হবে না, অর্থাৎ অলংকারের জন্য উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তবে 'ক'-র চুক্তি পালনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও 'খ' ইচ্ছা করলে চুক্তিটি স্বীকার করে নিতে পারেন।

(iv) মকুব (Remission) [৬২ ধাণা] ঃ

চুক্তিতে যা দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি ছিল তা অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণ করতে স্বীকৃত হওয়াকেই মকুব বলে। চুক্তি আইনের ৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাকে প্রতিশ্রুতির পালন আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পরিহার বা মকুব করতে পারেন বা চুক্তি পালনের সময়সীমা বর্দ্ধিত করতে পারেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তাঁর দাবি মকুবের জন্য কোনরূপ প্রতিদান দাবি করতে পারেন না। [Hari Chand Madan Gopal V. State of Punjab (1973)]।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছ থেকে 1,000 টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করেছিল। ঐ মাসের ৩১

তারিখে সমস্ত টাকা দেবার কথা ছিল। 'ক' মাসের শেষে (৩১ তারিখে) কেবল মাত্র 800 টাকা জোগাড় করতে পারল এবং 'খ' কে স্বীকার করতে বলল। 'খ' 'ক'-র 800 টাকা গ্রহণ করল এবং বাকি টাকার ঋণ (200 টাকা) মকুব করল।

(v) **সম্মতি ও সন্তুষ্টি** (Accord & Satisfaction) ঃ

ইংল্যান্ডের আইনে এই দুটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য জিনিষ অপেক্ষা কিছু কম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি যথার্থ প্রতিদানের অভাবে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেখানে মোট পাওনা থেকে কম অর্থ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়ে গেছে ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা স্বেচ্ছায় দায় পালন করেছেন, সেখানে পুরাতন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। এখানে প্রাপ্য অপেক্ষা কম গ্রহণ করা "সম্মতি" (Accord) ও কম দায় পালন করা বা কম অর্থ প্রদান করাকে "সন্তুষ্টি" (Satisfaction) বলে।

উদাহরণ : 'ক' 'খ'-র কাছে 500 টাকার জন্য ঋণী। 'খ' 'ক' এর কাছ থেকে 400 টাকা পাইল। 'খ' এই 400 টাকা পেয়ে তাহার দাবি মিটিয়ে নিতে সম্মত হলেন। ইংল্যান্ডের চুক্তি আইনে ইহাকে বলবৎ করা যায় না। কিন্তু যেহেতু 400 টাকা পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই সম্মতি ও সন্তুষ্টির দ্বারা পুরনো চুক্তির দায় শেষ হয়ে যায়।

(vi) **পরিহার** (Waiver) ঃ

চুক্তিভুক্ত কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় চুক্তিগত প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করেন, তাকে পরিহার বলা হয়। এইভাবে চুক্তির কোন এক পক্ষের পরিহার দ্বারা অপর পক্ষ চুক্তির দায় হতে অব্যাহতি পায়। পরিহারের ক্ষেত্রে প্রতিদান আবশ্যিক নয়।

(vii) **বিলীয়ন** (Merger) ঃ

যখন কোন চুক্তিতে একই পক্ষের ক্ষেত্রে কোন নিম্নতর অধিকার (inferior right) উহা অপেক্ষা কোন উচ্চতর অধিকারের (Superior right) মধ্যে অন্তর্ভুক্তি হয়, তখন নিম্ন অধিকার উচ্চ অধিকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিম্ন অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির দায় হতে উক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। একে বিলীয়ন বলে।

উদাহারণ :

(১) 'ক' 'খ'-র একটি বাড়ি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা (lease) নেন। ইজারা'র সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই 'খ'-র কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এরফলে তার ইজারা স্বত্ব শেষ (লোপ) হয়ে যায়। কারণ তার নিম্নতর অধিকার (ইজারা স্বত্ব) উচ্চতর অধিকারের (মালিকানা স্বত্ব) মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

(২) 'ক' নির্দিষ্ট ভাড়ায় 'খ'-র কাছ থেকে একটি বাড়ি এক বছরের জন্য ভাড়া নেন। এক বছরের মধ্যেই 'ক' 'খ'-র থেকে বাড়িটি কিনে নেন। এক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি সমাপ্ত হল। কারণ, মালিকানা স্বত্বের মধ্যে ভাড়াটিয়ার স্বত্ব বিলীন হয়ে যায়।

(৩) **চুক্তি পালনের অসম্ভাব্যতার দ্বারা** (Discharge by impossibility of Performance) — ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬ ধারা অনুসারে, কোন চুক্তিতে যদি কোন অসম্ভব কার্য করার কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে সেই চুক্তি 'প্রথম হইতেই বাতিল' (void ab-initio) বলে গণ্য করা হবে। 'ক' তার বন্ধু 'খ' কে 1,000 টাকার দেবার প্রতিশ্রুতি দেন যদি 'খ' মাটি থেকে এক লাফে পাঁচ তলা বাড়ির ছাদে উঠতে পারেন। ইহা অসম্ভব কার্য। তাই এটি প্রথম থেকেই বালিত বলে গণ্য হবে।

অনেক সময় চুক্তি গঠনের সময় পালনযোগ্য বা বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কোন কারণে তা আর পালনযোগ্য থাকে না। অর্থাৎ, চুক্তি গঠনের সময় চুক্তি বৈধ থাকতে পারে এবং পরবর্তীকালে কোন কারণে তা নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। চুক্তি গঠনের পরবর্তীকালে চুক্তি পালনের এই অসম্ভাব্যতাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা (Supervening Impossibility) বলে।

কোন কার্য করার জন্য সম্পাদিত চুক্তি যখন পরবর্তীকালে অসম্ভব হয়ে যায় বা প্রতিশ্রুতি দাতার পক্ষে নিবারণ করার ক্ষমতা নেই এমন কোন ঘটনার দ্বারা চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে যায়, তখন সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যে বিভিন্ন কারণে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা ঘটতে পারে তার কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হল :

(i) **আইনের পরিবর্তন** (Change of Law) — চুক্তি গঠনের পরবর্তী কালে আইনের কোন পরিবর্তনের ফলে চুক্তি পালন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে চুক্তি পালন নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' হিন্দু আইন অনুসারে পত্নীর জীবিত অবস্থায় অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। তাঁর এই প্রতিশ্রুতির সময় বহু-বিবাহের ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তাদের বিবাহের আগেই বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) পাশ করা হয়। এক্ষেত্রে এই আইন চালু হওয়ার পর তাদের বিবাহ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে।

(২) 'ক' একটি গুদাম থেকে এক বস্তা গম 'খ' কে বিক্রয় করেন। কিন্তু গম সরবরাহ করার আগেই সরকার সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা (Statutory Power) দ্বারা গুদামের সমস্ত গম অধিগ্রহণ করেন। যার ফলে 'ক' গুদাম হতে গম সরবরাহ করতে পারেন নি [Re Shipton Anderson & Co.]।

(ii) **চুক্তির কোন অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়া** (Destruction of an object necessary for the performance of the contract) —

চুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে গেলে এবং চুক্তি সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের বিনা দোষে যদি তা ঘটে থাকে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী কার্য অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রে কোন পক্ষই দায়ী থাকবে না।

উদাহরণ :

(১) 'C' একটি সঙ্গীত ভবন পর পর কয়েকটি কনসার্ট অনুষ্ঠানের জন্য 'T' কে ভাড়া দেয়। প্রথম কনসার্ট শুরু হবার পূর্বেই সঙ্গীত ভবনটি পুড়ে নষ্ঠ হয়ে যায়। বিচারে ধার্য হয়, চুক্তির অপরিহার্য উপাদান ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চুক্তি নিষ্ফল বলে গণ্য হবে [Taylor V. Caldwell (1863)]।

(iii) **পূর্ব শর্তের ব্যর্থতা** (Failure of preconditions) —

যেক্ষেত্রে চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষেরা ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হবে অথবা কোন বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত থাকবে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত না হলে বা ঐ বিশেষ অবস্থা অবিরামভাবে উপস্থিত না থাকলে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে বিবাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু বিবাহের আগেই 'খ' আকস্মিক ভাবে হঠাৎ পাগল হয়ে যান। এক্ষেত্রে চুক্তি নিষ্ফল হবে।

(২) রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের মিছিল দেখার জন্য মিছিলের রাস্তার উপর অবস্থিত কয়েকটি ঘর K এর থেকে H ভাড়া নেয়। K ও H উভয়েই ভাড়ার উদ্দেশ্য জানত। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যাভিষেকের উদ্দেশ্যে মিছিল বের হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির মূল ভিত্তিস্বরূপ ঘটনার অভাব হওয়ায় চুক্তির অব্যাহতি ঘটবে এবং K, H এর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে পারবেন না (Krell V. Henry (1903))।

(iv) **ব্যাক্তিগত অসামর্থ্যতা** (Personal incapacity) — যে ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কোন সেবা বা কার্যের জন্য চুক্তি করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ পক্ষের ব্যক্তিগত অক্ষমতা বা অসামর্থ্য বা ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

উদাহরণ :

(১) এক ব্যক্তি প্রখ্যাত এক চিত্রকারকে দিয়ে তার ছবি আঁকানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। ছবি আঁকার পূর্বেই আকস্মিকভাবে ঐ চিত্রকারের মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে চিত্রকারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

(২) এক ব্যক্তি একটি কনসার্টে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অংশগ্রহণ করবেন বলে চুক্তিবদ্ধ হন। অংশগ্রহণের পূর্বেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার জন্য তিনি কনসার্টে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিচারে ধার্য হয় যে অসুস্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় [Robinson V. Davidson]।

(v) **যুদ্ধ ঘোষণা** (Out break of War) — কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন ঐ দেশের নাগরিকের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল (void ab initio)। দুই দেশের নাগরিক চুক্তিবদ্ধ হবার পর যদি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সেই চুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে স্থগিত থাকে এবং যুদ্ধ থেমে যাবার পর ঐ চুক্তি পুনরায় কার্যকর করা যায়।

৩.খ.৭.১ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা নীতির ব্যতিক্রম

কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করবেন, যদি না তা পালন করা সত্যি সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাই হোক, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে না :

(i) **চুক্তি পালনে অসুবিধা** (Difficulty in Perfomance) — শুধুমাত্র কিছু কারণের জন্য চুক্তি পালনের অসুবিধার জন্য চুক্তি পালন মকুব করা যায় না বা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে না।

উদাহরণ :

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিতে 'ক' কিছু পরিমাণ ফিনল্যান্ডের কাঠ 'খ' কে বিক্রি করেন। কোন কাঠ সরবরাহ করার পূর্বেই আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে যানবাহন ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দেওয়ায় ফিনল্যান্ড থেকে কাঠ আনা সম্ভব হয় নি। ফলত, সময়মত 'খ' কে কাঠ সরবরাহ সম্ভব হয়নি। বিচারে ধার্য হয়, শুধুমাত্র কাঠ আনার অসুবিধার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না [Blackburn Bobbin V. Allen & Sons. (1918)]।

(ii) **বাণিজ্যিক অসম্ভাব্যতা** (Commercial Imposibility) — শুধুমাত্র কাঁচামালের মূল্য

বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া, মজুরির মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বা নিম্নহারে মুনাফার আশঙ্কার কারণে চুক্তি পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। চুক্তিতে বিপরীত কোন মত প্রকাশিত না হলে উপরিউক্ত যে কোন ঘটনার দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি দাতাকে বহন করতে হবে।

উদাহরণ : 'ক' মুম্বাই থেকে জাহাজে করে 'খ' কে কিছু জিনিস একটি স্থানে পাঠানোর চুক্তি করেন। হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য জাহাজের ভাড়া বহুগুণে বেড়ে যায়। বিচারে স্থির হয় এরূপ ভাড়া বৃদ্ধির জন্য চক্তি পালন মকুব করা যায় না [Karl Ettlinger V. Chagandas & Co. (1915)]।

(iii) **তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতা** (Failure of Third Party) —

প্রতিশ্রুতি দাতা যার ওপর নির্ভরশীল এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তির কার্যের দ্বারা কোন চুক্তিপালন অসম্ভব হয়ে পড়লে চুক্তি প্রত্যাহার করা যায় না।

উদাহরণ :

'ক' 'খ' কে কিছু বস্ত্র সরবরাহ করার চুক্তি করেন। এদিকে বস্ত্র প্রস্তুতকারক 'গ'-র থেকে 'ক' বস্ত্র ক্রয় করেন। 'গ' সঠিক সময়ে বস্ত্র 'ক' কে সরবরাহ করতে না পারায় 'ক'ও সঠিক সময়ে 'খ' কে বস্ত্র সরবরাহ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'গ'-র ব্যর্থতার জন্য চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না। এক্ষেত্রে 'ক' 'খ' কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন [Harnandrai Fulchand V. Pragdas (1923)]।

(iv) **ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা** (Strike, Loch-out, Riots) —

ধর্মঘট, লক-আউট, দাঙ্গা প্রভৃতির ন্যায় অসামরিক গোলযোগের জন্য কোন চুক্তি পালন সম্ভব না হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হবে না এবং এই ক্ষেত্রে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না, যদি না এই মর্মে কোন শর্ত থাকে যে, এই সকল ঘটনা ঘটলে চুক্তি পালিত হবে না, বা চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে।

উদাহরণ :

লন্ডনের দু'জন ব্যবসায়ীর মধ্যে আলজেরীয় দ্রব্যসমূহ বিক্রিয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলজেরিয়াতে অসামরিক গোলযোগ (Civil disturbance) ও দাঙ্গার জন্য ঐ দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় নি। এক্ষেত্রে চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি প্রযোজ্য হবে না [Jacob Credit Lyonnats (1814)]।

(v) **একটি উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা** (Failure of one of the objects) —

অনেক সময় কোন কোন চুক্তি একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যের কোন একটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় না।

উদাহরণ :

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নৌ-সমাবেশ দেখা ও সমবেত রণতরীগুলি দেখার জন্য 'ক', 'খ' এর থেকে একটি নৌকা ভাড়া নেয়। রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় নৌ-সমাবেশ হয় নি। কিন্তু রণতরীগুলি সমবেত হয়। ক ইচ্ছা করলেই নৌকার সাহায্যে তা দেখতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখেন নি। বিচারে ধার্য হয়, এখানে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয় নি কারণ চুক্তির দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য পালন করা সম্ভবপর ছিল [Herne Bay Steamboat Co. V. Hutton (1903)]।

৩.খ.৭.২ উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার পরিণাম

১. যদি চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির অন্তর্গত কোন কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বা প্রতিশ্রুতি দাতার সমার্থ্য বহির্ভূত কারণে অবৈধ হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ কার্য সম্পাদন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ভারতীয় চুক্তি আইনের ৫৬(২) ধারা অনুসারে অসম্ভব কার্য সম্পাদন করার চুক্তির বাতিল চুক্তি।

২. যে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতা জানতেন বা সাধারণ ভাবেই তাঁর পক্ষে জানা উচিত ছিল যে, তিনি যে প্রতিশ্রুতি করেছেন তা পালন করা অসম্ভব বা অবৈধ এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার তা জানা ছিল না, তাহলে প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ার দরুন প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যদি কোন ক্ষতি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা তা অবশ্যই দিতে বাধ্য থাকবেন—ধারা ৫৬(৩)।

উদাহরণ : বিবাহিত এক ব্যক্তি ভারতীয় হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ জানা সত্ত্বেও এক হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করতে সম্মত হন। এই চুক্তি অবৈধ বলে বাতিল হবে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঐ মহিলাকে এজন্য ক্ষতি পূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩. চুক্তি আইন অনুযায়ী, কোন চুক্তি যদি বাতিল বলে বোঝা যায় বা চুক্তির পরবর্তীকালে উত্তর কালীন অসম্ভাব্যতার জন্য বাতিল বলে পরিগণিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত সম্মতি বা চুক্তি অনুযায়ী যে পক্ষ সুবিধা পেয়েছে, তা অন্য পক্ষকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে বা তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে—৬৫ ধারা।

উদাহরণ :

(১) 'ক' 'খ' কে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার 'খ'-র পিতা 'ক' 15,000 টাকা নগদ প্রদান করেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের পূর্বেই 'খ' আকস্মিক ভাবে মারা যান। এক্ষেত্রে চুক্তিটি 'খ'-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায়। তাই 'ক' ঐ 15,000 টাকা 'গ' কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

(২) 'ক' টাকার বিনিময়ে 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে সম্মত হয়। ঠিক হয়, প্রতিদিন 200 টাকা হিসাবে ৭ দিন তিনি থিয়েটারে অভিনয় করবেন। পঞ্চম দিন থেকে 'ক' ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকি দিন গুলি 'খ'-র থিয়েটারে অভিনয় করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে 'খ' 'ক' কে ঐ চার দিনের অভিনয়ের মূল্য 200 টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন।

৪. **আইনের প্রয়োগের দ্বারা** (Discharge by Operation of Law) —

চুক্তির পরিসমাপ্তি অনেক সময়ই চুক্তির পক্ষ সমূহের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না। যেমন আইনের প্রয়োগের দ্বারা যখন চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়, তখন তা চুক্তির পক্ষ সমূহের উপর কোন ভাবেই নির্ভর করে না। আইনের প্রয়োগের দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

(i) মৃত্যুর দ্বারা (by death) — যে চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা জড়িত, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির দায় মৃত ব্যক্তির আইনগত উত্তরাধিকারের উপর বর্তাবে।

(ii) বিলীয়ন দ্বারা (by merger) — যে ক্ষেত্রে একটি চুক্তি অন্য একটি চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা বিলনী হয় সেক্ষেত্রে পুরনো চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। (এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে)।

(iii) দেউলিয়া হওয়ার জন্য (by insolvent) —চুক্তিভুক্ত কোন পক্ষ যদি দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হয়, তাহলে দেউলিয়া ঘোষণার পূর্বের সমস্ত দায় থেকে তিনি অব্যহতি পান।

(iv) লিখিত চুক্তির কোন শর্তের অন্যায় ভাবে পরিবর্তন (Unauthorised alteration of the

terms of the written agreement) — চুক্তির কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের সমর্থন ছাড়া যদি চুক্তির লিখিত কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কোন রকম পরিবর্তন করেন, তাহলে চুক্তির অন্য পক্ষ ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারেন।

৫. **সময় অতিক্রমনের দ্বারা** (Discharge by Lapse of Time) —

১৯৬৩ সালের তামাদি আইন (The Limitation Act, 1963) অনুসারে কোন চুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে। কোন ব্যক্তিকে যদি ধরে পণ্য বিক্রয় করা হয়, তাহলে ৩ বৎসর বাদে ঐ ঋণ আর আদায় করা যায় না। ঐ ৩ বৎসর পার হলে খাতক (যে ব্যক্তি ধারে পণ্য ক্রয় করেছেন) ঋণমুক্ত হন এবং পূর্বোক্ত চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়।

৬. **চুক্তি ভঙ্গের দ্বারা** (Discharge by Breach of Law) —

যদি চুক্তির কোন এক পক্ষ চুক্তি পালনে সমর্থ হন বা চুক্তি পালনে ব্যর্থ হন তাহলে চুক্তির পরিসমাপ্তি হয়। চুক্তি ভঙ্গের জন্য চুক্তির অপর পক্ষ ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। (এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে)।

৩.খ.৮ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান অর্জন করলাম :

- চুক্তি পালন কী, কে এবং কীভাবে চুক্তি পালন করে থাকেন;
- চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই চুক্তি আর পালন করতে হয় না;
- পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী;
- চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে স্থান ও সময়ের গুরুত্ব;
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন পক্ষ যদি কার্য সম্পন্ন করতে না পারে, তখন বলা হয় চুক্তি ভঙ্গ হল। নির্দিষ্ট কিছু কিছু কারণের জন্য চুক্তিভঙ্গ হয়;
- চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন;
- চুতি ভঙ্গের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিকার;
- কিভাবে বা কী কী কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে;
- উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ধারণা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়েছে বলে মনে করা হয় ও এই নীতির ব্যতিক্রম সমূহ।

৩.খ.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) চুক্তির পালনের ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(২) দাখিলের সংজ্ঞা দিন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি বলতে কী বোঝেন?

(৪) চুক্তির পরিসমাপ্তি কখন হয়?

(৫) 'পূর্বাহ্নে চুক্তিভঙ্গ' বলতে কী বোঝেন?

(৬) চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে খেসারত বলতে কী বোঝেন?

(৭) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ধারণা দু-এক কথায় লিখুন।

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) দাখিল কাকে বলে? বৈধ দাখিলের শর্তসমূহ আলোচনা করুন।

(২) পরস্পর প্রতিশ্রুতি কাকে বলে? ইহার প্রকারভেদ উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

(৩) পরস্পর প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়মাবলী আলোচনা করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তিপালন হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

(৪) চুক্তিভঙ্গ কে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? চুক্তিভঙ্গের প্রতিকারগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে চুক্তির পরিসমাপ্তি হল?

(৬) উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার নীতি ও এই নীতির ব্যতিক্রমগুলি আলোচনা করুন।

(৭) টীকা লিখুন।

(ক) দাখিল, (খ) পরস্পর প্রতিশ্রুতি, (গ) নবীকরণ, (ঘ) বিলীয়ন, (ঙ) অর্জিত পরিমাণ, (চ) পরিহার, (ছ) চুক্তি ভঙ্গ

৩.খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা- 2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৪ ❑ ক্ষতিপূরণ ও জামিন

গঠন

৪১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তি

৪.৩.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার

৪.৩.২ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার

৪.৩.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

৪.৪ জামিনের চুক্তি

৪.৪.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান

৪.৪.২ জামিনের প্রকারভেদ

৪.৪.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার

৪.৪.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা

৪.৪.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি

৪.৪.৬ জামিনের চুক্তি ও ক্ষতিপূরণের চুক্তির পার্থক্য

৪.৪.৭ জামিনদারের অধিকার

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনযোগ সহকারে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- ক্ষতিপূরণের চুক্তি কী;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার ও দায়;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার;
- জামিন চুক্তি কী এবং কে, কীভাবে জামিন দিয়ে থাকেন;
- জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহ;
- জামিন কত রকমের হয়;
- জামিন কীভাবে প্রত্যাহার করা যায়;

- জামিনদারের দায়ের সীমা;
- জামিনদারের কীভাবে দায়মুক্তি ঘটে;
- জামিনদারের অধিকার সমূহ।

৪.২ প্রস্তাবনা

চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা তাদের প্রতিশ্রুতি কার্য করতে বাধ্য থাকেন। কিন্তু অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য এক ব্যক্তি চুক্তি দ্বারা প্রতিশ্রুত হয় যে, চুক্তির কোন এক পক্ষের আচরণ বা কার্য জনিত ক্ষতি থেকে চুক্তির অপরপক্ষকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষা করবেন। এইভাবে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কার্য বা আচরণের জন্য নিজেকে দায়বদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি দাতা এবং যাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তিনি ক্ষতিনিষ্কৃতি গ্রহীতা। উভয় পক্ষেরই নির্দিষ্ট অধিকার বর্তমান। চুক্তির ক্ষেত্রে কোন পক্ষ অপরের হয়ে জামিন দিয়ে থাকেন। জামিন একাধিক রকমের হতে পারে। নির্দিষ্ট উপায়ে জামিন আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। যে ব্যক্তি জামিন দেন, অর্থাৎ জামিনদারের দায়মুক্তি কীভাবে ঘটে থাকে তাও এই এককের বিষয়বস্তু। তাই এই এককটি পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই একক পাঠের দ্বারা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।

৪.৩ ক্ষতিপূরণের চুক্তি

ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে, যে চুক্তি দ্বারা এক পক্ষ চুক্তির অপর পক্ষকে স্বয়ং প্রতিশ্রুতিদাতার অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির আচরণ বা কার্যজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকেই ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলে—১২৪ ধারা।

যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (indemnifier) এবং যাকে এরূপ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity Holder) বলে।

উদাহরণ :

(ক) কোন নির্দিষ্ট 1,000 টাকার জন্য C, B এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করলে B-র যা ক্ষতি হবে A তা পূরণ করার চুক্তি করল। এক্ষেত্রে A ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিদাতা (Indemnifier)এবং B ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিগ্রহীতা (Indemnity-Holder)।

(খ) A এবং B একই সঙ্গে একটি দোকানে গেল। B দোকানদারকে বললেন যে, A যা পন্য নেবেন তার মূল্য তিনি নিজে দোকানদারকে দেবেন। এটিও একপ্রকার ক্ষতিপূরণের চুক্তি — [Goulston Discount Co. Ltd. V. Clark, (1967)]।

উপরে ক্ষতিপূরণের চুক্তির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে, (১) ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি, (২) প্রতিশ্রুতিদাতা ও তৃতীয় পক্ষের আচরণ থেকে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্য ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির (express promise) দ্বারা প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে। কিন্তু অনুক্ত বা অব্যক্ত (implied) আচরণ জনিত ক্ষতি বা প্রতিশ্রুতি দাতার আচরণ জনিত নয় এরূপ ঘটনা বা দুর্ঘটনার

ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতিশ্রুতিদাতা দায়ী হবে না। কিন্তু ভারতে একাধিক মামলায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, ব্যক্ত বা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকলেও আইনের ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, মামলার রায় থেকে একথা স্পষ্ট যে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি ১২৪ ধারায় যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করতে ইংল্যাণ্ডের আইনের নীতিসমূহ অনেক সময়ই অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ, ইংল্যান্ডের আইন এ ব্যাপারে অনেক বেশি ব্যাপক।

The Secretary of State V. Bank of India—মোকদ্দমাটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন শেয়ারের দালাল একখানি সরকারি প্রত্যর্থপত্রের (Govt. Promissory Note) ধারকের (holder) স্বাক্ষর নকল (জাল) করে নিজের অনুকূলে পৃষ্ঠাঙ্কিত (Endorse) করে এবং Bank of India কে হস্তান্তর করে। ব্যাঙ্ক (দালালের কাজকর্মকে) সরল বিশ্বাসে ঐ G.P. Note-র পরিবর্তে সরকারি অফিস থেকে নতুন প্রত্যর্থপত্র (G.P. Note) সংগ্রহ করে। এদিকে ধারক (holder) সব বিষয় জানার পরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করেন ও ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। তারপর সরকার Bank of India -র বিরুদ্ধে ঐ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করে। এই মোকদ্দমার বিচারপতি Lord Hulsbury রায় দেন যে, যখন এক পক্ষের অনুরোধে কেউ সরল বিশ্বাসে, অন্যায় হতে পারে, এরূপ সন্দেহ না করে কোন কার্য করেন এবং ঐ কার্যের দ্বারা যদি তৃতীয় পক্ষের অধিকার খর্ব বা হরণ হয়, তাহলে যিনি ঐ কার্য করবেন তিনি উক্ত অনুরোধকারীর (এক্ষেত্রে Bank of India) কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। এখানে অব্যক্ত ক্ষতিপূরণের চুক্তি হয়েছে বলা হয়। তাই এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

১২৪ ও ১২৫ ধারায় অসম্পূর্ণতার জন্য বোম্বাই-এর একটি বিখ্যাত মোকদ্দমায় ইংল্যান্ডের আইনের নীতি প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ আছে— (Gajanan V. Moreshar) (1942)।

৪.৩.১ ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অধিকার

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৫ ধারায় বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা (indemnity-holder) ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার (indemnifier) কাছ থেকে নিম্নলিখিত পাওনাগুলি পেতে পারেন—

(i) যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কোন বিষয়ে কোন মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণ বাবদ খেসারত (damages) দেবেন;

(ii) যদি তিনি ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যে রকম কাজ করতেন বা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ অমান্য না করনে বা প্রতিশ্রুতি দাতা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উক্ত মোকদ্দমার জন্য কোন খরচ করতে বাধ্য হন, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার যাবতীয় খরচ;

(iii) প্রতিশ্রুতি দাতার ক্ষমতাবলে বা ক্ষতিপূরণের চুক্তি না থাকলে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যা করতেন, সেরকম কিছু করলে, যা প্রতিশ্রুতি দাতার আদেশ বিরুদ্ধ নয়, তাহলে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বা আপোষের (compromise) জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৪.৩.২ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার

ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকার সম্বন্ধে চুক্তি আইন ভীষণ ভাবে নীরব। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, চুক্তি আইন অনুযায়ী একজন জামিনদারের (Surety) অধিকারের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দাতার অধিকারের সাদৃশ্য রয়েছে।

৪.৩.৩ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দাতার দায়

ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৫ ধারায় ক্ষতিপূরেণর প্রতিশ্রুতি দাতার দায় বা দায়ের সময়ের কোন উল্লেখ নেই। তবে দেশের বিভিন্ন আদালতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে, সেগুরি রায় থেকে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ একটা ধারণা জন্মায়। বিভিন্ন মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার যতক্ষণ না পর্যন্ত কোন ক্ষতি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দাতাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা যায় না। আবার কোন কোন মামলায় প্রকৃত ক্ষতির পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দাতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কথা বলা হয়েছে [Osman Jamal & Sons V. Gopal]। এই মামলায় রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ কথার অর্থ এমন নয় যে, তা হল অর্থ প্রদানের পর সেই অর্থ পরিশোধ করা। ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে, যাকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তিনি কোন কিছুর জন্য অর্থ প্রদান করবেন এটা আশা করা হয় না ("Indemnity os not given by repayment after payment. Indemnity requires that the party to be indemnified shall never be called upon to pay")।

৪.৪ জামিনের চুক্তি

'জামিনের চুক্তি' আসলে প্রতিশ্রুতি পালনের চুক্তি অথবা তৃতীয় পক্ষ ব্যর্থ হলে তার দায় পালনের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কোন তৃতীয় পক্ষ যদি তার প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ না করেন তাহলে ঐ প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হবে, এই মর্মে কোন চুক্তি হলে তাকে জামিনের চুক্তি বা জামিন বলা হয়—১২৬ ধারা।

যে ব্যক্তি এভাবে তৃতীয় পক্ষের ব্যর্থতার জন্য প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধের জামিন দেন, তাকে জামিনদার (Surety) এবং যার কার্যের খেলাপের জন্য এরূপ জামিন দেওয়া হয় তাকে মুখ্য দেনাদাব (Principal Debtor) এবং যার নিকট জামিন দেওয়া হয়, তাকে পাওনাদার (creditor) বলা হয়।

উদাহরণ :

(ক) A 10, 000 টাকা B কে ধার দেয়। C, A কে প্রতিশ্রুতত দেয় B ধার শোধ না করলে তিনি সেই ধার (10,000 টাকা) শোধ করবেন। এখানে C জামিনদার, B মুখ্য দেনাদার এবং A হল পাওনাদার।

৪.৪.১ জামিন চুক্তির অত্যাবশ্যক উপাদনা

জামিন চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়—

(i) জামিন চুক্তিতে জামিনদার, মুখ্য দেনাদার ও পাওনাদার সকলের মত এক হতে হবে। অন্যথায় জামিন চুক্তি কার্যকর হয় না।

(ii) জামিন চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে জামিনদার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন দায় থাকতে হবে। যদি কোনরূপ দায় থাকে, তাহলে জামিনের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নাবালকের ঋণের ক্ষেত্রে জামিনের চুক্তি এর ব্যতিক্রম।

(iii) জামিন চুক্তি লিখিত বা মৌখিক দুই-ই হতে পারে। এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত (expressed) বা অব্যক্ত (implied) হতে পারে।

(iv) জামিন-চুক্তি ভারতীয় চুক্তি আইনের অংশ বিশেষ। সুতরাং, চুক্তি আইনের আবশ্যকীয় উপাদান গুলিও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—

(১) বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত পক্ষেরা অতি অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য হবে। কিন্তু জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে মুখ্য-দেনাদার চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য হতে পারেন। এক্ষেত্রে জামিনদারকে মুখ্য দেনাদার বলে গণ্য করা হবে এবং তিনি ব্যক্তিগত সেই দায় মেটাতে বাধ্য থাকবেন; যদিও প্রকৃত মুখ্য-দেনাদার (যেমন-নাবালক) দায়ী নাও হতে পারে। [Kashiba V. Shripat, (1895)]

(২) জামিন চুক্তিতে মূল দেনাদার যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন, তাই জামিনদারের পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। তাই আলাদাভাবে জামিনদারকে কোন প্রতিদান দেবার প্রয়োজন হয় না।

৪.৪.২ জামিনের প্রকারভেদ

জামিন চুক্তির উদ্দেশ্যেই হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে ঋণ গ্রহণ, বা ধারে পণ্য ক্রয় বা চাকুরির ক্ষেত্রে জামিন দ্বারা সাহায্য করা। সাধারণ ভাবে জামিন তিন ধরনের হয়ে থাকে—

(১) ঋণ পরিশোধের জামিন;

(২) পণ্যের মূল্য পরিশোধের জামিন ও

(৩) চাকরির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ব্যবহার ও সততার জামিন।

জামিন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ দায় বা ঋণের জন্য হতে পারে। আবার জামিন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে হতে পারে (সরল জামিন) বা একাধিক লেনদেন সম্পর্কেও হতে পারে (অবিরাম জামিন)।

সরল জামিন (Specific guarantee) : যখন কোন জামিন কোন একটি মাত্র নির্দিষ্ট লেনদেন বা ঋণ সম্পর্কে হয়ে থাকে, তখন তাকে সরল বা বিনির্দিষ্ট জামিন বলে। এক্ষেত্রে, চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন বা দায় পরিশোধ করা হলে সরল জামিন শেষ হয়।

অবিরাম জামিন (Continuing guarantee) : ভারতীয় চুক্তি আইনের ১২৯ ধারায় বলা হয়েছে, যখন একাধিক লেনদেন সম্পর্কে জামিন দেওয়া হয়, তখন তাকে অবিরাম জামিন বলে। এই জামিন যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যাহার করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জামিনদারের দায় শেষ হবে না।

উদাহরণ :

(ক) A তার জমিদারীতে B কে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত করবে এই শর্তে C, A এর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, B কর্তৃক সঠিক খাজনা আদায় ও অর্পনের জন্য C 10,000 টাকা পর্যন্ত দায়ী থাকবেন। এটি একটি অবিরাম জামিন।

(খ) A একজন খুচরা বিক্রেতা B কে প্রতিশ্রুতি দিল যে, C সময় সময় যা ক্রয় করবেন তার 10,000 টাকা পর্যন্ত তিনি নিজে (A) দায়ী থাকবেন। বেশ কিছু দিন পর C 800 টাকা পণ্য ক্রয় করে পরিশোধ করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে A -র জামিন অবিরাম হওয়ার জন্য A, B কে ঐ 800 টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৪.৪.৩ অবিরাম জামিন প্রত্যাহার

নিম্নলিখিত উপায়ে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার হতে পারে :

(১) **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (By notice)—অবিরাম জামিনের ক্ষেত্রে জামিনদার যে কোন সময় বিজ্ঞাপ্তি (Notice) দ্বারা পাওনাদারকে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পূর্বের লেনদেন সমূহের জন্য জামিনদার অতি অবশ্যই দায়ী থাকবেন—১৩০ ধারা।

উদাহরণ : A,B -র সমর্থনে C কে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আগামী ১২ মাসের মধ্যে C 10,000 টাকা পর্যন্ত যা ধার দিবেন, B পরিশোধ করতে না পারলে A তা C কে পরিশোধ করবেন। কিন্তু ৩ মাস পর A বিজ্ঞপ্তি দ্বারা C কে অবিরাম-জামিন প্রত্যাহার করার কথা জানান। ইতিমধ্যে C, B কে 3,000 টাকা ধার দিয়েছেন। বিচারে ধার্য হয় যে, বিজ্ঞপ্তির পরবর্তীকালে C, B কে যে পরিমান ধার দেবেন তার জন্য A দায়ী হবেন না। কিন্তু B যদি ঐ 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে A তা C পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হবেন।

[Offord V. Davies, (1862)]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (By death of surety)—বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, জামিনদারের মৃত্যুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেন সম্পর্কে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হবে—১৩১ ধারা। এক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বেকার লেনদেনের জন্য জামিনদারের সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকবে।

(৩) **অন্যান্য উপায়ের দ্বারা** (By other modes) —

উপরে বর্ণিত দুইটি উপায় ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটি উপায়ে, সাধারণ চুক্তি যেভাবে প্রত্যাহৃত হয়, সেই একই ভাবে অবিরাম জামিন প্রত্যাহৃত হয়ে থাকে। যেমন—

(i) নবীকরণ—৬২ ধারা।
(ii) চুক্তির মুখ্য কোন শর্ত পরিবর্তন—১৩৩ ধারা।
(iii) মুখ্য দেনাদারের দায় মুক্তি বা দায় পরিশোধ—১৩৪ ধারা।
(iv) পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন আপোষ—১৩৫ ধারা।
(v) পাওনাদারের দ্বারা এমন কার্য করা বা না করা যার জন্য জামিনদারের অধিকারের কোন ক্ষতি সাধিত হয়—১৩৯ ধারা।

(v) পাওনাদার যেক্ষেত্রে মুখ্য দেনাদার কর্তৃক বন্ধকী জিনিস হারিয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে জামিনদারের দায়ের অব্যাহতি ঘটে—১৪১ ধারা।

৪.৪.৪ জামিনদারের দায়ের সীমা

১. **জামিনদারের দায়ের প্রকৃতি**—জামিন চুক্তিতে অনুরূপ কোন শর্ত না থাকলে জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের সঙ্গে সমান হয়। অর্থাৎ বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে মুখ্য-দেনাদারের সম পরিমাণ দায় জামিনদারকেও বহন করতে হয়—১২৮ ধারা।

উদাহরণ : A, B এর জামিন C কে 10,000 টাকা ধার দেয়। নির্দিষ্ট সময় পরে C টাকা দিতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে B পুরো 10,000 টাকা A কে পরিশোধ করতে বাধ্য হবেন।

জামিনদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, যার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্য-দেনাদার পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ আছেন। অর্থাৎ, জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের থেকে কম বা বেশি হয় না। কিন্তু বিশেষ চুক্তি দ্বারা জামিনদারের দায় মুখ্য দেনাদারের দায় থেকে কম হতে পারে। কিন্তু কোনভাবেই বেশি হতে পারে না। চুক্তিবহির্ভূত কোন কারণের জন্যই জামিনদারকে দায়ী করা যায় না। যদি বিপরীত কোন শর্ত না থাকে, তবে পাওনাদার প্রাপ্যের জন্য প্রথমেই মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা না করে সরাসরি জামিনদারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করতে পারেন। এটা অবশ্য পাওনাদারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

২. **জামিনদারের দায়ের সীমাবদ্ধতা**—যদিও সাধারণ ভাবে জামিনদারের দায় মুখ্য-দেনাদারের সঙ্গে সমান, তথাপি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জামিনদার তার দায়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। মুখ্য দেনাদার ব্যর্থ হলে জামিনদার সেই সীমাবদ্ধ মূল্য পর্যন্তই দায়বদ্ধ থাকবেন। মুখ্য দেনাদারের কোন কার্যের দ্বারাই জামিনদার এই সীমাবদ্ধ দায়ের চেয়ে বেশি মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন না।

উদাহরণ : A, B কে 5,000 টাকা মূল্যের পন্য সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে B-র অনুকূলে C, A কে 3,000 টাকা পর্যন্ত জামিন দেন। B টাকা দিতে অসমর্থ হন। এক্ষেত্রে 3,000 টাকার জন্য A -র কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪.৪.৫ জামিনদারের দায়মুক্তি

জামিনদার যখন তার দায় পালন থেকে অব্যাহতি পান, তখন বলা হয় দায়মুক্তি ঘটেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে জামিনদারের দায়মুক্তি ঘটে থাকে—

(১) **প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা** (by notice of revocation) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(২) **জামিনদারের মৃত্যু দ্বারা** (by death of surety) — [এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

(৩) **চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা** (by change interms of contracts) —জামিনদারের বিনা সম্মতিতে যদি চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন করা হয়, তবে চুক্তির শর্ত পরিবর্তনের পরবর্তী কাজ কর্মের

জন্য জামিনদার দায়মুক্ত হন। কিন্তু শর্ত পরিবর্তনের পূর্ববর্তী কাজ কর্মের জন্য জামিনদার অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে জামিনদার অনেকগুলি কাজের জন্য দায়বদ্ধ, সেক্ষেত্রে কোন একটির চুক্তির শর্ত পরিবর্তন দ্বারা সবকটির দায় পালন করা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র যে চুক্তিটির শর্ত পরিবর্তন করা হয়েছে (জামিনদারের বিনা সম্মতিতে) সেটির দায়বদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়—১৩৩ ধারা।

(৪) **মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি** (Discharge of principal) — পাওনাদার ও মুখ্য দেনাদারের মধ্যে কোন চুক্তি দ্বারা বা পাওনাদারের কোন কার্য দ্বারা মুখ্য দেনাদারের দায়মুক্তি ঘটলে জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন—১৩৪ ধারা।

(৫) **মুখ্য-দেনাদারের সঙ্গে আপোষ দ্বারা** (By compounding with principal debtor) — যেক্ষেত্রে জামিনদারের বিনা সম্মতিতে পাওনাদার মূল দেনাদারকে মোট ঋণের খানিক অংশ মকুব করেন, বা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন, বা মামলা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, সেক্ষেত্রে জামিনদার দায়মুক্ত হয়ন—১৩৫ ধারা।

(৬) **বিলম্বের দ্বারা** (By delay) —পাওনাদার তার প্রাপ্যের জন্য মামলা করতে দেরি করলে জামিনদার দায়মুক্ত হন না। কিন্তু যদি এব্যাপারে কোন চুক্তি হয়ে থাকে তবে এরূপ বিলম্বের দ্বারা জামিনদার তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পাবেন—১৩৭ ধারা।

(৭) **পাওনাদারের এমন কোন কার্য বা কার্যের বিরতি যার দ্বারা জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয** (By creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy) — পাওনাদার যদি এমন কিছু কার্য করেন যা জামিনদারের অধিকার বিরুদ্ধ বা পাওনাদারের যে কাজ করা কর্তব্য ছিল তা থেকে বিরত ছিলেন এবং এর পরিণামে মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে জামিনদারের প্রতিকার ব্যাহত হয়, তাহলে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্তি পাবেন—১৩৯ ধারা।

(৮) **জামানত নষ্টের জন্য** (By loss of security) —মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে যে জামানত (socurity) রেখেছিলেন তা যদি পাওনাদার কোন নষ্ট করেন বা জামিনদারের বিনা সম্মতিতে কাউকে দিয়ে দেন তাহলে জামানতের মূল্য পর্যন্ত জামিনদারের দায় হ্রাস পাবে—১৪১ ধারা।

(৯) **মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায়** (Guarantee obtained by misrepresentation) —পাওনাদার যদি মিথ্যাবর্ণনার দ্বারা জামিন আদায় করে থাকেন তবে জামিনদার ঐ দায় পালন হতে অব্যহতি পান—১৪২ ধারা।

(১০) **তথ্য গোপন দ্বারা** (By concealment of fact) — কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে পাওনাদার যদি জামিন চুকি করে থাকেন, তবে জামিনদার দায় পালন থেকে মুক্ত হন—১৪৩ ধারা।

(১১) **সহ-জামিন পাওয়ার ব্যর্থতা** (Failure of co-surety to join a surety) —যেক্ষেত্রে যুগ্ম বা সহ-জামিন চুক্তির শর্ত ছিল, সেক্ষেত্রে সহ-জামিন (co-surety) চুক্তিভুক্ত না হলে জামিন চুক্তি কার্যকরী হয় না। তাই এক্ষেত্রে জামিন চুক্তির কোন দায় সৃষ্টি হয় না—১৪৪ ধারা।

৪.৪.৬ ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

ক্ষতি পূরণের চুক্তি	জামিন চুক্তি
(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে, যথা- ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি-দাতা ও ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা।	(i) এক্ষেত্রে চুক্তিতে তিনটি পক্ষ থাকে, যথা- (১) জামিনদার, (২) মুখ্য দেনাদার, ও (৩) পাওনাদার।
(ii) এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রতিশ্রুতি দাতার দায় মুখ্য (Primary) এবং স্বাধীন, অর্থাৎ অন্য কারও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর এই চুক্তি পালন নির্ভর করে না।	(ii) এক্ষেত্রে জামিনদারের দায় হল গৌন (Secondary)। মূল দেনাদার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সেই দায় জামিনদারের উপর বর্তায়।
(iii) ক্ষতিপূরণের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার অনুরোধ অনুসারে প্রতিশ্রুতি দাতার কার্য করার প্রয়োজন হয় না।	(iii) দেনাদারের অনুরোধ অনুসারে জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।
(iv) কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি দাতাকেই ক্ষতিপূরণ বহন করতে হয়।	(iv) জামিন চুক্তিরক্ষেত্রে পাওনাদারের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করার পর জামিনদার প্রয়োজনে মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন
(v) এক্ষেত্রে একটি মাত্র চুক্তি হয় প্রতিশ্রুতি দাতা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহীতার মধ্যে।	(v) এক্ষেত্রে তিনটি চুক্তি বর্তমান যথা— (১) জামিনদার ও পাওনাদারের মধ্যে; (২) জামিনদার ও দেনাদারের মধ্যে ও (৩) দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে;
(vi) যেক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতি সংঘটিত হয়, তখন ক্ষতিপূরণের চুক্তি কার্যকরী হয়, অন্যথায় নয়।	(vi) এক্ষেত্রে আগে থেকেই বর্তমান কোন দায়ের জন্যই জামিনদার জামিন দিয়ে থাকেন।

৪.৪.৭ জামিনদারের অধিকার

সাধারণত জামিনদারের তিন ধরনের অধিকার থাকে—

(১) পাওনাদারের বিরুদ্ধে;

(২) মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে;

(৩) সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে;

(১) **পাওনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against creditor) — পাওনাদার যতক্ষন না তার পাওনার জন্য মূল দেনাদারের বিরুদ্ধে দাবি জানাচ্ছেন জামিনদার তার প্রতিশ্রুত দায় পরিশোধ করতে বাধ্য নন। তবে এক্ষেত্রে পাওনা দাবি করতে গিয়ে পাওনাদারের কোন খরচ হলে জামিনদার সেই ক্ষতি পূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

জামিনদার যে ক্ষেত্রে সততার জামিন (fidelity guarantee) দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে, যে ব্যক্তির জন্য জামিন দিয়েছেন তার কোন অসততা প্রমাণিত হলে তার নিয়োগ বাতিল করার জন্য নিয়োগকর্তাকে (employer) অনুরোধ করতে পারেন।

যে মুখ্য পাওনাদারের দেনাদারের নিকট থেকে কিছু পাওনা থাকে, সেক্ষেত্রে জামিনদার তা পাওনাদারের কাছ থেকে দাবি করতে পারেন বা দায় পরিশোধ করার সময় তা মোট পাওনা থেকে বাদ দিতে পারেন [Bechevaise V. Lewis, (1872)]।

অনেক সময় চুক্তি সম্পাদনের সময় মুখ্য দেনাদার পাওনাদারের কাছে জামানত (security) রেখে থাকেন। জামিনের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে জামিনদার সেই জামানতের সুবিদা ভোগ করেন। জামিন চুক্তি সম্পাদনের সময় জামিনদার এই জামানত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা তা এক্ষেত্রে অবান্তর—১৪১ ধারা।

উদাহরণ : A, B-র জামিনের ভিত্তিতে C কে 5,000 টাকা ধার দেয়। A, C-র থেকে ইহার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তি বন্ধক (pledge) রেখেছেন। C কিছুদিন পর দেউলিয়া (insolvent) ঘোষিত হয়। A প্রাপ্য অর্থের জামিনদার B-র বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচারে ধার্য হয়, C কর্তৃক যে সম্পত্তি A -র কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল, তার সমপরিমাণ মূল্য তার দায় পালন হতে অব্যাহতি পারে।

(২) **মুখ্য দেনাদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against principal debtor) — জামিনদার যখন প্রতিশ্রুতি মত তার সমস্ত দায় পরিশোধ করেন তখন তিনি পাওনাদারের সেই সকল অধিকারগুলি ভোগ করেন, ঋণ পরিশোধ করার পূর্বে যেগুলি পাওনাদার মুল দেনাদারের বিরুদ্ধে ভোগ করতেন—১৪০ ধারা।

জামিনদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দায় পরিশোধ করার পূর্বে দেনাদারকে এই বলে জোর করতে পারেন যে, তিনি যেন পাওনাদারকে ঋণ পরিশোধ করে তাকে দায় পালন হতে মুক্ত করেন।

জামিন চুক্তির ক্ষেত্রে নিহিত (implied) প্রতিশ্রুতি থাকে যে, মুখ্য দেনাদার জামিনদারকে যথার্থ ক্ষতিপূরণ করবেন এবং জামিনদার যা যথার্থ ভাবে খরচ করবেন, তা তিনি মুখ্য দেনাদারের থেকে আদায় করতে পারবেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাওনাদারকে দায় (ঋণ) পরিশোধ করার পর তিনি মুখ্য দেনাদারের পাওনাদার হিসাবে পরিগণিত হন।

উদাহরণ : A, B কে ধার দেন C -র উপযুক্ত জামিনের পরিপ্রেক্ষিতে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে A, C -র থেকে টাকা ফেরত চান। C তা দিয়ে অস্বীকার করেন। A, C -র বিরুদ্ধে মামলা করেন। যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকার জন্য C এই মামলা লড়তে সম্মত হন। বিচারের রায় অনুসারে C মূল দাবি ও মামলার খরচ A কে দিতে বাধ্য হন। C এই সমপরিমাণ টাকা B-র কাছ থেকে পাবার অধিকারী। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণে C যদি মামলা না লড়ে থাকেন, তাহলে তিনি শুধুমাত্র মূল দাবির অর্থই পাবেন, মামলা সংক্রান্ত কোন খরচ B এর কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।

(৩) **সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against co-sureties) —যখন কোন ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি হিসাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি জামিন দিয়ে থাকেন, তাদের সহ-জামিনদার বলা হয়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা নিজ নিজ প্রতিশ্রুত অংশের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। অবশ্য কোনরূপ শর্ত না থাকলে সহ-জামিনদাররা সমান ভাবে দায়বদ্ধ থাকেন—১৪৬ ধারা।

উদাহরণ : (ক) G_1, G_2 এবং G_3 তিন জন একত্রে C এর নিকট D এর জন্য জামিন দেন। C, D কে 3,000 টাকা ঋণ দেন। নির্দিষ্ট সময়ে D টাকা দিতে ব্যর্থ হন। কোনরূপ চুক্তি না থাকায় D-র এর ঋণ G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে সমপরিমাণ অর্থাৎ ১,০০০ টাকা করে দিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 তিনজনে একত্রে C -এর নিকট D-র জন্য জামিন দেন। C, D কে A6,000 টাকা ঋণ দেন। তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেন যে, G_1 — ১/৬, G_2 — ১/৩ ও G_3— ১/২ অংশের জন্য দায়ী থাকবেন। D নির্দিষ্ট সময় পরে সেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে, এই দায় গিয়ে পড়ে সহ-জামিনদারদের উপর। এক্ষেত্রে G_1 এর দায় 1000 টাকা, G_2 এর দায় A 2000 টাকা, এবং G_2 এর দায় 6000 টাকা।

যেক্ষেত্রে সহ-জামিনদাররা ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের জন্য জামিন দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়ের সীমার মধ্যে তারা সমান ভাবে দায় বন্টন করে নেবেন—১৪৭ ধারা।

যখন পাওনাদার কোন একজন সহ-জামিনদারকে দায় পালন হতে অব্যাহতি দেন, তখন অন্যান্য সহ-জামিনদাররা দায় পালন হতে অব্যাহতি পান না। আবার, যে সহ-জামিনদার দায় পালন হতে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনি কিন্তু তার অন্য সহ-জামিনদারের কাছে অন্য ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে পারেন—১৩৮ ধারা।

উদাহরণ :

(ক) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর হয়ে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 3,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1, G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,000 টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

(খ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা এবং 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর কাছে জামিন দেন। D তার ঋণের 4,000 টাকা পরিশোধ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে, G_1 1000 টাকা এবং G_2 ও G_3 প্রত্যেকে 1,5000 টাকার দায়বদ্ধ থাকবেন।

(গ) G_1, G_2 ও G_3 যথাক্রমে 1,000 টাকা, 2,000 টাকা ও 4,000 টাকার জন্য D এর অনুকূলে C এর নিকট জামিন দেন। D তার মোট ঋণের 6,000 টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে G_1 1000 টাকা, G_2 2000 টাকা ও G_3 A3000 টাকার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪.৫ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারলাম—

- ক্ষতিপূরণের চুক্তি কখন ও কীভাবে গঠিত হয়;
- ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতা ও গ্রহীতার অধিকার;
- এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দাতাকে কী পরিমাণ দায় বহন করতে হয়;
- জামিন চুক্তির প্রয়োজনীয়তা;
- জামিন চুক্তিকে বৈধরূপে গ্রহণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান;
- জামিনদার কীভাবে দায়মুক্ত হন;
- জামিনদারের দায়ের সীমা।

১.৯ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১. ক্ষতিপূরণের চুক্তি কাকে বলে?

২. প্রতিশ্রুতিদাতা বলতে কাকে বোঝায়?

৩. প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কাকে বলা হয়?

৪. জামিন চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

৫. জামিনদার বলা হয় কাকে?

৬. জামিন কত রকমের হতে পারে?

৭. অবিরাম জামিন বলতে কী বোঝায়?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১. ক্ষতিপূরণের চুক্তি কখন ও কীভাবে গঠিত হয় বর্ণনা করুন।

২. ক্ষতিপূরণের চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিদাতা ও গ্রহীতার অধিকার ও দায়গুলি আলোচনা করুন।

৩. জামিন চুক্তি কাকে বলে? এই ধরনের চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কী?

৪. বৈধ জামিন চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

৫. জামিনদার কাকে বলে? তিনি কীভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন?

৬. ক্ষতিপূরণের চুক্তি ও জামিন চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৭. জামিনদারের অধিকার সমূহ বর্ণনা করুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৫ ☐ গচ্ছিত প্রদান, বন্ধক ও প্রতিনিধিত্ব

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ গচ্ছিত প্রদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৫.৩.১ গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতার কর্তব্য

৫.৩.২ গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিত গ্রহীতার অধিকার

৫.৪ গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি

৫.৫ বন্ধক

৫.৫.১ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

৫.৬ প্রতিনিধিত্ব

৫.৬.১ প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি

৫.৬.২ তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিনিধির ব্যক্তিগত দায়িত্ব

৫.৬.৩ প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি

৫.৭ সারাংশ

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারবো—

- গচ্ছিত প্রদান কী?
- গচ্ছিতদাতা এবং গচ্ছিতগ্রহীতা কাদের বোঝায়;
- গচ্ছিত প্রদানে তারা উভয়েই কী কর্তব্য ও অধিকার ভোগ করেন;
- গচ্ছিত প্রদান কীভাবে শেষ হয়;
- বন্ধক দেওয়া কাকে বলে;
- বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা কী অধিকার ভোগ করেন;
- প্রতিনিধিত্ব কীভাবে সৃষ্টি হয়;
- প্রতিনিধির সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের সম্পর্ক কী;
- প্রতিনিধিত্বের শেষ হয় কীভাবে।

৫.২ প্রস্তাবনা

কোন দ্রব্যের আদান প্রদানের জন্য দুটি পক্ষের প্রয়োজন হয়। এবং দুটি পক্ষ তাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে উভয়ের কাছেই দায়বদ্ধ হন। যখন কোন চুক্তির মাধ্যমে দুটি পক্ষের মধ্যে কোন দ্রব্যের আদান প্রদান হয় এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই আদান প্রদান হয় এই মর্মে, যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে পণ্যের প্রত্যর্পন হবে, তাকে গচ্ছিত প্রদান বলে। সুতরাং গচ্ছিত প্রদানে দুটি পক্ষ আবশ্যক। যে ব্যক্তি বস্তু অর্পন করেন তাকে গচ্ছিতদাতা এবং যাকে বস্তু অর্পন করা হয় তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা বলে। গচ্ছিতদাতা এবং গচ্ছিত গ্রহীতা উভয়েই কিছু অধিকার এবং কর্তব্য ভোগ করে। আবার নির্দিষ্ট সময় পরে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পরে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কোন এক পক্ষের হয়ে কোন কাজ করে দেওয়াকে প্রতিনিধিত্ব বলে। যাঁর হয়ে কাজ করা হয় তাঁকে মুখ্য ব্যক্তি (Principal) এবং যিনি কাজ করেন তাকে প্রতিনিধি (Agent) বলে। এবং মুখ্য ব্যক্তি ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব (Agency) বলে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিনিধি সমাজে রয়েছে। দালাল, নিলামদার, আড়তদার ইত্যাদি। দুই পক্ষের কার্যের দ্বারা বা আইনের ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৫.৩ গচ্ছিত প্রদানের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কোন বস্তু প্রদান করেন এই চুক্তিতে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে ঐ বস্তু আবার ফেরত দেওয়া হবে, অথবা প্রদানকারীর ইচ্ছা অনুসারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে তাকে গচ্ছিত প্রদান বলা হয়।

যে ব্যক্তি বস্তু প্রদান করেন তাকে গচ্ছিতদাতা (Bailor) এবং যাকে বস্তু প্রদান করা হয় তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা (Bailee) বলে। এবং এই রকম লেনদেনকেই "গচ্ছিত প্রদান" বলা হয়।

উদাহরণ : 'ক' তার একটি বই 'খ' কে কিছু দিনের জন্য পড়তে ও তার কাছে রাখতে দেয়।

উরের উদাহরণে 'ক' হলো গচ্ছিতদাতা এবং 'খ' হলে গচ্ছিত গ্রহীতা।

গচ্ছিত প্রদানের কতকগুলি উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য থাকবে। অর্থাৎ গচ্ছিত প্রদান হতে হলে নিম্নলিখিত কিছু উদ্দেশয পূরণ হতে হবে।

(১) অর্পন—এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বস্তু অর্পন করবে।

(২) উদ্দেশ্য—বস্তু অর্পন বা প্রদান করা হবে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

(৩) প্রত্যর্পন—গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে এই মর্মে লিখিত চুক্তি থাকে যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে এই বস্তু পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে বা গচ্ছিত দাতার কথা মতো ঐ বস্তুর ব্যবস্থা হবে।

(৪) মালিকানা—গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে বস্তুর মালিকানার কোন পরিবর্তন হয় না। অর্পিত বস্তুর মালিকানা গচ্ছিতাদাতার কাছেই থাকবে।

(৫) অস্থাবর সম্পত্তি—বস্তু অর্থে অস্থাবর সম্পত্তিকে বোঝায় (movable property)। অর্থকে যেহেতু অস্থাবর বস্তু বলে মনে করা হয় না তাই অর্থপ্রদান গচ্ছিত প্রদানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গচ্ছিত প্রদানের প্রকারভেদ—ইংরাজি আইনের একটি বিখ্যাত মামলায় (Coggs Vs Barnard) Lord Hott গচ্ছিত প্রদানকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেন।

১। জমা দেওয়া, বস্তু অর্পন ও নিরাপদে রক্ষার জন্য;

২। বিনা লাভে ধার দেওয়া;

৩। বন্ধক রাখা;

৪। ভাড়া;

৫। বহন এবং মেরামত করা;

৬। বিনা পারিশ্রমিকে কোন বস্তু বহন করা বা মেরামত করা।

৫.৩.১ গচ্ছিতগ্রহীতার এবং গচ্ছিতাদাতার কর্তব্য

গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিত গ্রহীতার কিছু কর্তব্য থাকে—

১) **উপযুক্ত যত্ন নেওয়া**—গচ্ছিত গ্রহীতার কর্তব্য হলো গচ্ছিত দ্রব্যের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ সাধারণ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোক যে প্রকার যত্ন নিয়ে থাকেন, সেই প্রকার যত্নবান হবেন গচ্ছিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। সাধারণ যত্ন নেওয়ার পরেও যদি গচ্ছিত দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকবেন না।—১৫২ ধারা

(২) **ভৃত্যের অবহেলা**—গচ্ছিতগ্রহীতার ভৃত্য তার তত্বাবধানে যদি কোন বস্তুর সঠিক যত্নবান না হয় এবং তার জন্য যদি গচ্ছিতগ্রহীতার তত্বাবধানে বস্তুর ক্ষতি হয় তা হলে গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকে। সাধারণ যত্ন নেওয়া সত্বেও যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গচ্ছিত বস্তুর ক্ষতি হয় তারজন্য গচ্ছিতগ্রহীতা দায়ী হবেন না। (Sanderson V. Collins)

(৩) **অননুমত ব্যবহার**—গচ্ছিতগ্রহীতা যদি এমনভাবে বস্তুটির ব্যবহার করেন যা গচ্ছিত প্রদান চুক্তির বহির্ভুত, তাহলে সকল রকমের ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। এবং তার জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(৪) **গচ্ছিতদাতার বস্তু ও গচ্ছিতগ্রহীতার বস্তুতর মিশ্রণ**—গচ্ছিতগ্রহীতা যদি নিজের বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিতদাতার বস্তু মিশ্রিত করেন তাহলে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রযুক্ত হবে :—

(ক) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিত দাতার সম্মতিক্রমে নিজ বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিত বস্তু মিশ্রিত করেন, তা হলে নিজ নিজ অংশের অনুপাতে ঐ মিশ্রিত বস্তুতে অধিকারী হবেন।—১৫৫ ধারা।

(খ) যদি গচ্ছিতগ্রহীতা গচ্ছিতদাতার বিনা সম্মতিক্রমে নিজ বস্তুর সঙ্গে গচ্ছিতবস্তু মিশ্রিত করেন, তাহলে ঐ বস্তু যদি পৃথক করা যয় তাহলে ঐ পৃথক অংশের মালিকানা দুভাগে ভাগ হবে নিজ নিজ অংশের অনুপাতে। কিন্তু যদি তা পৃথক করা না যায়, তাহলে গচ্ছিত বস্তুর যদি ক্ষতি হয় তার জন্য ক্ষতিপূরণের দায় গচ্ছিত বহন করতে বাধ্য থাকবেন।—১৫৬ ধারা।

(৫) **বস্তু প্রত্যর্পনের দায়িত্ব**—নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে বিনা দাবিতে গচ্ছিত বস্তু ফেরৎ দেওয়া বা প্রত্যর্পন করা গচ্ছিত গ্রহীতার কর্তব্য—১৬০ ধারা।

যদি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ঐ দ্রব্য প্রত্যর্পন করা না হয়, এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে যদি ঐ দ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্য গচ্ছিত গ্রহীতা দায়ী থাকবেন।—১৬১ ধারা।

(৬) **গচ্ছিত বস্তুর পরিবৃদ্ধি**—কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে, গচ্ছিত বস্তু হতে যে লাভ জন্মায় বা গচ্ছিত বস্তুর পরিবৃদ্ধি হয় তাহলে ঐ লাভ গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিতদাতাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

উদাহরণ : A তার একটি গরু দেখাশুনার জন্য B এর কাছে রাখল। পরে গরুটির একটি বাছুর জন্মায়। B গরুর সঙ্গে বাছুরটিও ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিতদাতারও কিছু কর্তব্য থাকে :—

(১) **গচ্ছিত বস্তুর ত্রুটি প্রকাশ করা গচ্ছিতদাতার কর্তব্য**—গচ্ছিত বস্তুর যে সকল ত্রুটি আছে অর্থাৎ ঐ বস্তুর ব্যবহারে যা বাধার সৃষ্টি করে এবং গচ্ছিত গ্রহীতাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা প্রকাশ করা গচ্ছিতদাতার কর্তব্য। ঐ ব্যাপার প্রকাশ করা না হলে গচ্ছিত গ্রহীতার যদি প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি হয় তাহলে তা জন্য গচ্ছিতদাতা দায়ী থাকবেন। যদি বস্তুটি ভাড়া দেওয়া হয়, তা হলে ঐ বস্তুর ত্রুটি সম্পর্কে গচ্ছিতদাতা অবহিত থাকুন বা না থাকুন তাকে ক্ষতির জন্য দায়ী থাকতে হবে।—১৫০ ধারা।

উদাহরণ : A এর একটি গাড়ি B ভাড়া করে। গাড়িটি একটু খারাপ ছিল। A তা জানতো না। সুতরাং A, B কে বলার কোন কারণ ছিল না। B আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই আঘাতের জন্য A দায়ী থাকবে।

(২) **গচ্ছিত বস্তুর ব্যয়বহন**— যে ক্ষেত্রে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত অনুযায়ী গচ্ছিত গ্রহীতা কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না; যেখানে গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত বস্তুর উপর যে ব্যয় বহন করেন তা গচ্ছিতদাতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।—১৫৮ ধারা।

(৩) **মালিকানার গৌন শর্ত ভঙ্গের দায়িত্ব**—গচ্ছিত বস্তু গচ্ছিত প্রদান করবার বা তা ফেরৎ নেওয়ার বা সেই সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করার অধিকার গচ্ছিত দাতার না থাকার ফলে গচ্ছিত গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে, গচ্ছিত দাতা ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবেন।—১৪৬ ধারা।

উদাহরণ : A এর বিনা অনুমতিতে B, A এর গাড়ি C কে ধার দেয়। A, C এর বিরুদ্ধে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। C, B এর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী।

৫.৩.২ গচ্ছিত গ্রহীতা ও গচ্ছিতদাতার অধিকার

গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিত গ্রহীতার কিছু অধিকার থাকে—

(১) **কর্তব্য পালনে বাধ্য করানো**—গচ্ছিত গ্রহীতা আদালতের সাহায্যে গচ্ছিতদাতাকে সকল প্রকার কর্তব্য পালনে বাধ্য করতে পারেন।

(২) **যৌথ মালিকগণ কর্তৃক গচ্ছিত প্রদান**—যদি কোন বস্তুর যৌথ মালিকগণ কোন বস্তু গচ্ছিত প্রদান করেন তা হলে বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, গচ্ছিত গ্রহীতা, অপর মালিকদের বিনা অনুমতিতে কোন একজন যৌথ মালিককে বা তাঁর নির্দেশ অনুসারে ঐ বস্তু প্রদান করতে পারেন। —১৬৫ ধারা।

(৩) **স্বত্বহীন বস্তুর উপরে গচ্ছিত গ্রহীতার কোন দায়িত্ব নেই**—যদি গচ্ছিতদাতার গচ্ছিত বস্তুর উপরে কোন স্বত্ব না থাকে এবং গচ্ছিত গ্রহীতা যদি সরল বিশ্বাসে তাকে বা তার নির্দেশ অনুসারে প্রদান করেন, তাহলে প্রত্যর্পনের জন্য গচ্ছিত গ্রহীতার কোন দায়িত্ব থাকবে না।—১৬৬ ধারা।

(৪) **গচ্ছিত গ্রহীতার পূর্বস্বত্ব**—যেক্ষেত্রে গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত প্রদানের জন্য দক্ষতা ও শ্রম

ব্যয় করেন সেক্ষেত্রে কেনা বিপরীত চুক্তি না থাকলে ঐ কাজের জন্য পারিশ্রমিক না পাওয়া পর্যন্ত ঐ বস্তু আটক রাখা অধিকারী। —১৭০ ধারা। ঐ অধিকারকে গচ্ছিত গ্রহীতার পূর্বস্বত্ব বলে।

উদাহরণ : একটি অপরিস্কার হীরা খণ্ডিত ও পালিশ করার জন্য A, B কে প্রদান করে। B কাজটি সম্পাদন করেন। B যতদিন না তা কাজের পারিশ্রমিক পাবেন ততদিন পর্যন্ত পাথরটি আটকে রাখার অধিকারী।

গচ্ছিত প্রদানের গচ্ছিত দাতারও কিছু অধিকার থাকে—

(১) **কর্তব্য পালনে বাধ্য করানো**—গচ্ছিতদাতার আদালতের সাহায্যে গচ্ছিত গ্রহীতাকে তার সমস্ত কর্তব্য পালনে ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারেন।

(২) **শর্ত বিরুদ্ধ কার্য করলে চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হয়** —গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত বিরুদ্ধ কোন কাজ করলে, গচ্ছিতদাতার ইচ্ছানুসারে গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি নিষ্ফলযোগ্য হবে,—১৫৩ ধারা

উদাহরণ : C তার ঘোড়াটি চড়ার জন্য D কে ভাড়া দেয়। D ঘোড়াটিকে গাড়িতে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে C এর ইচ্ছানুসারে গচ্ছিত প্রদানের শর্ত নিষ্ফলযোগ্য হবে।

(৩) **নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানের ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যর্পনের দাবি করা যায়** — যে ক্ষেত্রে কোন বস্তু নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা কোন উদ্দেশ্যর জন্য হলেও গচ্ছিত দাতা তার ইচ্ছানুযায়ী ঐ বস্তুর দাবি করতে পারেন। কিন্তু গচ্ছিত গ্রহীতা যদি গচ্ছিত প্রদানের উপর নির্ভর করে কিছু করে থাকেন এবং যাতে তার দ্রব্য প্রত্যর্পন করলে তিনি যে সুবিধা ভোগ করছেন তার থেকে অধিক ক্ষতি হবে, তা হলে ঐ প্রত্যর্পনে বাধ্য করলে, গচ্ছিতদাতা তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবেন।—১৫৯ ধারা।

৫.৪ গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি

নিম্নলিখিত অবস্থায় সাধারণভাবে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে :

(১) **নির্দিষ্ট সময়কালের শেষে** —যদি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গচ্ছিত প্রদান হয়ে থাকে তাহলে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(২) **প্রয়োজন সিদ্ধ হলে**—যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গচ্ছিত প্রদান হয়ে থাকে তাহলে ঐ উদ্দেশ্য মিটে যাওয়ার পরেই গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি হয়।

(৩) **শর্ত বিরুদ্ধ কাজ করলে** —গচ্ছিত প্রদান চুক্তিতে যদি বিশেষ কোন শর্ত উল্লেখ থাকে তবে গচ্ছিত গ্রহীতা ঐ শর্ত বিরুদ্ধ কোন কাজ করলে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে।—১৫৩ ধারা।

(৪) **নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানে ইচ্ছা অনুযায়ী** — নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদান যেকোন সময়ে শেষ করা যায়। কিন্তু ঐ সমাপ্তির জন্য যদি গচ্ছিত গ্রহীতার কোন ক্ষতি হয় তাহলে গচ্ছিতদাতা গচ্ছিত গ্রহীতাকে ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।—৫৯ ধারা।

(৫) **মৃত্যু হলে** — নিঃশুল্ক গচ্ছিত প্রদানের ক্ষেত্রে গচ্ছিতদাতা বা গচ্ছিত গ্রহীতা কোন একজনের মৃত্যু হলে গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটবে। —১৬২ ধারা।

৫.৫. বন্ধক

ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জামানত হিসাবে অস্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত দিলে তাকে বন্ধক (Pledge) বলা হয়। গচ্ছিতাদাতাকে বলা হয় বন্ধকদাতা এবং গচ্ছিত গ্রহীতাকে বলা হয় বন্ধক গ্রহীতা।—১৭২ ধারা।

বন্ধক ও গচ্ছিত প্রদানের পার্থক্য—বন্ধক এক প্রকার গচ্ছিত প্রদান। কারণ এর দ্বারা এক ব্যক্তির কোন বস্তু অন্য এক ব্যক্তির দখলে রাখা হয়। যেমন—শেয়ার বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করলে বন্ধক গ্রহীতার কাছে তা জমা রাখতে হয়। গচ্ছিত প্রদানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ঋণ পরিশোধ বা কোন প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জামানত হিসাবে গচ্ছিত প্রদান করলে তাকে বন্ধক বলে।

৫.৫.১ বন্ধক গ্রহীতার এবং বন্ধক দাতার অধিকার

বন্ধকৃত দ্রব্যের উপরে বন্ধক গ্রহীতার কিছু অধিকার জন্মায়—

(১) **আটক রাখা**—বন্ধক গ্রহীতা কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই নয়, ঐ ঋণের সুদের বা বন্ধকী দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য তার যে প্রয়োজনীয় ব্যয় হয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু আটক রাখতে পারে।—১৭৩ ধারা।

(২) **নতুন ঋণের আটক** — বন্ধক গ্রহীতা বিশেষ পূর্ব স্বত্বের অধিকারী, অর্থাৎ বিপরীত কোন চুক্তি না থাকলে, যে ঋণের জন্য জামানত হিসাবে কোন বস্তু বন্ধক প্রদান করা হয়েছে তিনি কেবলমাত্র সেই বস্তুটিই আটক করতে পারবেন। বন্ধক গ্রহীতা যদি নতুন কোন ঋণ প্রদান করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, নতুন ঋণের জন্য ঋণগ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর উপর নতুন পূর্ব স্বত্ব সৃষ্টি করতে রাজি আছেন। —১৭৪ ধারা।

(৩) **বিশেষ ব্যয় হলে** — বন্ধকী বস্তুর যদি বিশেষ কোন রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বন্ধক গ্রহীতার কোন ব্যয় হয় তাহলে বন্ধক দাতার কাছ থেকে বন্ধক গ্রহীতা তা আদায় করতে পারবেন। —১৭৫ ধারা।

(৪) **ঋণ পরিশোধ বা অঙ্গীকার পালন না করলে মামলা বা বস্তু বিক্রয়** — যে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে তা নির্ধারিত সময়ে পালন করা না হলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার বিরুদ্ধে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে বা বন্ধক দাতাকে যুক্তি সঙ্গত বিজ্ঞপ্তি (Notice) প্রদান করে বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করতে পারে।—১৭৬ ধারা।

(৫) বিক্রয় লব্ধ অতিরিক্ত অর্থ—বিক্রয় লব্ধ অর্থের দ্বারা বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ না হলে বাকি টাকার জন্য বন্ধক দাতা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন এবং ঐ জন্য মামলা করতে পারবেন। কিন্তু যদি বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রাপ্য অর্থ হতে অধিক হয় তা হলে বন্ধক গ্রহীতা তার প্রাপ্য বুঝে নিতে বাকি টাকা বন্ধক দাতাকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।—১৭৬ ধারা।

বন্ধক গ্রহীতার ন্যায় বন্ধক দাতারও কিছু অধিকার থাকে :—

(১) **খালাস করা** — ঋণ পরিশোধ বা অঙ্গীকার পালনের নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও বন্ধকদাতা জামানতী বস্তুটি বিক্রয় হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়ে তা খালাস করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তার খেলাপ হেতু যদি বন্ধকগ্রহীতার কোন ব্যয় হয় তা তাকে দিতে হবে।—১৭৭ ধারা।

(২) **সংরক্ষণ** — বন্ধকী বস্তু সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা বন্ধক গ্রহীতার কর্তব্য। বন্ধক দাতা এই কর্তব্য পালন করাতে পারেন।

(৩) **স্বার্থ রক্ষা** — ঋণগ্রহীতার স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত বিধি (Statutes) অর্থাৎ মহাজনী অধিনিয়ম (Money lenders Act) অনুসারে বন্ধক দাতা একাধিক অধিকার ভোগ করে থাকেন।

৫.৬ প্রতিনিধিত্ব

অপরের হয়ে কাজ করাকে প্রতিনিধিত্ব বলে। A তার পক্ষে ৫০ বস্তা গম কেনার জন্য B কে নিয়োগ করেন। এখানে A হলে মুখ্য ব্যক্তি বা প্রধান (Principal) বা যে ব্যক্তির হয়ে কাজ করা হয় বা যার প্রতিনিধিত্ব করা হয়। B হলেন প্রতিনিধি (Agent) অর্থাৎ যিনি অপর ব্যক্তির হয়ে কাজ করছেন। মুখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব (Agentcy) বলে।

প্রতিনিধির কাজ — সাধারণত মুখ্য ব্যক্তি ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা প্রতিনিধির কাজ। প্রতিনিধি নিয়োগ করার সময়ে তার কাজের একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এবং প্রতিনিধিকে সেই সীমার মধ্যে থেকেই কাজ করার অধিকার প্রদান করা হয়। ঐ সীমার মধ্যে থেকে প্রতিনিধি যে কাজ করবেন তার জন্য মুখ্য ব্যক্তি দায়বদ্ধ হবেন, এবং ঐ কাজ মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

কে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন — যে কোন সাবালক এবং সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। —১৮৩ ধারা। সুস্থ মস্তিষ্ক কথার অর্থ হলো তিনি পাগল বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি নন। কিন্তু কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন না।

যুক্ত মুখ্য ব্যক্তি — কয়েকজন মুখ্য ব্যক্তি একত্রে একটি প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সকল মুখ্যব্যক্তিরই কোন না কোন স্বার্থ থাকবে।

কে প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য — নাবালক হলেও প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়া যায়। নাবালক প্রতিনিধি মুখ্য ব্যক্তিকে তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করতে পারে, কিন্তু সে নিজে মুখ্য ব্যক্তির নিকট আইনত দায়ী হবে না। —১৮৪ ধারা।

প্রতিনিধিত্বের প্রকারভেদ — কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্রতিনিধিত্ব বনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। নীচে কতকগুলো প্রতিনিধিত্বের বিবরণ দেওয়া হলো।

(১) **দালাল** (Broker) — দালাল ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন। উভয় পক্ষের পরিচয় হলে দালালের কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটে। দুই পক্ষ সরাসরি ভাবে ক্রয় এবং বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তার জন্য দালাল তার দস্তুরি বা Commission ভোগ করে থাকেন, তবে পণ্য বা মুখ্য ব্যক্তির কোন সম্মতি নিজের দখলে রাখার কোন অধিকার দালাল ভোগ করেন না।

(২) **আড়তদার** (Factor)—আড়তদারের কাছে দ্রব বা পণয বিক্রয়য়ের জন্য মজুত থাকে। কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পণয বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন। প্রতিনিধি হিসাবে কোন টাকা পাওনা থাকলে মজুত পণ্যের উপর তার সাধারণ পূর্বস্বত্ব থাকে।

(৩) **দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধি** (Commission Agent) — দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধি দস্তুরীর বিনিময়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। দস্তুরী ভোগী প্রতিনিধির পণ্যের উপর দখল থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই প্রতিনিধির অধিকার প্রায় দালালের সমান।

(৪) **নিলামদার** (Auctioneer) — নিলামদার নিলামের মাধ্যমে মুখ্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পণ্য বিক্রয়ের জন্য পণ্যের উপরে তার পূর্বস্বত্ব থাকে। নিলামদার দ্বৈত ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। পণ্য বিক্রয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিক্রেতার প্রতিনিধি কিন্তু পন্য একবার বিক্রয় হয়ে গেলে তিনি ক্রেতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। দ্রব্য বিক্রয়ের উপরে তিনি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। এমনকি মালিক যা দাম স্থির করে দেন তার থেকে কম দামেও নিলামদার পন্য বিক্রয় করলে মালিককে তা মানতে হয়।

(৫) **আশ্বাসী প্রতিনিধি** (Del Credere Agent) — এই প্রকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত দস্তুরীর বিনিময়ে আশ্বাস প্রদান করেন যে, চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষ যথাযথভাবে চুক্তি পালন করবেন। চুক্তিবদ্ধ পক্ষ যদি মূল্য প্রদানে অসমর্থ হন বা অন্য কোন প্রকারে মুখ্য ব্যক্তির কোন ক্ষতি করে থাকেন তাহলে আশ্বাসী প্রতিনিধি ঐ ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

৫.৬.১ প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি পদ্ধতি

নিম্নলিখিত যেকোন ভাবে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা যায়—

(১) **ব্যক্ত চুক্তির মাধ্যমে** (Express Agreement) : যেভাবে অন্যান্য সাধারণ চুক্তি সম্পাদিত হয় সেইভাবে প্রতিনিধিত্বের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই রকম চুক্তি লিখিত বা মৌখিক উভয় প্রকারে হতে পারে।

(২) **ধারণামূলক চুক্তির মাধ্যমে** (Implied Agreement) : মৌখিক বা লিখিত চুক্তি না থাকলেও অনেক সময় ঘটনাচক্রে প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক আসতে পারে। একে ধারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বলা হয়ে থাকে।

(৩) **স্বীকৃতির বাধার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব** (Agency by Estoppel) : যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির আচরণ দ্বারা অপর একজনকে তার প্রতিনিধি বলে মনে করা হয় বা কারো মনে বিশ্বাস উৎপাদন করেন, সে পরবর্তী কালে ঐ প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। এই রকম প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃতির বাধার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

উদাহরণ : A তাঁর ভৃত্য B কে প্রত্যহ ধারে পন্য কেনার জন্য পাঠান। একদিন B কিছু পন্য ক্রয় করলেন যা A তাকে আদেশ করেন নি। A বিক্রেতার কাছে পন্যের জন্য দায়ী হবেন। কারণ A অস্বীকার করতে পারেন না যে, B তাঁর প্রতিনিধি নয়।

(৪) **আবশ্যকতা থেকে সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব** (Agency of Necessity) : কোন কোন সময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অধিকার ছাড়াই তার প্রতিনিধির কার্য করতে বাধ্য হন। এইরকম আবশ্যকতা থেকে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ : একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন বহু দূরের কোন বন্দরে গিয়ে চূড়ান্ত অর্থাভাব দেখতে পান। জাহাজের মালিককে তা জানানো সম্ভব না হওয়ায় তিনি জাহাজটি অর্থের বিনিময়ে বন্ধক দিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে, আবশ্যকতা থেকেই ক্যাপ্টেনের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

(৫) **অনুসমর্থন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব** (Agency of Ratification) : নির্দেশ বা প্রাধিকার বহির্ভূত কোন কাজ সম্পাদিত হওয়ার পরে তাকে স্বীকৃতি প্রদান করাকে অনুসমর্থন বলে।

অনুসমর্থন ব্যক্তি (express) বা অনুক্ত (Implied) হতে পারে, অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতি দ্বারা বা আচরণ দ্বারা অনুসমর্থন হতে পারে। —১৯৭ ধারা।

উদাহরণ : A এর প্রধিকার ছাড়া Bএর জন্য পন্য ক্রয় করে। পরে B নিজের হিসাবে তা C এর নিকট বিক্রয় করে। B এর আচরণ A কর্তৃক পন্য ক্রয়ে তার অনুসমর্থন ইঙ্গিত করে।

৫.৬.২ তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রতিনিধির ব্যক্তিগত দায়িত্ব

মুখ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি প্রতিনিধি নিজে বলবৎ করতে পারে না। এবং ঐ চুক্তিতে তাঁর কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মায় না। কিন্তু যদি প্রতিনিধির চুক্তিতে ব্যক্ত বা অনুক্ত শর্ত থাকে তাহলে প্রতিনিধি নিজে ঐ চুক্তির দ্বারা দায় বদ্ধ থাকেন।—২৩০ ধারা।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, চুক্তিতে অনুক্ত শর্ত আছে যার ফলে প্রতিনিধি নিজেই চুক্তি বলবৎ করতে পারেন এবং চুক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ থাকেন :—

(১) **বিদেশী মুখ্য ব্যক্তি** — যে ক্ষেত্রে অন্য দেশে বসবাসকারী ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবে কোন পন্য ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(২) **নাম গোপন** — যেক্ষেত্রে প্রতিনিধি মুখ্য ব্যক্তির নাম গোপন রাখেন।

(৩) **যাকে অভিযুক্ত করা যায় না** — যেক্ষেত্রে মুখ্য ব্যক্তির নাম জানা গেলেও তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

(৪) **যদি মুখ্য ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে**— রেজিষ্ট্রীকৃত হয় নি এমন কোন কোম্পানির জন্য যদি কোন প্রবর্তক অন্য ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করে।

(৫) **প্রাধিকারহীন কার্য** — মুখ্য ব্যক্তির প্রাধিকারসীমা ছাড়িয়ে কোন কাজ করলে প্রতিনিধি নিজে দায়ী হন।—২২৭, ২২৮ ধারা।

(৬) **ভান করা প্রতিনিধি** — মিথ্যা জাহির করে কোন চুক্তি করলে ভান করা প্রতিনিধি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।—২৩৫ ধারা।

৫.৬.৩ প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি

উভয় পক্ষের কাজের দ্বারা বা আইনের ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে। যে অবস্থায় প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে তা উল্লেখ করা হলো

(১) **পক্ষ সমূহের কাজের দ্বারা পরিসমাপ্তি** — মুখ্য ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধির প্রাধিকার রদ করতে পারেন। আবার প্রতিনিধিত্ব অনুরূপ ভাবে তার কাজ সমাপ্ত করতে পারে। যেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব কিছুকাল ধরে চলবে বলে কোন ব্যক্ত বা অনুক্ত কোন চুক্তি থাকে সেখানে উপযুক্ত কারণ ছাড়া প্রতিনিধিত্ব রদ বা প্রত্যাখ্যান করা হলে, ক্লিষ্ট পক্ষ ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী।—২০৫ ধারা।

(২) **আইনের ক্রিয়ার দ্বারা পরিসমাপ্তি** — নিম্নলিখিত যে কোন কারণে আইনের ক্রিয়া দ্বারা প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হতে পারে :

(ক) **প্রতিধিনিত্বের কাল বা সময় শেষ হলে** — প্রতিনিধিত্বের জন্য যদি নির্দিষ্ট কোন কালের উল্লেখ থাকে, তার সমাপ্তি হলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হবে।

(খ) **উদ্দেশ্য পালনের পরে** — যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ কাজ সমাধা হলেই প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি হয়ে থাকে।

(গ) **বিষয় বস্তুর বিনাশে** — প্রতিনিধিত্বের বিষয়বস্তু বিনাশে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ঘ) **মুখ্য ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে** — মুখ্য ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মৃত্যু হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠান উঠে গেলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ঙ) **মুখ্য ব্যক্তি দেউলিয়া হলে** — আদালত কর্তৃক মুখ্য ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু প্রতিনিধি দেউলিয়া ঘোষিত হলে প্রতিনিধিত্ব চলতে পারে এবং পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

(চ) **মুখ্য ব্যক্তি বিদেশী শত্রু হলে** — মুখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি দুই দেশের লোক হলে এবং দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(ছ) **উপ-প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি** — প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটলে উপ-প্রতিনিধির প্রাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

৫.৭ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম—

- কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পন্য প্রদান করেন তাকে গচ্ছিত প্রদান বলে? যে ব্যক্তি বস্তু-প্রদান করেন তাকে গচ্ছিতদাতা এবং যাকে বস্তু প্রদান করা হয় তাকে গচ্ছিতগ্রহীতা বলে;
- গচ্ছিত প্রদান হতে হলে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ হতে হয়;
- গচ্ছিত প্রদানে গচ্ছিতদাতা এবং গচ্ছিতগ্রহীতা কিছু অধিকার ও কর্তব্য ভোগ করে যা তাদের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে;
- গচ্ছিত প্রদান পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণ;
- ঋণ পরিশোধ বা প্রতিশ্রুতি পালনের জামানত হিসাবে অস্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত দিলে তাকে বন্ধক বলে। গচ্ছিতদাতাকে বলে বন্ধকদাতা এবং গচ্ছিতগ্রহীতাকে বলা হয় বন্ধক গ্রহীতা;
- বন্ধক দাতা ও বন্ধক গ্রহীতার অধিকার;
- প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি বিভিন্ন পদ্ধতি;
- প্রতিনিধি তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হওয়ার কারণ;
- প্রতিনিধিত্ব পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণ।

৫.৮ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) গচ্ছিত প্রদান বলতে কী বোঝেন?

(২) গচ্ছিতদাতা ও গচ্ছিতগ্রহীতা কাকে বলে?

(৩) বন্ধক বলতে কী বোঝেন?

(৪) প্রতিনিধিত্ব বলতে কী বোঝায়?

(৫) নিলামদার এবং দস্তুরীভোগী প্রতিনিধির সংজ্ঞা দিন।

(৬) ব্যক্ত এবং লিখিত চুক্তি বলতে কী বোঝায়?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

(১) গচ্ছিত প্রদান হতে হলে কী কী উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া প্রয়োজন?

(২) গচ্ছিতদাতার অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা করুন।

(৩) গচ্ছিতগ্রহীতার অধিকার ও কর্তব্যগুলি আলোচনা করুন।

(৪) কোন কোন অবস্থায় গচ্ছিত প্রদানের পরিসমাপ্তি ঘটে?

(৫) বন্ধক দাতার অধিকার গুলি আলোচনা করুন।

(৬) কি কি কারণে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্ট হয়? যে কোন দুটি প্রতিনিধিত্বের বিবরণ দিন।

(৭) তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে কাজের জন্য প্রতিনিধি কিভাবে দায়বদ্ধ হন?

(৮) প্রতিনিধিত্বের পরিসমাপ্তির বিভিন্ন কারণগুলি আলোচনা করুন।

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-2001.

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ১ ❑ পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রকৃতি

১.৩ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

১.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

১.৫ চুক্তি গঠন

১.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

১.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত

১.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের পার্থক্য

১.৬.২ অনুক্ত শর্ত

১.৭ স্বত্ব হস্তান্তর

১.৭.১ মালিক নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর

১.৮ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

১.৯ ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

১.১০ নিলাম বিক্রয়

১.১১ সারাংশ

১.১২ অনুশীলনী

১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- পণ্য বিক্রয় আইন কী ও এর প্রয়োজনীয়তা
- স্বত্ব হস্তান্তর কী
- নিলাম বিক্রয় কী

১.১ প্রস্তাবনা

পণ্য বিক্রয় একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনটি ১৯৩০ সালে চালু হয় এবং এর নাম পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০। এই আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন বিভিন্ন পণ্যের সংজ্ঞা, মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত, নিলাম বিক্রয় ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ বিক্রয়ের চুক্তির প্রকৃতি

পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এই আইনে আলোচনা করা হয়েছে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি অন্যান্য সাধারণ চুক্তির মতোই এক ধরনের চুক্তি। অবশ্য সাধারণ চুক্তির সঙ্গে পণ্য বিক্রয় চুক্তির কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি, কিন্তু সাধারণ চুক্তি যে কোনো বিষয়ে সম্পাদিত হতে পারে।

২। পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সাধারণত মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। সাধারণ চুক্তিতে ইহা নাও হতে পারে।

৩। প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থ সবদাই পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রতিদান, কিন্তু সাধারণ চুক্তিতে এরূপ নাও হতে পারে।

এই সব পার্থক্য থাকার জন্যে ১৯৩০ সালে ভারতীয় চুক্তি আইন থেকে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত ধারাসমূহ প্রত্যাহার করে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা যায়। এই আইনের নাম পণ্য বিক্রয় আইন, ১৯৩০।

১৩. বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে।

১। ক্রেতা [২(১) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে বা ক্রয় করার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে ক্রেতা বলে।

২। বিক্রেতা [২(১৩) ধারা] — যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করে বা বিক্রয় করবার জন্য অঙ্গীকার করে তাকে বিক্রেতা বলে।

৩। মূল্য [২(১০) ধারা] — পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ বা প্রতিশ্রুত অর্থকে প্রতিদান বলা হয়।

৪। স্বত্ব [২(১১) ধারা] — পণ্যের উপর সাধারণ মালিকানাকেই স্বত্ব বলা হয়।

৫। অর্পণ [২(২) ধারা] — এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির নিকট দখলের স্বেচ্ছা প্রদত্ত হস্তান্তরকে অর্পণ বলা হয়।

৬। পণ্য [২(৭) ধারা] — অর্থ এবং মোকদ্দমাযোগ্য দাবি ছাড়া অন্যান্য সব রকমের অস্থাবর সম্পত্তিকে পণ্য বলা হয়। যেমন সম্ভার (Stock), শেয়ার ও জমিতে যে সব দ্রব্য, জন্মায়, বাণিজ্য চিহ্ন (Trade maak), গ্রন্থ-স্বত্ব (Copyright), সুনাম (Goodwill), জল, গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে পণ্য হিসাবে অভিহিত করা হয়।

১.৪ পণ্যের শ্রেণীবিভাগ

পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান বিষয় পণ্য নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পারে।

১। বিদ্যমান পণ্য ২। ভবিষ্যৎ পণ্য ৩। ঘটনাসাপেক্ষ পণ্য।

১। **বিদ্যমান পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের সময় যে সকল পণ্যের মালিকানা ও দখল বিক্রেতার হাতে থাকে সেই সকল পণ্যকে বিদ্যমান পণ্য বলা হয়।

বিদ্যমান পণ্য আবার দুই প্রকারের হতে পারে ঃ

ক) **নির্দিষ্ট পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনকালে যে সকল পণ্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যার সম্পর্কে সম্মতি পাওয়া গেছে তাকে নির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়।

খ) **অনির্দিষ্ট পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় যে সকল পণ্য নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, শুধুমাত্র সাধারণ বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে তাকে অনির্দিষ্ট পণ্য বলা হয়।

২। **ভবিষ্যৎ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের পর বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্য উৎপাদিত, সংগৃহীত, অর্জিত বা নির্মিত হয় তাকে ভবিষ্যৎ পণ্য বলে।

ক, খ এর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করল যে আগামী জানুয়ারী মাসে ক-এর চিড়াকলে যত চিড়া উৎপন্ন হবে তা খ নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করবে।

৩। **ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতা কর্তৃক যে পণ্যের সংগ্রহ এমন একটি ঘটনার উপর নির্ভর করে যা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে তাকে ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য বলা হয়।

ক একটি মেশিন খ-কে বিক্রয় করতে সম্মত হল যদি ক ঐ মেশিনটির বর্তমান মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে। ইহাই ঘটনাসাপেক্ষ চুক্তি।

১.৫ চুক্তিগঠন

৪(১) ধারা অনুযায়ী পণ্য বিক্রয় চুক্তি এমন একটি চুক্তি যেখানে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে মূল্যের বিনিময়ে পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত করে বা করতে সম্মত হয়। একজন আংশিক মালিক এবং অন্যের সঙ্গেও পণ্য বিক্রয় চুক্তি হতে পারে। পণ্য বিক্রয় চুক্তি শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত হতে পারে।

বিক্রয় ও বিক্রয়ের সম্মতি ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হলে তাকে বিক্রয় বলে। কিন্তু পণ্যের মালিকানা ভবিষ্যতে বা শর্তসাপেক্ষে হস্তান্তরের জন্য সম্মত হলে তাকে বিক্রয়ের সম্মতি বলা হয়।

সুতরাং পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর কখন ঘটছে তার উপরেই বিক্রয় বা বিক্রয়ের সম্মতি তা নির্ধারিত হবে। বিক্রয়ের সম্মতির ক্ষেত্রে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে বা মালিকানা হস্তান্তরের শর্তাদি পূরণ হলে বিক্রয়ের সম্মতি বিক্রয়ে পরিণত হবে। বিক্রয় হল সম্পাদিত চুক্তি কিন্তু বিক্রয়ের সম্মতি একটি সম্পাদ্য চুক্তি।

১.৫.১ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ

পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

১। **দুই পক্ষ ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে দুটি পৃথক পক্ষ থাকবে। একপক্ষ ক্রেতা এবং অপরপক্ষ বিক্রেতা হবে। ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে অবশ্যই চুক্তি করার উপযুক্ত হতে হবে।

২। **পণ্য ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তির মুখ্য বিষয় অস্থাবর পণ্য যেখানে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়।

৩। **মূল্য ঃ** পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি হতে হবে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেন পণ্য বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে না।

৪। **বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ঃ** পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে ভারতীয় চুক্তি আইনে বৈধ চুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকতে হবে। যেমন প্রস্তাব ও স্বীকৃতি, স্বাধীন দায়, চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা, আইনগত প্রতিদান ও আইনগত উদ্দেশ্যসহ নয়টি উপাদান বিদ্যমান থাকা চাই।

৫। **পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর ঃ** বিক্রেতার পণ্যে যে স্বত্ব রয়েছে, তা অবশ্যই ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে হবে।

১.৬ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত

পণ্য বিক্রয়ের চুক্তিতে বিভিন্ন শর্তগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে—১। মুখ্য শর্ত এবং ২। গৌণ শর্ত

১। মুখ্য শর্ত [১২(২) ধারা] ঃ পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত, যা ভঙ্গ করলে চুক্তি প্রত্যাখান করার অধিকার জন্মায়।

২। গৌণ শত [১২(৩) ধারা] ঃ পণ্য বিক্রয় চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যেণ পক্ষে একটি আনুষঙ্গিক শর্ত, যাহা ভঙ্গ করলে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার জন্মায় কিন্তু চুক্তি প্রত্যাখান করার বা পণ্য গ্রহণ না করার অধিকার জন্মায় না।

কোনো একটি পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির শর্ত মুখ্য শর্ত কী গৌণ শর্ত তা প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তি গঠনের উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে গৌণ শর্ত বলে উল্লেখ থাকলেও ঐ শর্ত মুখ্য শর্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। আদালত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করবেন যে কোন্ শর্ত মুখ্য হবে এবং কোন্ শর্ত গৌণ হবে।

মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

রাম শ্যামের সঙ্গে একটি গাড়ি বিক্রয়ের চুক্তি করল এই মর্মে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. যেতে পারে। পরে দেখা গেল যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৫০ কিমি. যায়। এই ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত হয় নি বলে ধরা হবে। কিন্তু শ্যাম যদি রামকে বলে যে গাড়িটি এক লিটার ডিজেলে ৬০ কিমি. না গেলে সে গাড়িটি কিনবে না তবে রাম মূল শর্ত ভঙ্গের জন্য দায়ী হবে। প্রথম ক্ষেত্রে গৌণ শর্ত পালিত না হওয়ায় শ্যাম চুক্তি প্রত্যাখান করতে পারবে না। শুধু ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করতে পারবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুখ্য শর্ত ভঙ্গ হওয়ায় শ্যাম চুক্তি বর্জন করতে পারবে এবং গাড়ি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে পারবে।

১.৬.১ মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য

১। মুখ্য শর্ত চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যেণ পক্ষে অপরিহার্য চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য পালন মুখ্য শর্তের পালনের উপর নির্ভর করবে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত হল চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক।

২। মুখ্য শর্ত ভঙ্গ হলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। অন্যদিকে গৌণ শর্ত ভঙ্গ করলে ক্রেতা চুক্তি বাতিল করতে পারে না কিন্তু ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। শর্ত মুখ্য হবে না গৌণ হবে তা চুক্তিভুখত পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে শর্ত গৌণ বলে উল্লিখিত হলেও মুখ্য বলে গণ্য হতে পারে।

৪। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মুখ্য শর্ত ভঙ্গকে গৌণ শর্ত ভঙ্গ বলে গণ্য করতে পারে কিন্তু গৌণ শর্ত ভঙ্গ হলে একে মুখ্য শর্ত হিসাবে গণ্য করা যায় না এবং চুক্তিও বাতিল করতে পারে না।

■ **কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত বলে ধরা হয়।**

১। শর্ত পরিহার ঃ— ক্রেতা মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে গৌণ শর্তের ভঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে

পারে, অর্থাৎ মুখ্য শর্তের ভঙ্গকে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসাবে গ্রহণ না করে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। চুক্তি বর্জনের অধিকার ক্রেতার নিজের ইচ্ছাধীন। অবশ্য শর্ত পরিহার করে থাকলে পরে শর্ত পালন দাবি করিতে পারবে না।

২। ইচ্ছাকৃত পরিহার ঃ— চুক্তিতে যদি বিক্রেতার মুখ্য শর্ত পালনের প্রতিশ্রুতি থাকে এবং বিক্রেতা যদি ইহা পালন করতে না পারে তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ মুখ্য শর্তকে গৌণ শর্ত হিসাবে গণ্য করে চুক্তি বাতিল করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

৩। স্বয়ংক্রিয় পরিহার ঃ— ক্রেতা যদি পণ্য বা পণ্যের কিছু অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য শর্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিহার করা হয়। ক্রেতার তখন চুক্তি বাতিল করবার ক্ষমতা লোপ পায়।

যেক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং ক্রেতা সকল পণ্য বা উহার অংশবিশেষ গ্রহণ করেছে অথবা নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে সেক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক কোনো মুখ্য শর্ত পূরণ না করলে উক্ত শর্ত গৌণ শর্তরূপে গণ্য হবে।

১.৬.২ অনুক্ত শর্ত

চুক্তিতে অন্যরূপ কোন বিধান না থাকলে, ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইন অনুসারে নিম্নলিখিত শর্তগুলিকে অনুক্ত শর্ত বলে ধরা হয়ে থাকে।

১। পণ্যের মালিকানা ঃ ক) বিক্রয়ের চুক্তিতে বিক্রেতার পণ্য বিক্রয়ের অধিকার থাকে বলে ধরা হয়। পণ্য বিক্রয় করার সম্মতি বা অঙ্গীকারে ইহা অনুমানযোগ্য যে মালিকানা হস্তান্তরের সময় বিক্রেতার বিক্রয় করবার অধিকার থাকবে।

যেমন ঃ রাম শ্যামের নিকট একটি গাড়ি কিনে কিছুকাল ব্যবহার করার পর জানা গেল রাম শ্যাম গাড়ির প্রকৃত মালিক নয় অথবা তার বিক্রয় করার কোনো অধিকার নেই। সেক্ষেত্রে রাম প্রকৃত মালিককে গাড়িটি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। এখানে রাম গাড়িটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি তাহার ক্রয়মূল্য ফেরত পাবার অধিকারী।

খ) ট্রেড মার্ক ভঙ্গ করে পণ্য বিক্রয় করে থাকলে বিক্রেতা মালিকানা সম্বন্ধে মুখ্য শর্ত করেছে ধরা হবে।

২। বর্ণনা দ্বারা বিক্রয় ঃ যেক্ষেত্রে বর্ণনার দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পণ্যটি বর্ণনার সঙ্গে মিলবে।

উদাহরণ ঃ মারুতি ৪০০ কার হিসাবে একটি গাড়ি বিক্রয় করা হয়। পরে দেখা যায় গাড়িটি বর্ণিত গাড়ি নয়। ক্রেতা গাড়ি ফেরত দিয়ে পারে।

৩। নমুনা দ্বারা বিক্রয় ঃ নমুনা দ্বারা বিক্রয়ে নিম্নলিখিত অনুক্ত শর্ত থাকে ঃ—

ক) পণ্য সমষ্টির উৎকর্ষ নমুনার মতো হবে।

খ) নমুনার সঙ্গে পণ্য মিলিয়ে দেখবার যুক্তিসম্মত সুযোগ ক্রেতাকে দিতে হবে।

গ) পণ্যে এরূপ কোনো ত্রুটি থাকবেনা, যা দ্বারা উহা বাণিজ্যোপযোগী না হয় এবং যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়বে না কিন্তু যদি পণ্যে এমন দোষ থাকে যা নমুনার যুক্তিসম্মত পরীক্ষা দ্বারা ধরা যায় কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি পণ্য পরিদর্শনের সময় বা নমুনা পরীক্ষার সময় এরূপ ত্রুটি আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হয় তার জন্য সে চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, এক্ষেত্রে সকল দায় ক্রেতার।

৪। **পণ্যের উৎকর্ষ বা কার্যোপযোগিতা ঃ** ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, পণ্য বিক্রয় আইনে বা অন্য কোনও আইনে কোথাও অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি অনুসারে যে পণ্য বিক্রি করা হয় তাতে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে জন্যে উৎকর্ষ বা উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো শর্ত থাকে না। এই পণ্য সম্পর্কে যাবতীয় ঝুঁকি ক্রেতাকে বহন করিতে হয়। ইহাই "ক্রেতা সাবধান নীতি" কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

ক) যেক্ষেত্রে ক্রেতা যে উদ্দেশ্যে পণ্য প্রয়োজন তা বিক্রেতাকে জানায় যাতে দেখা যায় যে, ক্রেতা বিক্রেতার বুদ্ধিমত্তা বা বিচারশক্তির উপর নির্ভর করেছিল এবং পণ্যের এমন বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা এরূপ পণ্য সরবরাহ করা বিক্রেতার কর্তব্য সেক্ষেত্রে উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য পণ্যটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উপযুক্ত হওয়া একটি মুখ্য শর্ত।

খ) যেক্ষেত্রে বর্ণনা দ্বারা পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং বিক্রেতা ঐ বর্ণনারূপ পণ্যের ব্যবসা করে সেক্ষেত্রে এরূপ মুখ্য শর্ত থাকে যে, ঐ পণ্য বাণিজ্যোপযোগী গুণসম্পন্ন হবে। অবশ্য ক্রেতা যদি পণ্যটি পরীক্ষা করে নেয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ত্রুটি বার করা যায়, এরূপ ত্রুটির জন্য কোনো অনুক্ত শর্ত থাকবে না।

১.৭ স্বত্ব হস্তান্তর

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ১৮-২৫ ধারাসমূহের পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কীয় বিধানসমূহ নীচে উল্লেখ করা হল।

১। **অনির্ধারিত পণ্য ঃ** অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারিত না হয় ততক্ষণ পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না।

২। **নির্দিষ্ট পণ্য ঃ** নির্দিষ্ট বা নির্ণীত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ইচ্ছামত সময়ে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে পক্ষগণের ইচ্ছা নির্ণয় করবার জন্য চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগণের আচরণ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা না থাকলে হস্তান্তরের সময় সম্পর্কে ২০ থেকে ২৪ নং ধারায় বর্ণিত বিধানগুলি প্রয়োগ করে ঐ সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা নির্ণয় করতে হবে। ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২০ হইতে ২৪ নং ধারার বিধানসমূহ নীচে প্রদত্ত হল।

ক) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি যদি অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকে তা হলে চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়। এইক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের বা পণ্য অর্পনের সময় অথবা উভয়ই স্থগিত রাখা হয়েছে কিনা তা পণ্যের হস্তান্তর সম্পর্কে অবান্তর (২০ ধারা)।

ক, খ কে তাহার বাড়িটি দুই মাসের জন্য ধারে বিক্রয় করিতে রাজি হয়ে প্রস্তাব দিল। খ এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির স্বত্ব খ এর নিকট হস্তান্তরিত হল।

খ) নির্দিষ্ট পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি হলে এবং অর্পণযোগ্য অবস্থায় আনতে বিক্রেতাকে কোনো কিছু করতে হলে বিক্রেতা তা না করা পর্যন্ত এবং উহা করা হলে ক্রেতা নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। (২১ ধারা)

গ) পণ্য অর্পণযোগ্য অবস্থায় থাকলেও পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, পণ্যের ওজন, মাপ, পরীক্ষা অথবা অন্য কোনো কার্য করতে বিক্রেতা যদি বাধ্য থাকেন, তা হলে ঐ সকল কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং উহা যে সম্পন্ন করা হয়েছে সেই সম্পর্কে ক্রেতাকে নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয় না। (২২ ধারা)

ঘ) অনুমোদন সাপেক্ষে বা বিক্রয় বা ফেরত সাপেক্ষে যখন কোনো পণ্য অর্পণ করা হয়ে থাকে তখন নিম্নরূপে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়।

i) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে জানায় বা লেনদেনটিকে স্বীকার করে কোনো কাজ করে।

ii) যখন ক্রেতা তার অনুমোদন বা স্বীকৃতি বিক্রেতাকে না জানায় অথচ অস্বীকৃতির নোটিশ না দিয়া পণ্য রেখে দেয়। তা হলে পণ্য ফেরতের সময় নির্দিষ্ট থাকলে উক্ত সময় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং যদি ঐরূপ কোন সময় নির্দিষ্ট না থাকে, তা হলে, যুক্তি সঙ্গত সময় উত্তীর্ণ হবার পর।

বিলি ব্যবস্থার অধিকার সংরক্ষণ ঃ অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা চুক্তি উল্লিখিত উদ্দেশ্য প্রয়োগের শর্ত দ্বারা অথবা অন্য কোনো শর্ত সাপেক্ষ পণ্যের বিলি ব্যবস্থার সংরক্ষণ করতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যটি ক্রেতার নিকট অর্পণ করা হলেও অথবা ক্রেতার নিকট পণ্যটি পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোনো বাহক বা গচ্ছিত গ্রহীতার নিকট পণ্য অর্পণ করা হলেও বিক্রেতা কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ না হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে না।

যেমন ঃ চালানী রসিদ ও বাণিজ্যিক হুণ্ডি অনেক সময় ক্রেতার নিকট একত্রে এই শর্তে প্রেরণ করা হয় যে বাণিজ্যিক হুণ্ডিতে স্বীকৃত জ্ঞাপন না করলে বা উহার অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত চালানী রসিদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হবে না। (২৫ ধারা)।

ঝুঁকি হস্তান্তর ঃ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে বিপরীত মর্মে কোনো সম্মতি না থাকলে ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা ঐ পণ্যের ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ক্রেতার নিকট পণ্যের স্বত্ব হস্তান্তরিত হলে ক্রেতাকে অর্পণ করা হউক বা না হউক, ক্রেতা পণ্যের ঝুঁকি বহন করবে। ঝুঁকি স্বত্বের অনুগামী। স্বত্ব যার ঝুঁকি তার। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

১। ক্রেতা বা বিক্রেতার দোষ পণ্য অর্পণে বিলম্ব হলে এবং উহার দরুন কোনো লোকসান হলে, যে পক্ষের দোষে ঐরূপ বিলম্ব ঘটেছে, সেই পক্ষ ঐ বিলম্বের ঝুঁকি বহন করবে।

২। ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের মধ্যে এইরূপ শর্তে সম্মত হতে পারে যে, স্বত্ব হস্তান্তরের সময় হতে পৃথক কোনো সময়ে পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

১.৭.১ মালিক নহে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মালিকানার হস্তান্তর

পণ্যেণ মালিকানা ও স্বত্ব হস্তান্তরের সাধারণ নিয়ম এই যে, শুধুমাত্র পণ্যেণ মালিকই পণ্য বিক্রয় করবার অধিকারী, অন্য কেউ নয়। যে ব্যক্তি পণ্যের মালিক নয়, সে যদি পণ্য বিক্রয় করে অথবা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বলে তার সম্মতি না নিয়ে পণ্য বিক্রয় করে, তা হলে উক্ত পণ্যের ক্রেতা ঐ পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব লাভ করতে পারে না। একটি ল্যাটিন কথায় ইহা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—

'Nemo dat qui non nabet' ইহার অর্থ হল এই যে, "যার যা নাই সে তা দিতে পারে না" অর্থাৎ পণ্যের উপর বিক্রেতার যেরূপ স্বত্ব আছে সে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব দিতে পারে না। এই নীতি স্থাবর অস্থাবর সকল শ্রেণীর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৭ থেকে ৩০ নং ধরাসমূহে এ নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

১। **স্বীয় আচরণের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতায় মালিকানা ঃ** যেক্ষেত্রে পণ্যের প্রকৃত মালিক স্বীয় আচরণ বা কথাবার্তা দ্বারা ক্রেতার মনে এরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, পণ্যের বিক্রেতাই উহার মালিক এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ক্রেতা উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে, সেক্ষেত্রে সে তার আচরণের দরুন পণ্য বিক্রেতার পণ্যে কোনো মালিকানা ছিল না, এরূপ অজুহাত তুলতে পারে না। (২৭ ধারা)।

উদাহরণ ঃ P তার নিজের একটি যন্ত্র Q এর নিকট রাখতে দেয়। R নামক এক ব্যক্তি Q এর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করে যন্ত্রটি ক্রোক করল। P বহুদিন যাবৎ ঐ যন্ত্রটির কোনো খোঁজ খবর নিল না। সে R এর উকিলের সঙ্গে ডিক্রিজারি সম্পর্কে কথাবার্তা বলল কিন্তু যন্ত্রে তার স্বত্ব সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করল না। R ঐ যন্ত্রটি ডিক্রিজারি করে বিক্রি করল। আদালত রায় দিলেন যে P তার আচরণের ফলে আর এই অজুহাত তুলতে পারবে না যে ঐ যন্ত্রটি মালিক নহে।

২। **বাণিজ্যিক প্রতিনিধির দ্বারা বিক্রয় ঃ** মুখ্যব্যক্তির সম্মতিতে পণ্য অথবা পণ্যের স্বত্বের দলিল যদি বাণিজ্যিক প্রতিনিধির নিকট থাকে, তা হলে উক্ত পণ্য বিক্রয় করবার ক্ষমতা না পেলে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি উহা বিক্রয় করলে ক্রেতা উক্ত পণ্যের বিক্রেতা অপেক্ষা পণ্যের উন্নততর মালিকানা লাভ করবে যদি (ক) বিক্রেতা উহা ব্যবসায়ের সাধারণ কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে বিক্রয় করে থাকে। (খ) পণ্যটি বিক্রয় করবার সময় পণ্য বিক্রেতার যে পণ্যটি বিক্রয় করবার অধিকার ছিল না তা না জেনে ক্রেতা যদি উহা সৎ বিশ্বাসে ক্রয় করে থাকে ।

৩। **একজন যৌথ মালিক কর্তৃক বিক্রয় ঃ** কোনো যৌথ মালিকানার পণ্য যদি যৌথ মালিকগণের সম্মতি অনুসারে উহাদের একজন যৌথ মালিকের একক দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ যৌথ মালিকের কাছ থেকে কেউ যদি সদ্বিশ্বাসে উহা ক্রয় করে এবং যদি পণ্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতার বিক্রয়ের কোনো অধিকার ছিল না একথা তার জানা না থাকে, তা হলে পণ্যের স্বত্ব ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হবে।

৪। **বাতিলযোগ্য চুক্তির দ্বারা দখলদার ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয় ঃ** ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯, ১৯(ক) নং ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত চুক্তি বালিতযোগ্য বলে গণ্য হয় সেই সকল চুক্তিতে পণ্যের ক্রেতা পণ্যের দখল নিয়ে থাকলে এবং বিক্রয়ের সময় ঐ চুক্তি

রদবদল না হলে থাকলে ক্রেতা সরল বিশ্বাসে এবং বিক্রেতার স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত হি না জেনে ক্রয় করিলে উক্ত পণ্যের নির্দায় স্বত্ব লাভ করবে।

৫। **বিক্রয়ের পরেও পণ্যের দখলদার বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ** ভারতীয় পণ্য বিক্রয় আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বিক্রয়ের পরও পণ্য বা পণ্যটির মালিকানার দলিল নিজের কাছে রেখে দেয় এবং বিক্রেতা ঐ পণ্য বা উহার মালিকানার দলিল পুনরায় অপর কারও নিকট বিক্রয় করে দেয় সেক্ষেত্রে নূতন ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার মালিকানার ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে উহা সরল বিশ্বাসে ক্রয় করে।

৬। **বিক্রয়ের পরে পণ্যের দখলদার ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় ঃ** পণ্য বিক্রয় আইনের ৩০(২) ধারায় বলা হয়েছে যে যখন ক্রেতা কোনো পণ্য ক্রয় করে বিক্রেতার সম্পতিতে তার দখল পেয়েছে, কিংবা পণ্যের মালিকানার দলিল পেয়েছে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা যদি ঐ পণ্য অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে, তবে যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে আগের কোনো লেনদেনের ঘটনা না জেনে তা ক্রয় করে, পণ্যের প্রকৃত মালিকের ঐ পণ্যে কোনো স্বত্ব থাকলেও সে ঐ পণ্যে উত্তর মালিকানা স্বত্ব পাবে।

৭। **অপরিশোধিত বিক্রেতা কর্তৃক পুনর্বিক্রয় ঃ** যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য পায় নি সেক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি পণ্যে তার পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ করে পণ্য পুনরায় বিক্রয় করে, তবে ক্রেতা আদি ক্রেতা থেকে উত্তম মালিকানা পাবে।

৮। **প্রাপ্ত দখলদার কর্তৃক বিক্রয় ঃ** প্রাপ্তবস্তুর দখলকার পণ্যের মালিক না হয়েও যদি প্রকৃত মালিককে খুঁজে না পায় কিংবা প্রাপ্তবস্তুর দখলকারকে পণ্যের জন্য যে টাকা খরচ হয়েছে, তা যদি না দিতে পারে অথবা যদি পণ্য নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তবে প্রাপ্তবস্তুর দখলকার তার হেফাজতে যে পণ্য থাকে তা প্রকৃত মালিক না হয়েও বিক্রয় করতে পারে।

৯। **বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক পণ্য বিক্রয় ঃ** বন্ধকদাতা যদি চুক্তি অনুসারে বন্ধকগ্রহীতার পাওনা মিটিয়ে দিতে না পারে, তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী পণ্য বিক্রয় করে ক্রেতাকে উত্তম মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে।

১.৮ পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার

অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার ঃ তাঁর অধিকার দুই রকমের (১) পণ্যের উপর এবং (২) ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে।

পণ্যের উপর অধিকার ঃ

১) **বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব ঃ** পূর্বস্বত্ব (lien) বলতে কোনো ব্যক্তির দখলে অপর কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি থাকলে কোনো নির্দিষ্ট দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দখলকারী ব্যক্তি কর্তৃক নিজ দখলে রাখবার অধিকারকে বোঝায়। মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত পাওনাদার কর্তৃক পণ্য নিজ দখলে রাখার অধিকারকে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব বলে। পণ্য বিক্রয় আইনের ৪৫-৪৬ ধারাসমূহে অপরিশোধিত বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব সম্পর্কে বিস্তাতির উল্লেখ রয়েছে।

২) **পরিবহনাধীন পণ্য আটকের অধিকার ঃ** পণ্য বিক্রয় আইনের ৫০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে পড়লে, যে অপরিশোধিত বিক্রেতা পণ্যের দখল ত্যাগ করেছে এবং যখন ঐ পণ্য ক্রেতার

অভিমুখে পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে, সে সময় তা আটক করার বা পুনরায় নিজ দখলে নেওয়ার ও যে পর্যন্ত না তার মূল্য সে পাচ্ছে সে পর্যন্ত তা নিজের কাছে রাখার অধিকার ঐ বিক্রেতার রয়েছে। ঐ অধিকার প্রয়োগ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্ত পালিত হওয়া চাই ঃ ১) পণ্যের সম্পূর্ণ বা অংশ প্রদত্ত হয় নি; ২) পণ্য পরিবহনাধীন অবস্থায় রয়েছে; ৩) পণ্য বিক্রয় আইনের অন্য কোনো ধারায় বিক্রেতা কর্তৃক এই অধিকার প্রয়োগের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

পণ্য পরিবহনাধীন আছে না ঐ অবস্থা শেষ হয়েছে তা নির্ধারণ করার জন্য ৫১ ধারায় নিয়মাবলী নির্দেশ করা হয়েছে।

৩। **পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ঃ** নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে অপ্রদত্ত মূল্য বিক্রেতা তার দখলাধীন বিক্রীত পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার ভোগ করে। (৫৪ ধারা)

ক) যে ক্ষেত্রে পণ্য পচনশীল প্রকৃতির।

খ) যে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পূর্বোক্ত অধিকারদ্বয় প্রয়োগপূর্বক ক্রেতাকে নোটিশ দিয়ে ঐ পণ্য পুনর্বিক্রয়ের ইচ্ছা জানানো সত্ত্বেও, ক্রেতা তার পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য প্রদান বা দাখিল করেন নি।

গ) যে ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদানে সক্ষম হলে পণ্য পুনর্বিক্রয়ের অধিকার বিক্রেতা চুক্তির সাহায্যে সংরক্ষিত হয়েছে।

১.৯ ব্যক্তিগতভাবে ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকার

১) পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা ঃ যে ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য প্রদান করতে অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে অপরিশোধিত বিক্রেতা মূল্য আদায়ের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন।

২) ক্ষতিপূরণের মামলা ঃ যদি ক্রেতা মূল্যপ্রদানে অস্বীকার করে তবে অপরিশোধিত বিক্রেতা ক্রেতার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে।

৩) সুদ আদায়ের মামলা ঃ অনেক সময় পণ্য বিক্রয় চুক্তিতে এই মর্মে শর্ত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা পণ্যেণ মূল্য প্রদান না করলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যেণ মূল্য বাবদ পাওনা টাকার উপর অতিরিক্ত সুদ দেবে।

১.১০ নিলাম বিক্রয়

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে পণ্যের মালিক তা তার প্রতিনিধি জনসাধারণের কাছে তার পণ্য নিলামে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়। এই ব্যাপারে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্য দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তার কাছে পণ্য বিক্রয় করা হয়। পণ্য বিক্রয় আইনের ৬৪ নং ধারায় নিলাম বিক্রয়ের নিয়মাবলীর নির্দেশ আছে।

১.১১ সারাংশ

এই এককে পণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের পন্য যেমন—ঘটনা সাপেক্ষ পণ্য, ভবিষ্যত পণ্য সম্পর্কে জেনেছেন, আবার বিভিন্ন শর্তের মধ্যে মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্ত আলোচনা করা হয়েছে। মুখ্য শর্ত হল অবশ্য পালনীয় শর্ত। মুখ্য শর্ত পালিত না হলে চুক্তি বাতিল হয়।

১.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পণ্য কাকে বলে?

২। পণ্য কয় প্রকার ও কী কী?

৩। মুখ্য শর্ত ও গৌণ শর্তের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

৪। অপরিশোধিত বিক্রেতা বলতে কী বোঝেন?

৫। অপরিশোধিত ক্রেতার বিরুদ্ধে অপরিশোধিত বিক্রেতার অধিকারগুলি লিখুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। বিক্রয় চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলি কী কী?

২। পণ্য বিক্রয় আইনে ক্রেতার অধিকারগুলি কী কী?

৩। পণ্য বিক্রেতার পণ্যের উপর যে স্বত্ব আছে তা অপেক্ষা উন্নততর স্বত্ব সে পণ্য ক্রেতাকে দিতে পারে না। ব্যতিক্রমগুলিসহ আলোচনা করুন।

৪। কিস্তিবন্দী বিক্রয় ও বিক্রয় চুক্তির মধ্যে পার্থক্যগুলি লিখুন।

৫। পণ্য বিক্রয় চুক্তি বলতে কী বোঝেন? পণ্য বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম কী?

১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-২০০১

(২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

(৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ ☐ ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ এই আইন অনুসারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

২.৩ ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য

২.৪ কেন্দ্রয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

২.৪.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

২.৪.২ কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্য

২.৫ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

২.৫.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

২.৫.২ রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য

২.৬ জেলা বিচারালয়

২.৬.১ জেলা বিচারালয়ের গঠন

২.৬.২ জেলা বিচারালয়ের অধিকার বা এক্তিয়ার

২.৬.৩ অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি

২.৭ দণ্ড বা শাস্তি

২.৮ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ মোকদ্দমার রায়

২.৯ সারাংশ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- অভিযোগ কী ও কখন করা যায়,
- ক্রেতা বা ভোক্তা কে,
- অভিযোগ নিষ্পত্তির উপায়,

২.১ প্রস্তাবনা

অনেক সময় ক্রেতারা যে দাম দেন সেই দামের তুলনায় তাঁরা যে পণ্য আশা করেন তা তাঁরা পান না, অর্থাৎ বিক্রেতাদের কাছে তাঁদের ঠকতে হয়। তাই ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষা, অধিকার রক্ষা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন (The Consumer Protection Act) চালু করা হয়। এই আইনের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য। এই আইনটিতে ক্রেতা হিসাবে আপনি কখন ও কোথায় অভিযোগ করবেন এবং কীভাবে অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

২.২. এই আইন অনুসারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

◆ **অভিযোগকারী (Complainant) [ধারা 2(b)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(b) ধারা অনুসারে অভিযোগকারী বলতে বোঝায়—

১। ক্রেতা,

২। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার,

৩। একই স্বার্থে যুক্ত এক বা একাধিক ক্রেতা,

৪। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে বা প্রচলিত অন্য কোন আইন অনুসারে স্বেচ্ছা ক্রেতা সংঘ।

◆ **অভিযোগ (Complaint) [ধারা 2(c)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(c) ধারা অনুসারে অভিযোগকারী যখন লিখিত নালিশের মাধ্যমে বিক্রেতাকে নিম্নলিখিত কারণে অভিযুক্ত করেন তখন তাকে অভিযোগ বলে—

১। ব্যবসায়ীটির ব্যবসা অন্যায্য বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যবসা।

২। যে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে বা ক্রয় করতে সম্মত পণ্যের এক বা একাধিক ত্রুটি আছে।

৩। ভাড়া নেওয়া সেবা বা পরিষেবা, ভাড়া নিতে বা পেতে সম্মত সেবাতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি আছে।

৪। কোন প্রচলিত আইন অনুসারে নির্ধারিত পণ্যের মূল্য বা পণ্যের ওপর প্রকাশিত মূল্য বা পণ্যের মোড়কের ওপর মুদ্রিত মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্য আদায় করা হয়েছে।

৫। কোন প্রচলিত আইন অমান্য করে জীবনের বা নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক কোন পণ্য জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়েছে বা বিক্রিয় প্রস্তাব করা হয়েছে।

◆ ক্রেতা বা ভোক্তা (Consumer([ধারা 2(d)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের (d) ধারা অনুসারে ক্রেতা বা ভোক্তা বলতে বোঝায়—যে ব্যক্তি প্রতিদান (অর্থ) -এর বিনিময়ে কোন পণ্য ক্রয় করেন বা যে ব্যক্তি ক্রেতার অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ ক্রেতার অনুমতিতে পণ্যটি ব্যবহার করেন। এখানে প্রতিদান বিভিন্ন হতে পারে—

(ক) প্রদত্ত
(খ) প্রতিশ্রুতি
(গ) নগদ
(ঘ) বিলম্বিত
(ঙ) আংশিক নগদ ও আংশিক প্রতিশ্রুত

যে ব্যক্তি পুনর্বিক্রয়ের জন্য বা অন্য কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জন্য পণ্য ক্রয় করেন তাঁকে ক্রেতা বলা যাবে না।

◆ ক্রেতা বিরোধ (Consumer Dispute) [ধারা 2(e)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ র 2(e) ধারা অনুসারে কোন পণ্যের দোষ ত্রুটি আছে এমন অভিযোগ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অস্বীকার করেন বা বিরোধিতা করেন তখন তাকে ক্রেতা বিরোধ বলে।

◆ ত্রুটি (Defect) [ধারা 2(f)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(f) ধারা অনুসারে ত্রুটি হল, পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, ক্ষমতা, শুদ্ধতা বা উৎকর্ষতার কোন খুঁত, অসম্পূর্ণতা বা দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি।

◆ অসম্পূর্ণতা Defficiency) [ধারা 2(g)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(g) ধারায় কোন চুক্তি বা আইন অনুসারে দায়বদ্ধ ব্যক্তি কোন পরিষেবা দান গুণগত, প্রকৃতিগত বা ব্যবহারগত অপূর্ণতা বা ঘাটতি হলে অথব মান বজায় রাখতে অসমর্থ হলে তাকে অসম্পূর্ণতা বা ঘাটতি বলে।

◆ **পণ্য (Goods) [ধারা 2(i)] ঃ**

১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইনে পণ্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকেই ক্রেতাসুরক্ষা আইনের 2(i) ধারায়পণ্য হিসাবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সব রকম অস্থাবর সম্পত্তি যেমন—মজুত সম্ভার (Stock), শেয়ার এবং জমিতে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন শস্য, তৃণ যা বিক্রিয় আগে জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, সবই হল পণ্য। এছাড়াও ট্রেড মার্ক, গ্রন্থস্বত্ব, সুনাম, জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ শক্তিও পণ্য হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু মোকদ্দমাযোগ্য দাবি এবং অর্থ (টাকা-পয়সা) পণ্য নয়। জমি যেহেতু স্থাবর (immovable) সম্পত্তি সুতরাং একে পণ্য বলা না গেলেও জমিতে উৎপন্ন ফসল সামগ্রী বিক্রিয় আগে জমি থেকে পৃথক করা হয় বলে ঐ ফসলগুলি পণ্য হিসাবে গণ্য হবে। এই পণ্য আবার তিন ধরনের হতে পারে —

ক) বিদ্যমান পণ্য (Existing Goods)
খ) ভবিষ্যৎ পণ্য (Future Goods)
গ) ঘটনাসাপেক্ষ পণ্য (Contingent Goods)

◆ **উৎপাদক (Manufacturer) [ধারা 2(j)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(j) ধারা অনুসারে উৎপাদক বলতে বোঝায় —

১। কোনো পণ্য বা তার অংশবিশেষ উৎপাদনকারী,

২। অন্যের দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন অংশের সংযোজন করে একটি সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনকারী,

৩। অন্যের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের ওপর নিজের ট্রেড মার্ক উল্লেখ করে নিজেকে পণ্যটির উৎপাদক বলে পরিচয় প্রদানকারী।

◆ **ব্যক্তি (Person) [ধারা 2(m)] ঃ**

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(m) ধারা অনুসারে ব্যক্তি হল —

ক) নিবন্ধীকৃত বা অনিবন্ধীকৃত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান,

খ) অবিভক্ত হিন্দু পরিবার,

গ) সমবায় সমিতি,

ঘ) ১৮৬০ সালের সমিতি নিবন্ধন আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত বা অনিবন্ধীকৃত ব্যক্তিসমষ্টির সংঘ।

◆ সেবা (Service) [ধারা 2(O)] ঃ

সেবার অর্থ হল ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, অথবা অন্য শক্তি সরবরাহ, বাসস্থান নির্মাণ, আমোদ-প্রমোদ, চিত্তবিনোদন অথবা সংবাদ সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত সেবা। কিন্তু বিনামূল্যে কাজ বা চুক্তি অনুযায়ী নিজস্ব চাকুরি এই সেবার অন্তর্ভুক্ত নয়।

◆ ব্যবসায়ী (Trader) [ধারা 2(q)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(q) ধারা অনুসারে যে ব্যক্তি পণ্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয়ের জন্য বিতরণ করেন এবং যিনি পণ্যের উৎপাদক তাকে এবং যখন পণ্য মোড়কে বাঁধাই করে বিক্রয় করা হয় বা বিক্রয়ের জন্য পরিবেশন বা বিতরণ করা হয় তখন ঐ মোড়ক বাঁধাইকারীকে ব্যবসায়ী বলা হয়।

◆ অন্যায় বা অন্যায্য ব্যবসায়িক কাজ (Unfair trade practice) [ধারা 2(r)] ঃ

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 2(r) ধারা অনুসারে কোনো পণ্যের বা সেবার বিক্রি, ব্যবহার, বা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য যে অন্যায্য পদ্ধতি বা প্রতরণামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকে অন্যায্য ব্যবসায়িক কাজ বলে। এটি লিখিত, মৌখিক বা আচরণের মাধ্যমে হতে পারে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্যায্য ব্যবসায়িক কাজ হিসাবে গণ্য করা হবে —

১। যখন পণ্যের মান, গুণ, পরিমাণ, গঠন বা আকৃতি সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হয়।

২। সেবার মান, গুণ সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হয়।

৩। পুনর্নির্মিত, পুনরায় সংস্কার করা পণ্যকে নতুন পণ্য হিসাবে মিথ্যা বর্ণনা করা।

৪। পণ্য বা সেবার মূল্য সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রতারণা করা।

৫। পণ্যের বা সেবার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা করা।

৬। পণ্যের জীবনকাল বা কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে মিথ্যা বর্ণনা করা।

৭। অন্য কোন ব্যক্তির পণ্য, সেবা বা ব্যবসায় সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিজের পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা বা প্রতারণামূলক তথ্য প্রদান করা।

৮। কোন খবরের কাগজে বা অন্য কোনভাবে পণ্য বা সেবা সুবিধাজনক মূল্যে বিক্রি করা হবে বলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের অনুমতি দেওয়া।

৯। পণ্য বিক্রেতা বা সরবরাহকারীর পণ্য বিক্রিয় অনুমোদন না থাকলেও অনুমোদন আছে বলে দাবি করা।

১০। পণ্য উন্নতমানের না হলেও তা বিক্রি বা সরবরাহের অনুমতি দেওয়া।

১১। দান ও পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও তা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে বা বিনা পয়সায় কিছু দেওয়ার ধারণা সৃষ্টি করলে কিন্তু এইজন্য সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে টাকা চাওয়া হচ্ছে বা ব্যবসার স্বার্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উন্নতির বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লটারী, ভাগ্য পরীক্ষার

বা দক্ষতার খেলা পরিচালনার অনুমতি দেওয়া।

◆ **অভিযোগ দায়ের করার সময়সীমা [ধারা 24] ঃ**

অভিযোগকারীকে কার্যকারণ উদ্ভবের (Cause of action) দু'বছরের মধ্যে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। যদি কোন কারণে তা করা সম্ভব না হয়, বিলম্বের কারণগুলি দেখাতে হবে। আদালতের কাছে কারণগুলি সন্তোষজনক মনে হলে, অভিযোগ গৃহীত হবে।

◆ **আপীল দায়ের করার সময়সীমা [ধারা 15] ঃ**

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের আদেশ থেকে রাজ্য কমিশনে, রাজ্য কমিশনের আদেশ থেকে জাতীয় কমিশনে, এবং জাতীয় কমিশনের আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করতে হবে। এই আপীল আদালতের আদেশ দানের ৩০ দিনের মধ্যে করতে হবে। যদি কোন তা করা সম্ভব না হয় তাহলে বিলম্বের কারণ দেখাতে হবে এবং আদালত সন্তুষ্ট হলে, আপীল গৃহীত হবে।

২.৩ ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য

ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বা পণ্য সামগ্রী অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেন। অনেক সময় দেখা যায় বিক্রেতারা যেভাবে তাদের পণ্য সামগ্রীকে ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপিত করেন প্রকৃতপক্ষে ঐ পণ্যসামগ্রী সেই গুণমানের হয় না। ফলে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ বিক্রেতাদের দেওয়া বিবরণের উপর ভিত্তি করেই আমরা পণ্যসামগ্রী ক্রয় করি। তাই অর্থ দিয়ে সঠিক পণ্য না পাওয়া গেলে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাই এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ও বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯৮৬ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল —

১। ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা,

২। ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ মীমাংসা জন্য ক্রেতাপরিষদ (Consumer Council) গঠন করা,

৩। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা স্তরে ক্রেতা আদালত স্থাপন করা।

২.৪ কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

২.৪.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 4 নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞাপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (Central Consumer Protection Council) গঠন করে। একে কেন্দ্রীয় পরিষদও বলা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা-স্বার্থ-সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি হবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি প্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য হবেন।

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 5(1) ধারা অনুসারে যখন যেরকম প্রয়োজন হবে তখন কেন্দ্রী পরিষদ সভা ডাকবেন। কিন্তু বছরে অন্তত একবার সভা ডাকতেই হবে।

এই আইনের 5(2) ধারা অনুসারে কোথায় ও কবে সভা হবে তা নির্ধারণ করবেন পরিষদের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশমত তিনি কার্যপরিচালনা করবেন।

২.৪.২ কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্য

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 6 নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্দেশ্যগুলি হল —

১। জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে বিপজ্জনক কোন পণয বা সেবা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা করা [ধারা 6(a)],

২। ক্রেতাকে অনায্য ব্যবসায়িক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পণ্যের বা সেবার গুণগত মান, কার্যক্ষমতা শুদ্ধতা এবং মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ক্রেতার জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা [ধারা 6(b)],

৩। প্রতিযোগিতামূলক দামে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অধিকার দেওয়া [ধারা 6(c)],

৪। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং ক্রেতাদের অভিযোগকে মর্যাদা দেওয়া হবে—এই ব্যাপারে ক্রেতাদের সুনিশ্চিত করা [ধারা 6(d)],

৫। অসাধু ব্যবসায়িক কাজ, একচেটিয়া বাণিজ্য বা অর্তনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার অধিকার [ধারা 6(e)],

৬। ক্রেতাদের পণ্য ও সেবা বিষয়ে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার [ধারা 6(f)],

২.৫ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ

২.৫.১ গঠন ও কার্যপ্রণালী

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 7(1) নং ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ (State Consumer Protection Council) গঠন করতে পারে। ধারা 7(2) অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে রাজ্যপরিষদ গঠিত হয়।

- রাজ্যসরকারের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী হবেন পরিষদের সভাপতি এবং,
- রাজ্যসরকারের অনুমোদিত সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা ক্রেতাদের স্বার্থ দেখে তাদের থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি হবেন এই পরিষদের সদস্য

ধারা 7(3) অনুসারে যখন প্রয়োজন হবে তখন রাজ্য পরিষদ সভা ডাকবেন কিন্তু বছরে কম পক্ষে দুটি সভা ডাকতেই হবে।

ধারা 7(4) অনুসারে রাজ্য পরিষদের সভাপতি ঠিক করবেন, কবে ও কোথায় সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং তিনি রাজ্যসরকারের নির্দেশমত কার্য পরিচালনা করবেন।

২.৫.২ রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের ৪ ধারায় রাজ্য পরিষদের উদ্দেশ্য বলতে এই আইনের 6(a) থেকে a) —— পর্যন্ত বিষয়গুলিকে [২.৪.২ দেখুন] বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পরিষদ ও রাজ পরিষদের উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ ঐ ধারা অনুযায়ী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

২.৬ জেলা বিচারালয়

২.৬.১ জেলা বিচারালয় বা জেলা সুরক্ষা আদালতের (District Forum) গঠন

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 10 নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত ভাবে তিনজনকে নিয়ে জেলা বিচারালয় গঠিত হয়।

ক) প্রতিটি জেলা বিচারালয়ে একজন সভাপতি থাকবেন তিনি জেলা বিচারক বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক বা জেলা বিচারক হওয়ার যোগ্য এমন ব্যক্তি হবেন এবং

খ) অর্থনীতি, আইন, বাণিজ্য, হিসাবশাস্ত্র, শিল্প ও জন প্রশাসন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং সৎচরিত্র, নিষ্ঠাবান এমন দুই জন ব্যক্তি (যাদের একজন অবশ্যই মহিলা হবেন)।

নির্বাচন সমিতির সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার জেলা বিচারালয়ের ঐ তিন জন সদস্যকে নিয়োগ করেন। এই আইনের 10(1) ধারা অনুসারে নির্বাচন সমিতির সদস্যরা হলেন (১) রাজ্য কমিশনের সভাপতি, তিনিই নির্বাচন সমিতির সভাপতি হবেন, (২) রাজ্য আইন বিভাগের সচিব—সমিতির সদস্য হবেন, এবং (৩) ক্রেতা বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব—সমিতির সদস্য হবেন। অর্থাৎ নির্বাচন সমিতির সদস্যসংখ্যা হল তিন।

জেলা বিচারালয়ের প্রত্যেক সদস্য পাঁচ বছর বা 65 বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ পাঁচ বছর ও 65 বছর যেটি আগে হবে সেই দিনই তাদের কার্যকাল শেষ হবে। সদস্যরা কখনোই পুনর্নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না। কোন সদস্য পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি রাজ্যসরকারের কাছে তার ইস্তফা পত্র পাঠাতে পারেন এবং তা রাজ্যসরকার গ্রহণ করলে পদটি শূন্য বলে গণ্য করা হবে এবং আগের মতোই অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করা হবে [ধারা 10 (2)]।

জেলা বিচারালয়ের সদস্যদের বেতন, সাম্মানিত বা অন্যান্য ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তসমূহ রাজ্যসরকারই ঠিক করবেন [ধারা 10 (3)]।

২.৬.২ জেলা বিচারালয়ের অধিকার বা এক্তিয়ার

জেলা বিচারালয়ের অধিকার বা এক্তিয়ারগুলি হল —

১। পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যদি কোন পণ্যের বা সেবার মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের দাবি থাকে তবে জেলা বিচারালয় ঐ সম্পর্কে অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে পারবে [ধারা 11 (1)]।

২। বিপক্ষ দল বা বিপক্ষ দলগুলি অভিযোগ দায়ের করার সময় লাভের জন্য সেই এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্বেচ্ছায় বসবাস করেন বা ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত থাকেন বা শাখা অফিস রাখেন

তবে সেখানকার জেলা বিচারালয়ে অভিযোগ জানানো যাবে [ধারা 11 (2)(a)]।

৩। অভিযোগকারীর কোন একপক্ষ যদি জেলা বিচারালয়ের সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে বসবাস না করেন বা ব্যবসায় কার্য না করেন বা কোন শাখা অফিস না খোলেন অথবা লাভের জন্য কোন কাজ না করে থাকেন তবে জেলা বিচারালয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে বা বিপক্ষের অনুমোদন নিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করা যাবে [ধারা 11 (2)(b)]।

৪। যেখানে কারণটি (cause of action) সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঘটেছে সেখানকার জেলা বিচারালয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করা যাবে [ধারা 11 (2)(c)]।

২.৬.৩ অভিযোগ দায়ের করার পদ্ধতি

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 12 নং ধারায় জেলা বিচারালয়ে একজন ক্রেতা / উপভোক্তা কীভাবে অভিযোগ জানাবেন তা বলা আছে, যেমন,

ক) কোন পণ্য বিক্রয় বা বিক্রয় করার চুক্তি হলে এবং /বা

খ) কোন পরিষেবা প্রদত্ত বা প্রদান করার চুক্তি হলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জেলা বিচারালয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন—

- ক্রেতা বা ভোক্তা যাকে পণ্য বা সেবা প্রদত্ত হয়েছে বা প্রদান করার সম্মতি দেওয়া হয়েছে,
- ক্রেতা বা ভোক্তার পক্ষে কোন স্বীকৃত ক্রেতা সংঘ, সংশ্লিষ্ট ক্রেতা ঐ সংঘ বা সংগঠনের সদস্য না হলেও চলবে,
- সমস্বার্থযুক্ত একাধিক ক্রেতা জেলা বিচারালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এক বা একাধিক ক্রেতা সকলের পক্ষে অভিযোগ জানাতে পারেন,
- কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার,

২.৭ দণ্ড

ক্রেতা সুরক্ষা আইনের 27 নং ধারায় শাস্তি বা দণ্ডের (Penalties) বিধান দেওয়া হয়েছে। যখন কোন ব্যবসায়ী বা কোন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তিনি বা অভিযোগকারী জেলা বিচারালয় বা রাজ্য কমিশন বা জাতীয় কমিশনের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন তখন ঐ আদেশ খেলাপকারী ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি বা অভিযোগকারীকে এক মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা / এবং দুই হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা অর্থদণ্ড বিচারালয় দিতে পারেন। অর্থাৎ কারাদণ্ড কখনোই ১ মাসের কম হবে না এবং অর্থ দণ্ড কখনোই দুই হাজার টাকার কম হবে না। তবে জেলা বিচারালয় রাজ্য বা জাতীয় কমিশন বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের পরিমাণ কমাতে পারেন।

২.৮ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার রায়

১। ছাত্ররা শিক্ষা নেওয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফী দেয়। এক্ষেত্রে ছাত্ররা অর্থ দিয়ে পরিষেবা গ্রহণ করে। এটি হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা বা অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদের দেওয়া হয়। তাই শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের ত্রুটির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী অভিযোগ জানানো যাবে, কারণ শিক্ষাদান একটি পরিষেবা [১৯৯৪ সি-পি-আর-১৮২ হিমাচল প্রদেশ; ১৯৯৩ সি-পি-আর-১৮২ হরিয়ানা]।

২। বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ব্যক্তিগত হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসা অথবা বেসরকারি চিকিৎসক বা বেসরকারি শল্য চিকিৎসকের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা এই আইনে পরিষেবা বলে গণ্য হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ চিকিৎসায় ত্রুটি থাকার জন্য অভিযোগ জানাতে পারেন [(১৯৯২) (১) সি-পি-জে-৩০২ (জাতীয় কমিশন)]।

৩। লিখিত নোটিশ ছাড়াও একজন গ্রাহকের টেলিফোন সংযোগ টেলিফোন কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্ন করতে পারে। জাতীয় কমিশনের মতে ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিধির 443 নং বিধিতে টেলিফোন বিল বাকি থাকলে কর্তৃপক্ষকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন লিখিত নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। [জে.এম. রথী বনাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার (টেলিগ্রাফ), (১৯৯২) ২ সি. পি. জে ৫৬৪ হরিয়ানা]।

৪। কুরিয়ার বা সংবাদবহক পণ্য বা কোন দ্রব্যসামগ্রী সঠিক স্থানে সঠিকভাবে পৌঁছে না দিলে ক্রেতা তার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। কারণ ক্রেতা বা প্রেরক এক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়ে পরিষেবা ক্রয় করেছেন [(১৯৯৬) ২ সি. পি. জে-২৫ (সুপ্রিম কোর্ট)]।

৫। জল ও অন্যান্য সুবিধার জন্য পৌরসভাকে কর বা শুল্ক দেওয়া হলে শুল্কদাতা ঐ সব পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী। সুতরাং শুল্কদাতাকে এই আইন অনুসারে একজন ক্রেতা হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ঐ পরিষেবাতে কোন ঘাটতি হলে তিনি অভিযোগ জানাতে পারবেন [(১৯৯৩) ১ সি. পি. আর ১৫২ (পঞ্জাব), (১৯৯৩) ২ সি.পি.আর ৪৭৪ (পশ্চিমবঙ্গ)]।

৬। ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের আদেশ 27 নং ধারা অনুসারে প্রথমে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে হাজির করার জন্য সমন পাঠানো হলে অপরপক্ষ সমনে যদি হাজির না হয় তবে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাতে হবে। এতেও যদি ঐ ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয় তবে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আদালতে পাঠাতে বাধ্য হবেন এবং সেই সঙ্গে জামিনদারকেও নোটিশ দেবেন। [(১৯৯২) সি. পি. জে ৩৬৮ (দিল্লি)]।

২.৯ সারাংশ

এই এককটিতে আমরা ক্রেতা সুরক্ষা আইনটি পড়লাম। এই আইন অনুসারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ক্রেতা কে, অবিযোগকারী কে, পণ্য কী, ব্যক্তি কে, বিরোধ কী ইত্যাদি বিষয়গুলি আপনি জেনেছেন। এছাড়া আপনি ক্রেতা হিসাবে কীভাবে ও কোথায় অভিযোগ জানাবেন তাও এখানে জেনেছেন।

২.১০ অনুশীলনী

◆ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ক্রেতা বলতে আপনি কী বোঝেন?

২। ক্রেতা বিরোধ কী?

৩। অভিযোগ কাকে বলে?

৪। ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা বলতে আপনি কী বোঝেন?

৫। অন্যায্য ব্যবসায়িক কাজ কী?

◆ রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের উদ্দেশ্যগুলি কী?

২। কেন্দ্রীয় পরিষদের গঠন ও উদ্দেশ্য লিখুন।

৩। জেলা বিচারালয় কীভাবে গঠিত হয়।

৪। জেলা বিচারালয়ের এক্তিয়ার সম্পর্কে লিখুন।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬।

২। বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন — সেন ও মিত্র।

একক ৩ (ক) ☐ অংশীদারী আইন, ১৯৩২—সংজ্ঞা, অংশীদারের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব

গঠন

৩(ক).০ উদ্দেশ্য
৩(ক).১ প্রস্তাবনা
৩(ক).২ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ
৩(ক).৩ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন
৩(ক).৪ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য
৩(ক).৫. অংশীদারদের সম্পর্ক
৩(ক).৫.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক
৩(ক).৫.২ তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক
৩(ক).৫.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি
৩(ক).৫.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান
৩(ক).৫.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা
৩(ক).৫.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়
৩(ক).৫.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়
৩(ক).৬ সারাংশ
৩(ক).৭ অনুশীলনী
৩(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩ (ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন—

- অংশীদারী কারবার কী এবং কত প্রকারের?
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের ভূমিকা?
- অংশীদারী কী কী দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা উচিত?
- অংশীদারদের নিজেদের মধ্যে এবং তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক।

৩ (ক).১ প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ব্যবসায়ে একাধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে ব্যবসায় সংগঠন করতে পারেন। যে সকল ব্যবসায়ে অংশীদারগণ কোন সম্মতি দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় সংগঠন করেন, সেই সকল ব্যবসায়ের জন্য ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারী আইন প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ আইনের সংবিধান বলে সমস্ত অংশীদারী কারবার প্রবর্তিত হয় এবং পরিচালিত হয়। এই আইনটি অবশ্য যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৩ (ক).২ অংশীদারী কারবার এবং কারবারের প্রকারভেদ

অংশীদারী কারবার হলো এমন একটা কারবার, যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং, অংশীদারী কারবার সকল অংশীদার দ্বারা বা সকলের পক্ষ থেকে যেকোন একজন দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে। ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে এটি গঠিত হয়। ভারতীয় অংশীদারী আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী অংশীদারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ **সকল ব্যক্তির দ্বারা বা সকলের পক্ষ থেকে যেকোন একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের লাভ বা মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ বা বণ্টন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে তাকে অংশীদারী কারবার বলে।**

যে সকল ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে এইরকম সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে তাদের প্রত্যেককে 'অংশীদার' এবং তাদেরকে একসঙ্গে 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বলে। সুতরাং সহজেই অনুমান করতে পারছেন যে, এইরকম অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে :

১। প্রতিনিধিত্বের সম্পর্ক, ২। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি,

৩। চলমান ব্যবসায়, ৪। লাভ অর্জনের উদ্দেশ্য।

অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ ঃ

নির্দিষ্ট অংশীদারী (Particular Partnership) [৮ ধারা]

কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অংশীদারী গঠন করা হয় তাকে নির্দিষ্ট অংশীদারী বলা হয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাজটি শেষ হওয়ার পরে সাধারণত অংশীদারীর বিলুপ্তি ঘটে।

ঐচ্ছিক অংশীদারী (Partnership at will) [৭ ধারা]

যে অংশীদারী কারবার কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠন করা হয় না এবং দীর্ঘকাল ব্যবসায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কারবার গঠিত হয় এবং যার বিলুপ্তির কোন আগাম পরিকল্পনা থাকে না তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারী বলে।

সীমাবদ্ধ অংশীদারী (Limited Partnership) ঃ

যে অংশীদারী কারবারে একজন বাদে বাকি সকল অংশীদার সীমাবদ্ধ দায় বহন করেন সেই অংশীদারকে সীমাবদ্ধ অংশীদারী কারবার বলে। তবে সেইসঙ্গে একজন অংশীদারকে অসীম দায় (Unlimited Liability) বহন করতে হয়। কিন্তু ভারতে এইরকম অংশীদারীর কোন স্থান নেই। এখানে সকল অংশীদারকে অসীম দায় বহন করতে হয়।

৩ (ক).৩ অংশীদারী কারবারের নিবন্ধন

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ১০ জনের অনধিক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে ২০ জনের অনধিক) মুনাফা বা লাভ অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, চূড়ান্ত বিশ্বাসই অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি। অংশীদারী চুক্তি লিখিত

বা মৌখিক হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কোন বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য এবং সেই সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে অংশীদারী চুক্তিপত্র (Partnership Deed) লিখিত হওয়াই কাম্য। অংশীদারী চুক্তিপত্রে লাভ লোকসান বণ্টনের অনুপাত, অংশীদারদের কর্তব্য ও অধিকার, পুঁজির পরিমাণ, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, বিবাদের মীমাংসা পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়, যার ফলে ভবিষ্যতের যে কোন বিরোধের সহজেই নিষ্পত্তি করা যায়।

নিবন্ধ (Registration) ঃ অংশীদারী কারবারে নিবন্ধন বাধ্য বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নিবন্ধন করা যায়, নাও করা যায়। অংশীদাররা ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিবন্ধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে নির্দিষ্ট ফী (Fee) সহ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধক (Registrar of Firms) এর নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হয়।

আবেদন পত্রে কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন (১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (২) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রধান বা মুখ্য কার্যস্থল; (৩) অন্যকোন জায়গায় কারবার চললে তার নাম এবং ঠিকানা; (৪) প্রত্যেক অংশীদারদের পূর্ণ নাম এবং ঠিকানা; (৫) প্রত্যেক অংশীদারদের পুঁজির পরিমাণ এবং কারবারে যোগদানের তারিখ; (৬) প্রতিষ্ঠানের সময় ও মেয়াদ [৫৮ ধারা]।

এই চুক্তিপত্রে অংশীদারগণ সকলে বা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করবে। এবং এই সম্পর্কে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে এবং নির্ধারিত ফী পেলে ফার্মের নিবন্ধক (Registrar of Firms) নিবন্ধন বইতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও বিবরণ লিখবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হলো বলে বিবেচিত হবে।

পরবর্তীকালে প্রদত্ত বিবরণীতে কোন পরিবর্তন হলে তা নিবন্ধককে জানাতে হয় এবং সেই অনুযায়ী তিনি নিবন্ধন বইতে লিখে নেন।

নিবন্ধন না করার পরিণাম **(Consequences of non-registration) ঃ** অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কিছু অসুবিধা ভোগ করতে পারে [৬৯ ধারা]।

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বা অপর কোন অংশীদারের বিরুদ্ধে চুক্তিজাত বা অংশীদারী আইন দ্বারা কোন অধিকার দাবি করার জন্য আদালতের কাছে মামলা করতে পারবেন না।

(খ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে সেই প্রতিষ্ঠান চুক্তিজাত অধিকার দাবির জন্য আদালতে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না।

(গ) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে কোন মামলায় ঐ প্রতিষ্ঠান পাল্টা পাওনা (Set off) দাবি করতে পারবেন না। অর্থাৎ মামলায় বাদীপক্ষের থেকে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমানোর জন্য যে দাবি থাকে তাকে পাল্টা পাওনা বলে।

উপরে বর্ণিত ৬৯ ধারার কিছু ব্যতিক্রম আছে **[Exceptions to the Above Rules]**

(১) অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের জন্য এবং বিলুপ্ত ফার্মের হিসাবের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করে থাকতে পারেন।

(২) বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ উদ্ধারের জন্য কোন অংশীদার মামলা দায়ের করতে পারবেন।

(৩) কোন অংশীদার যদি বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেন তবে অন্যান্য অংশীদার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।

(৪) সরকারি স্বত্বনিয়োগী (Official Assignee) [বা দেউলিয়া সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী] এবং আদলত কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী (Receiver) অনিবন্ধিত অংশদারী প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

(৫) ছোট আদালতের অধীন অঞ্চলে অনিবন্ধিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১০০ টাকা পর্যন্ত দাবির জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন।

৩ (ক).৪ অংশীদারের অধিকার ও কর্তব্য

অংশীদারী চুক্তি ও আইনের ভিত্তিতে অংশীদারদের অধিকার নির্ধারিত হয়। অংশীদারী চুক্তিতে কোন বিপরীত শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ এইসকল অধিকার ভোগ করেন।

(১) **কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ ঃ**

অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক অংশীদারের কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। [১২ (ক) ধারা]।

(২) **নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার ঃ**

কারবার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রত্যেক অংশীদার নিজের মত প্রকাশ করতে পারবেন। এবং সকলে একমত হলে সেই সিদ্ধান্ত বলবং থাকবে। [১২ (গ) ধারা]।

(৩) **হিসাবপত্র দেখা, পরীক্ষা এবং নকল পাওয়ার অধিকার ঃ**

প্রত্যেক অংশীদার কারবারের খাতাপত্র দেখাতে পরীক্ষা করতে এবং তাঁর প্রয়োজনে নকল করার বা কোন প্রতিলিপি (copy) নেওয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করেন। [১২ (ঘ) ধারা]।

(৪) **সমান হারে লাভের বণ্টন ঃ**

কারবারের অংশীদারগণের সমান হারে লাভ বণ্টনের অধিকার আছে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে কোন লাভ বণ্টনের ভাগ অব অনুপাতের উল্লেখ থাকে তবে সেই অনুপাতেই ভাগ করা হবে। [১৩ (খ) ধারা]।

(৫) মূলধনের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ

কারবারের অংশীদারগণ যে হারে কারবারে মূলধন সরবরাহ করবেন তার জন্য তাঁরা মূলধনের উপরে সুদ পেতে পারেন। তবে সেই সুদের টাকা কেবলমাত্র লাভ থেকেই দিতে হবে। [১৩ (গ) ধারা]।

(৬) মূলধনের অতিরিক্ত অর্থের উপর সুদ পাওয়ার অধিকার ঃ

কারবারের অংশীদারগণ কারবার গভনের সময় যে অর্থ দিয়ে থাকেন প্রয়োজনে তার বেশি অর্থ কারবারকে দিতে পারেন দাদন বা Advance হিসাবে। যদি কারবারের প্রয়োজনের বেশি অর্থ দিয়ে থাকেন তবে ঐ অতিরিক্ত অর্থের জন্য বার্ষিক ৬% সুদ পাবেন। [১৩ (ঘ) ধারা]।

(৭) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে, কারবার পরিচালনার সময়ে বা আকস্মিক কোন বিপদের সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন অর্থ প্রদান করে বা কোন দায় মেটানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকে তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ভোগ করেন। [১৩ (ঙ) ধারা]।

(৮) সম্পত্তি ব্যবহার করার অধিকার ঃ

কারবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র কারবারের প্রয়োজনে রাখা ও ব্যবহার করা হয়। অংশীদারগণ তাঁদের নিজস্ব কাজে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৯) অংশীদারের ব্যক্তি অধিকার ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারগণ চুক্তিপত্র অনুসারে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার অধিকার পেয়ে থাকেন। [১৮ ধারা]।

(১০) অংশীদারদের অব্যক্ত বা ধারণামূলক অধিকার ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যে ধরনের কারবার লিপ্ত সেই ধরনের কারবারের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে কোন কাজ করলে প্রতিষ্ঠান ঐ কাজের জন্য আবদ্ধ হবেন। ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে অংশীদারের কাজ করার অধিকার বলবৎ হয়। [১৯ ধারা]।

(১১) জরুরি অবস্থায় প্রতিষ্ঠান রক্ষা ঃ

জরুরি অবস্থার সময় কারবারের স্বার্থরক্ষার জন্য সাধারণ বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার অংশীদারগণ ভোগ করে থাকেন। [২১ ধারা]।

(১২) নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার ঃ

অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের সম্পত্তির ভিত্তিতে অংশীদারী কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক অংশীদারের আছে। [৩১ ধারা]।

(১৩) **অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার ঃ**

অংশীদারী কারবার থেকে প্রত্যেক অংশীদারের অবসর গ্রহণের অধিকার আছে। [৩২ ধারা]।

(১৪) **কারবারের বিলোপসাধরেন পর অধিকার ঃ**

কারবারের বিলোপসাধন হলে অংশীদারগণ কিছু অধিকার পায়। যেমন : হিসাব গুটিয়ে ফেলার অধিকার, বাকি সম্পত্তির অধিকার, বিলোপসাধনের পরে মুনাফা অর্জনের অধিকার, সেলামী ফেরতের অধিকার।

অংশীদারী কারবারের অংশীদারগণ বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য পালন করেন। অংশীদারী চুক্তিতে বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করেন।

(১) **ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করার কর্তব্য ঃ**

প্রত্যেক অংশীদার নিজেদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবেন এবং একে অপরের কাজের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, সমস্ত সংবাদ পরিবেশন করবেন এবং কারবারের সমস্ত হিসাব দেবেন। [৯ ধারা]।

(২) **ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকা ঃ**

কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কোন অংশীদার কোন প্রতারণামূলক কাজ করেন বা তাঁর কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তিনি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাদ্য থাকবেন। [১০ ধারা]।

(৩) **নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা ঃ**

কারবার পরিচালনার প্রত্যেক অংশীদার তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। [১২ (খ) ধারা]।

(৪) **পারিশ্রমিক দাবি না করা ঃ**

কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য কোন অংশীদার পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। [১০ (ক) ধারা]।

(৫) **লোকসানের সমান ভাগ ঃ**

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যদি ক্ষতি হয় তাহলে অংশীদার সমান ভাগে ক্ষতিপূরণ দেবেন। [১৩ (খ) ধারা]।

(৬) **ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ ঃ**

কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তিনি ঐ ক্ষতি বহন করতে বাধ্য থাকবেন। [১৩ (চ) ধারা]।

(৭) **ব্যক্তিগত মুনাফা ফিরিয়ে দেওয়া ঃ**

কোন অংশীদার যদি কারবারের লেনদেন থেকে বা উহার নাম বা সম্পত্তি ব্যবহার করে যদি কোন মুনাফা অর্জন করেন তবে তিনি তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ মুনাফা প্রতিষ্ঠানকে অর্পণ করবেন। [১৬ (ক) ধারা]।

(৮) প্রতিযোগিতামূলক কারবারের লাভ ফিরিয়ে দেওয়া ঃ

যদি কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ বা প্রতিযোগী কোন কারবার থেকে ব্যক্তিগত গোপন লাভ অর্জন করেন। তবে ঐ অংশীদার তার হিসাব দাখিল করবেন এবং ঐ গোপন লাভ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেবেন। [১৬ (খ) ধারা]।

(৯) কারবারের সম্পত্তির ব্যবহার ঃ

অংশীদারী চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারগণ শুধু ।ফার্মের কাজেই কারবারের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন। [১৫ ধারা]।

(১০) অসীম দায় বহন ঃ

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন কারবারের সকল কাজের জন্য সমস্ত অংশীদারগণ অসীম দায় বহন করবেন। [২৫ ধারা]।

৩ (ক).৫ অংশীদারের সম্পর্ক

৩ (ক)৫.১ অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ১৩ ধারায় অংশীদারগণের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে। তবে, এই সমস্ত আইন সবক্ষেত্রেই সমান ভাবে ব্যবহার করা যায় না। অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে চুক্তির দ্বারা এর পরিবর্তন করতে পারেন। অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য নীচে আলোচনা করা হল :

(ক) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ফার্মের কোন অংশীদার কোন পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। [১৩ (ক) ধারা]।

(খ) ফার্মের সমস্ত অংশীদার লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ সমান অনুপাতে বহন করবেন। [১৩ (খ) ধারা]।

(গ) অংশীদারগণ কারবারে যে মূলধন সরবরাহ করেছেন তার উপরে সুদ পাওয়ার যোগ্য এবং মূলধনের উপর সুদ কেবলমাত্র ফার্মের অর্জিত লাভের উপরেই দিতে হবে। [১৩ (গ) ধারা]।

(ঘ) অংশীদারগণ কারবারে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ দাদন হিসাবে প্রদান করলে সেই অতিরিক্ত অর্থের উপরে বার্ষিক ৬% হারে সুদ পাওয়ার যোগ্য। [১৩ (খ) ধারা]।

(ঙ) কারবার পরিচালনার সময়ে যদি কারবারের কোন বিপদ উপস্থিত হয় এবং কোন অংশীদার যদি কোন ব্যয় করেন বা দায় স্বীকার করেন, তবে ঐ অংশীদার কারবার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(চ) কোন অংশীদারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য যদি কারবারের কোন ক্ষতি হয়, তবে ঐ অংশীদারকে ক্ষতির ভার বহন করতে হবে। অর্থাৎ তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

৩ (ক).৫.২ তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারগণের সম্পর্ক

প্রতিনিধিত্ব ঃ ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন অনুসারে একজন অংশীদার হলেন প্রতিষ্ঠানের এবং অন্যান্য অংশীদারের প্রতিনিধি। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক অংশীদার অপর সকল অংশীদারের প্রধান এবং অপর সকলের প্রতিনিধি। অংশীদারগণ তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনুযায়ী ফার্মের কাছে আবদ্ধ থাকেন। এই কারণের জন্য অংশীদারী আইনকে প্রতিনিধিত্ব আইনের শাখা বলে। ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমে কোন অংশীদার কোন কাজ করলে বা কোন লেনদেন করলে, তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে এবং অন্যান্য অংশীদারকে তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ করবেন। এইভাবে দায়বদ্ধ করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন :

(১) লেনদেনটি ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যেই থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন, যেমন—'ক' ও 'খ' চিনির অংশীদারী ব্যবসায়ী। 'খ' চাল কেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করলেন। এরজন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা 'ক' দায়ী হবেন না। কারণ চিনি ব্যবসায়ের সঙ্গে চালের ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই।

(২) লেনদেনটি ব্যবসায় পরিচালনায় স্বাভাবিক রীতির মধ্যেই হওয়া প্রয়োজন।

(৩) লেনদেনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে হওয়া প্রয়োজন। অথবা অংশীদার এমন ভাবে চুক্তি করবেন যাতে প্রতিষ্ঠানকে শর্তদ্বারা আবদ্ধ করার অভিপ্রায় বোঝা যায়। [১৫ ধারা]।

(৪) লেনদেনটি হওয়ার সময়ে অংশীদার যেন তার ক্ষমতার (দায়িত্ব ও কর্তব্য) মধ্যেই থাকেন।

৩ (ক).৫.৩ অংশীদারের নিকট বিজ্ঞপ্তি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদারকে যদি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়, তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কোন অংশীদার যদি নিজে বা তাঁর সহায়তায় প্রতারণার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিজ্ঞপ্তি জাতি করেন এবং তার যদি উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রতিষ্ঠানকে আবদ্ধ করবে না। [২৪ ধারা]।

৩ (ক).৫.৪ অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান

ব্যবসায়ের সাধারণ কাজকর্ম চলার সময়ে ফার্মের অংশীদার যদি প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কোন স্বীকৃতি অথবা কোন বিবৃতি প্রদান করেন, তবে একে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। [২৩ ধারা]।

৩ (ক).৫.৫ ব্যক্ত বা অনুক্ত ক্ষমতা

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার জন্য অংশীদারের ক্ষমতাকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ব্যক্ত ক্ষমতা এবং অনুক্ত ক্ষমতা। যে ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাকে ব্যক্ত ক্ষমতা বলে। খুব স্বাভাবিক ভাবে ঐ ব্যক্ত ক্ষমতায় বলে ফার্মের অংশীদার কোন কাজ করলে ফার্ম এবং অন্যান্য অংশীদারগণ তৃতীয়পক্ষের নিকট দায়ী থাকেন।

যে ক্ষেত্রে অংশীদারী আইনের দরুন অংশীদারগণের কোন ক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে। ১৩ (ঙ) এবং ২২ ধারা অনুসারে বলা যায়, কারবার যে ব্যবসায় রয়েছে সেই ব্যবসায় অংশীদার স্বাভাবিক ভাবে যে কাজ করে থাকেন প্রতিষ্ঠান তারজন্য দায়বদ্ধ হয়। এইভাবে অংশীদার যে ক্ষমতা লাভ করেন তাকে অনুক্ত ক্ষমতা বলে।

৩ (ক).৫.৬ অংশীদারের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের দায়

ফার্মের কোন অংশীদার সাধারণভাবে ব্যবসা পরিচালনা কালে অন্যায়ভাবে কোন কাজ করলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করলে যারজন্য তৃতীয়পক্ষের কোন ক্ষতি হলে বা দণ্ড হলে তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকেন। [২৬ ধারা]।

যদি কোন অংশীদার ফার্মের সাধারণ ক্ষমতাবলে তৃতীয়পক্ষের থেকে যদি কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং তা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেন, তবে প্রতিষ্ঠান ঐ অর্থ বা সম্পত্তির জন্য দায়ী হবেন। [২৭ ধারা]।

উদাহরণ ঃ (১) একটি অংশীদারী জুতো তৈরির প্রতিষ্ঠানের এক অংশীদার 'ক' নামক ফার্মের থেকে ধারা কিছু চামড়া ক্রয় করেন। এইক্ষেত্রে ঐ ফার্ম চামড়ার দাম মেটাতে বাধ্য থাকবে।

(২) 'ক' নামক একটি অংশীদারী জুতো তৈরির ফার্মের অংশীদার অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের থেকে চিনির বস্তা ক্রয় করেন। অন্যান্য অংশীদারদের যদি কোনরূপ সম্মতি না থাকে তাহলে ঐ চিনির দামের জন্য ফার্ম দায়ী হবে না। কারণ চিনি কেনাটা জুতো তৈরি ফার্মের সঙ্গে জড়িত নয়।

৩ (ক).৫.৭ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারের দায়

ফার্মের প্রত্যেক অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জন্য অন্যান্য অংশীদারগণের সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। সুতরাং, বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য অংশীদারদের দায় সীমাহীন। তৃতীয়পক্ষ, ইচ্ছা করলে তাঁর প্রাপ্য অর্থ যেকোন একজন অংশীদারের থেকে আদায় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য সেই অংশীদার তার দেয় অর্থ বাদে বাকি অংশ আনুপাতিক হারে অন্যান্য অংশীদারদের থেকে আদায় করতে পারেন অথবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হারেও আদায় করতে পারেন।

নিষ্ক্রিয় অংশীদার বা সুপ্ত অংশীদার (যে অংশীদার সরাসরিভাবে কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন না।) বা কার্যকর অংশীদার সকলের পক্ষ থেকেই তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। সুতরাং সুপ্ত অংশীদারও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত রকম কাজের জন্য সমান ভাবে এবং সীমাহীন ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩ (ক). ৬ সারাংশ

এই একক পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারলাম ঃ

- অংশীদারী কারবারের ধারণা;

- অংশীদারী কারবারের প্রকারভেদ;
- অংশীদারী কারবারে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা;
- অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য;
- অংশীদারদের পারস্পরিক সম্পক; এবং
- তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে অংশীদারদের সম্পর্ক।

৩ (ক).৭ অনশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) অংশীদারীর সংজ্ঞা কী?

(২) অংশীদারী কারবার কত প্রকার ও কী কী?

(৩) অংশীদারী চুক্তিপত্র কী?

(৪) ঐচ্ছিতক অংশীদারী বলতে কী বোঝেন?

(খ) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

(১) অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(২) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক? এই নিবন্ধন না হলে তার পরিণাম বর্ণনা করুন।

(৩) অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

(৪) অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(৫) ফার্মের অংশীদারদের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষের সম্পর্ক কিরূপ বর্ণনা করুন।

৩ (ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ - কলকাতা-২০০১

২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৩ (খ) ❑ অংশীদারী আইন, ১৯৩২—পুনর্গঠন ও সমাপ্তি

গঠন

৩ (খ).০ উদ্দেশ্য
৩ (খ).১ প্রস্তাবনা
৩ (খ).২ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন
৩ (খ).৩ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি বা বিলোপসাধন
৩ (খ).৩.১ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির কারণ
৩ (খ).৩.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি
৩ (খ).৪ নাবালক অংশীদারী
৩ (খ).৪.১ অধিকার
৩ (খ).৪.২ দায়
৩ (খ).৫ সারাংশ
৩ (খ).৬ অনুশীলনী
৩ (খ).৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩ (খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন—

- অংশীদারী কারবার পুনর্গঠনের সম্ভাবনা;
- অংশীদারী কারবারের সমাপ্তির কারণ;
- অংশীদারী কারবার সমাপ্তির পরে কীভাবে হিসাবের শেষ হয়;
- নাবালক অংশীদারের কারবারে স্থান এবং তার দায় ও কর্তব্য।

৩ (খ).১ প্রস্তাবনা

অংশীদারী কারবার কিছুদিন বা দীর্ঘদিন চালানোর পরে পুনর্গঠিত হতে পারে। অংশীদারগণ কারবারের স্বার্থে ফার্মের পুনর্গঠন করতে পারেন। যদি কোন অংশীদার কারবারে যোগদান করে, যদি কোন অংশীদার কারবার ছেড়ে চলে যায়, বা কোন অংশীদারের মৃত্যু হয়, তাহলে কারবার পুনর্গঠন করা হয়। সেক্ষেত্রে সাধারণত কারবারের সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু পুনর্গঠনের ফলে ফার্মের সত্বা ভঙ্গ হয় না।

এছাড়া কিছু নির্দিষ্ট কারণ হেতু ফার্মের বিলোপসাধন করা হয়। সেক্ষেত্রে একজন বা দুজন অংশীদার কারবার বিলোপ করতে পারে না। সকল অংশীদার এক হয়ে নিজেদের মধ্যে সম্মত হলে তবেই কারবারের

বিলোপসাধন করা হয়। এবং বিলোপসাধনের পরে ফার্মের সম্পত্তি ও দায় অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন হয়। বিলোপসাধনের ফলে ব্যবসায়ের সত্বার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

৩ (খ). ২ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন

মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে বজায় রেখে কেবলমাত্র অংশীদারী বিভিন্নভাবে পুনর্গঠিত হতে পারে। কোন নতুন অংশীদার গ্রহণ, কোন অংশীদারের মৃত্যু, অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে। এইক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, ব্যবসায় ঠিক মতো চলবে, শুধুমাত্র অংশীদারদের মধ্যে অধিকার ও দায় পুনর্গঠিত হবে। সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে অংশীদারী কারবারের পুনর্গঠন হতে পারে ঃ

(ক) নতুন অংশীদার গ্রহণ (Introduction of a New Partner) ঃ

অংশীদারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে এবং সকল অংশীদারগণের সম্মতি নিয়ে কারবারে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়। নতুন অংশীদার গ্রহণের সময়ে তাঁর মূলধন এবং লাভের অনুপাত ঠিক করে নিতে হয়। অংশীদারীতে যোগদানের পরে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজের জন্য নতুন অংশীদার দায়বদ্ধ হবেন। কিন্তু যোগদানের আগে কোন কাজের জন্য তিনি দায়ী হবেন না। [৩১ ধারা]।

(খ) অংশীদারের অবসর গ্রহণ (Retirement of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে যে একজন অংশীদার তিনভাবে অবসর গ্রহণ করতে পারেন (১) অন্যান্য অংশীদারের সম্পত্তি নিয়ে, (২) অংশীদারী চুক্তিতে কিছু উল্লেখ থাকলে এবং তা পালন করে, (৩) ইচ্ছাধীন অংশীদারীর ক্ষেত্রে সকল অংশীদারকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা লোক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে (Public Notice)।

কোন অংশীদারের অবসর নেওয়ার আগে প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেন তার জন্য বিদায়ী অংশীদার, অবসর গ্রহণের লোক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে না দেওয়া পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের কাছে দায়ী থাকবেন। বিদায়ী অংশীদার বা পুনর্গঠিত অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের যেকোন অংশীদার এই লোক বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন। তবে লোক বিজ্ঞপ্তি (Public Notice) প্রদান করার পরে বিদায়ী অংশীদারকে কোনমতেই প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, তৃতীয় পক্ষ এবং পুনর্গঠিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের সম্মতি থাকলে, বিদায়ী অংশীদার, অংশীদার থাকাকালীন প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত কাজ করেছিল, তার দায় থেকে ছাড় পাবেন। [৩২ ধারা]।

(গ) অংশীদার বিতাড়ন (Expulsion of Partner) ঃ

অংশীদারগণের অধিকাংশ একমত হলেই কোন অংশীদরকে বিতাড়ন করা যায় না। [৩৩ ধারা] **[Green V. Howell (1910)** কোন অংশীদার বিতাড়ন করতে গেলে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন ঃ

১) অংশীদারী চুক্তিপত্রে বিতাড়নের বিধান এবং তার শর্তাবলীর উল্লেখ থাকলে এবং ঐ শর্ত পূর্ণ হলে;

২) অংশীদারকে বিতাড়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সরল বিশ্বাসে অধিকাংশ অংশীদাব থেকে প্রয়োগ করা হলে;

৩) বিতাড়িত অংশীদারকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি জানালে এবং অভিযোগের উত্তরদানের সুযোগ দেওয়া হলে;

[Carmichael V. Evans (1940)]

অংশীদারী চুক্তিনামায় কোন অংশীদারের বিতাড়ন সম্পর্কে কোন বিধান না থাকলেও সমস্ত অংশীদার একমত হয়ে যেকোন অংশীদারকে বিতাড়ন করতে পারেন। কিন্তু সকলের গৃহীত সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়।

(ঘ) অংশীদারের দেউলিয়া অবস্থা (Insolvency of a Partner) ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালত দ্বারা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই ঘোষণার তারিখ হতে তার অংশীদারীত্বের অবসান হবে। কিন্তু তার জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হবে কিনা তা অংশীদারী চুক্তিপত্রের উপর নির্ভর করবে। যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে এইরূপ শর্ত থাকে যে, একজন অংশীদারের দেউলিয়া হলে অংশীদারী ভঙ্গ হবে না, তাহলে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেই তারিখ থেকে দেউলিয়া অংশীদারের কোন সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। এবং প্রতিষ্ঠানও কোনভাবে ঐ দেউলিয়া অংশীদারীর জন্য দায়বদ্ধ হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার দরুন যদি প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়, তাহলে বিলোপসাধনের পদ্ধতি অনুসারে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রিয় করে এবং পাওনা টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। দোন মিটিয়ে যদি কিছু অতিরিক্ত অর্থ থাকে এবং তাতে দেউলিয়া অংশীদারদের কিছু প্রাপ্য থাকলে সেই অর্ত তার স্বত্বনিয়োগী (Assignee) বা আদালত কর্তৃক সরকারী ব্যবস্থাপকের (Official Receiver) নিকট জমা দিতে হয়। কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কারবারের কোন কাজের জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না। আবার, ঐ অংশীদারের কোন কাজের জন্য কারবারকেও দায়বদ্ধ করা যায় না।

(ঙ) অংশীদারের মৃত্যু (Death of a Partner) ঃ

অংশীদারী চুক্তিপত্রের বিপরীত কোন শর্ত উল্লেখ না থাকলে অংশীদারের মৃত্যু হলে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন হয়। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে যে, অংশীদারের মৃত্যু হলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ হবে না, তাহলে কারবার চলতে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে অংশীদারের মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য মৃত অংশীদারের সম্পত্তি কোনভাবে দায়বদ্ধ হবে না। **[৩৫ ধারা]**।

(চ) অংশীদারের স্বত্ব হস্তান্তর (Transfer of Partner Interest) ঃ

অংশীদারী কারবারের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তিকে কোন একজন অংশীদার তার অংশের আংশিক বা পুরো হস্তান্তর করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে আদালত তৃতীয় পক্ষের নিকট দেনার জন্যও অংশীদার তার স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন। কিন্তু এইরূপ হস্তান্তরের ফলে হস্তান্তরগ্রহীতাকে (Transferee) কারবারটির অংশীদার বলে গণ্য করা হবে না। অংহীদারী কারবারের উপরে তার কয়েকটি সীমাবদ্ধ অধিকার বর্তায় ঃ

১) তিনি শুধুমাত্র হস্তান্তরকারী অংশীদারের অংশ অনুপাতে লাভের ভাগ পাবেন। কিন্তু অন্য অংশীদারের মুনাফার হিসাবে কোন দাবি করতে বা অন্য অংশীদার মুনাফার যে হিসাব দেবেন তাই মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

২) তিনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং কারবারের কোন হিসাবপত্র দেখতে বা চাইতে পারবেন না।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠান যদি ভেঙ্গে যায় এবং হস্তান্তরগ্রহীতা যদি আর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার না থাকেন তবে হস্তান্তরকারীর যে অংশ ছিল তিনিও ঐ অংশের অধিকারী হবেন। পরবর্তী সময়ে তার হিসাব নির্ধারণের জন্য তিনি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অবসানের তারিখ হতে অংশীদারীর সম্পত্তির হিসাব দাবি করার অধিকারী হবেন। [২৯ ধারা]।

যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী তার অংশের আংশিক হস্তান্তর করেন, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরগ্রহীতাকে প্রতিষ্ঠানের উপঅংশীদার বলে (Sub-Partner)। অংশীদারী কারবারে উপঅংশীদারের অধিকার হস্তান্তরগ্রহীতার অধিকারের মতোই হবে।

৩ (খ).৩ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি বা বিলোপসাধন

একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারী সম্পর্কের বিলোপ হওয়াকে প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধন বলে [ধারা ৩৯]। শুধুমাত্র একজন অংশীদার অন্য একজন অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে কারবারের বিলোপসাধন নাও হতে পারে; কারণ অপর অংশীদার কারবার চালিয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কারবার পুনর্গঠন বলে।

৩ (খ).৩.১ প্রতিষ্ঠানে সমাপ্তির কারণ

নিম্নলিখিত যেকোন একটি কারণে অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধন হতে পারে ঃ

(ক) সকল অংশীদার সম্মতিক্রমে বা অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি অনুসারে অংশীদারী কারবারের বিলোসাধন ঘটতে পারে। [৪০ ধারা]।

(খ) যদি সকল অংশীদার অথবা একজন ভিন্ন অন্য সকল অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে অথবা এমন কোন ঘটনার দ্বারা প্রতিষ্ঠান যদি অবৈধ হয়ে যায় তাহলে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হবে।

(গ) **কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটলে *অংশীদারী চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কারবারের বিলোপসাধন হবে* ঃ**

(১) অংশীদারী কারবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করা হলে এবং ঐ সময় অতিবাহিত হলে;

(২) কারবারটি এক বা একাধিক কারবারের জন্য স্থাপিত হলে, ঐ কাজ সম্পাদনের পরে;

(৩) কোন অংশীদারের মৃত্যু হলে;

(৪) কোন অংশীদার দেউলিয়া ঘোষিত হলে;

অবশ্য অংশীদারগণ যদি চুক্তিতে এই শর্ত রাখেন যে, উপরের কোন কারণের জন্য কারবার বিলোপসাধন হবে না, তাহলে চুক্তি বৈধ এবং কার্যকর হবে।

(ঘ) আদালতের নির্দেশে বিলোপসাধন ঃ — কোন অংশীদার আদালতে আবেদন করলে নিম্নের কোন একটি কারণে (Court) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের আদেশ দেন ঃ

১) কোন অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

২) কোন অংশীদার তাঁর কর্তব্য পালনে চিরতরে অক্ষম হলে।

যেমন ঃ দুরারোগ্য কোন ব্যধিতে আক্রান্ত হলে তিনি যদি অক্ষম হয়ে পড়েন। [Whitwill V. Arthur (1865)] মালমায় একজন অংশীদার পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, অংশীদারের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং আদালতের নির্দেশে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩) কোন অংশীদারের অসদাচরণের জন্য যদি ব্যবসায়ের উপর প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়, তবে অন্য কোন অংশীদারের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত অপ্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আদেশ দিতে পারেন। (তবে আদালত এক্ষেত্রে বিচার করবেন তাঁর ব্যবহারের জন্য কারবারে প্রকৃতই ক্ষতি হচ্ছে কিনা)।

উদাহরণ ঃ একটি সলিসিটর প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার বিনা টিকিটে রেল ভ্রম করার জন্য অভিযুক্ত হন। আদালতের রায় অনুসারে ধরা হয়, যেহেতু, প্রবঞ্চনার জন্য সেই অংশীদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং এটা সলিসিটর কারবারের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর হয়। [Carmichael V. Evans (1940)]

৪) আবেদনকারী ছাড়া অন্য কোন অংশীদার দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে কারবার পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গ করলে অথবা এইরকম আচরণ করলে যার দ্বারা অন্যান্য অংশীদারের পক্ষে তাঁর সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায় চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
[Bhagawan Ram Kairi V. Radhika Ranjan Das (1953)]

৫) আবেদনকারী অংশীদার ছাড়া অন্য কোন অংশীদার প্রতিষ্ঠানে তাঁর সম্পূর্ণ স্বত্ব তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করলে অথবা তাঁর এইরূপ স্বত্ব কোন ডিক্রীর নিষ্পাদনে (in execution of a decree) বিক্রি হয়ে গেলে।

৬) লোকসান ব্যতীত অংশীদারী ব্যবসায় চালানো অসম্ভব বলে মনে করলে। লাভ করার জন্য অংশীদারী কারবার গঠন করা হয়। সুতরাং আদালত যদি মনে করেন যে, ক্ষতি স্বীকার না করে কারবার চালানো অসম্ভব, তাহলে প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের আবেদন মঞ্জুর করা হবে।

৭) অন্য কোন কারণে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত এবং সুবিচারমূলক বলে যদি আদালত মনে করেন (যেমন, পরিচালনায় অচলাবস্থা, অংশীদারদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ, ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য লোপ ইত্যাদি) তবে আদালত কারবার বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

৩ (খ).৩.২ প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির পরে হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের পরে ফার্মের হিসাব নিকাশ কীভাবে করা হবে এই সম্পর্কে অংশীদারী চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা থাকে। কিন্তু যদি অংশীদারী চুক্তিতে এই সম্পর্কে কিছু বলা না থাকে তাহলে অংশীদারী আইনের ৪৮ এবং ৪৯ ধারা অনুসারে হিসাবের নিষ্পত্তি হবে। নিম্নলিখিত আইন অনুসারে হিসাবের ভাগাভাগি হবে ঃ

১) যাবতীয় লোকসান প্রথমে লাভ থেকে, পরে তাদের মূলধন থেকে তাতে না হলে, অংশীদারগণ তাদের মুনাফাভোগের অনুপাতে অবশ্যই লোকসান পুরণ করবেন। এক্ষেত্রে মূলধনের ঘাটতি লোকসান হিসাবে গণ্য হবে। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন অংশীদার দেউলিয়া হলে, ঐ অংশীদারের থেকে প্রাপ্য অর্থের দরুন লোকসান সচ্ছল অংশীদার (Solvent Partner) তাদের মূলধনের অনুপাতে বহন করবে। [৪৮ (ক) ধারা]।

[Garner V. Murray (1904)]

২) ঐ লোকসান পূরণের জন্য অংশীদারদের দ্বারা দেয় অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে এবং ক্রমানুসারে প্রয়োগ করা হবে ঃ [৪৮ (খ) ধারা]।

ক) তৃতীয়পক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের জন্য;

খ) অংশীদারগণ পুঁজির অর্থ ছাড়া অগ্রিম বাবদ (Advance) যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

গ) অংশীদারগণমূলধন বাবদ যে অর্থ দিয়েছেন, তা আনুপাতিক হারে পরিশোধের জন্য;

ঘ) এই সমস্ত পরিশোধের পরে যদি কোন উদ্বৃত অর্থ থাকে, তবে তা অংশীদারদের মধ্যে লাভের অংশের অনুপাতে বণ্টন করা হবে।

৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দেনা অর্থাৎ অংশীদারদের যৌথ দেনা থাকতে পারে আবার অংশীদারদের নিজস্ব দেনাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দিয়ে প্রথমে যৌথ দেন বা প্রতিষ্ঠানের দেনা মেটাতে হবে এবং তারপর উদ্বৃত থাকলে অংশীদারদের নিজস্ব দেনা মেটাতে হবে। একইভাবে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়ে প্রথমে ব্যক্তিগত দেনা ও পরে প্রতিষ্ঠানের দেনা শোধ করতে হবে। [৪৯ ধারা]।

৪) অংশীদারী কারবারের বিলোপসাধনের পরে কারবারের সুনাম (Goodwill) অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করে অথবা আলাদাভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা যায়। সুনামের ক্রেতা নিজেকে পুরাতন কারবারের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করতে পারবেন এবং পুরাতন কারবার ব্যবহার করার অধিকার শুধু তারই থাকবে। কিন্তু পুরাতন কারবারের কোন অংশীদার যদি কারবারের সুনাম ক্রয় করেন তার জন্য তিনি কারবার চালাতে পারবেন

এবং তার জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। কিন্তু নতুন কারবারে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে পারবেন না, ঐ কারবারই চালাচ্ছেন বলে প্রচার করতে পারবেন না, কোন বিপরীত চুক্তি না থাকলে প্রতিষ্ঠান বিলোপসাধনের আগে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের কোন গ্রাহককে ব্যবসায়ে আমন্ত্রণ করতে পারবেন না।

৫) পুরাতন ফার্মের কোন অংশীদার সুনাম ক্রেতার সঙ্গে এইমর্মে চুক্তি করতে পারেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি পুরাতন ব্যবসায়ের অনুরূপ কোন কারবার চালাতে পারবেন না। ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৭ ধারা অনুসারে এইরূপ চুক্তি কারবারের প্রতিবন্ধকতার জন্য বাতিল হলেও এটা যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে তা বৈধ চুক্তি হবে। [৫৫ (৩) ধারা]।

৩ (খ).৪ নাবালক অংশীদার

অংশীদারী কারবারের প্রধান ভিত্তি হলো চুক্তি। চুক্তি আইনের ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, নাবালক (১৮ বছরের কম বয়স্ক) চুক্তি করতে পারবে না। সুতরাং নাবালক অংশীদার হতেও পারবে না। কিন্তু ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার দেশের আইন অনুসারে নাবালক হলে অংশীদার হতে পারে না। কিন্তু সকল অংশীদার সম্মত হলে নাবালককে অংশীদারীর সুবিধা দেওয়া যায়। [৩০ ধারা] এই অংশীদারী সুবিধাভোগের জন্য নাবালক অংশীদারের কিছু দায় ও অধিকার রয়ে যায়। এই দায় ও অধিকার নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

৩ (খ).৪.১ অধিকার (Rights)

১) অন্য অংশীদার দ্বারা স্বীকৃত অংশীদার লাভের অংশ এবং সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে।

২) প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরিদর্শন করার এবং ঐ হিসাবের প্রতিলিপি বা Copy পাওয়ার অধিকার নাবালকের থাকবে।

৩) নাবালক অংশীদার তার মুনাফার বেং সম্পত্তির ভাগ আদায় করার জন্য অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি যদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান তাহলে তার জন্য মামলা করতে পারবেন।

৪) সাবালকত্ব পাওয়ার পর ঐ নাবালক অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বা অংশীদাররূপে কারবারে যোগদান করতে পারে। সাবালকত্ব লাভের ৬ মাসের মধ্যে বা অংশীদারী সুবিধা পাওয়ার ৬ মাস পর—এই দুয়ের মধ্যে যেটা পরে ঘটবে সেই সময়ের মধ্যে সে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান বা সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত লোকবিজ্ঞপ্তি (Public Notice) দ্বারা জানাবে। যদি সে কোন বিজ্ঞপ্তি না দেয় তাহলে ৬ মাস পরে তাকে পূর্ণ অংশীদার বলে গণ্য করা হবে।

কিন্তু যেখানে নাবালক অংশীদার হবে না বলে লোক-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেখানে বিজ্ঞপ্তির সময় পর্যন্ত নাবালক হিসাবে তার দায় ও অধিকার থাকবে। তারপরে কোন দায় বা অধিকার নাবালক গ্রহণ করবে না।

৩ (খ).৪.২ দায় (Liabilities)

১) প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য নাবালকের কোন ব্যক্তিগত দায় জন্মাবে না। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে তার যে সম্পত্তি বা লাভের অংশ আছে, তার জন্য যে দায়বদ্ধ হবে কিন্তু তার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি কখনই দায়বদ্ধ হবে না।

২) নাবালক অংশীদার রূপে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলে যেদিন থেকে তিনি অংশীদারীর সুবিধা ভোগ করছেন সেদিন থেকে প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য ও দেনার জন্য তৃতীয়পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

৩ (খ).৫ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারলাম ঃ

- মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হতে যখন কোন অংশীদার অবসর গ্রহণ করেন বা নতুন কোন অংশীদার মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন বা মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোন অংশীদারকে বিতাড়ন করা হলে বা কোন অংশীদার দেউলিয়া হয়ে গেলে বা অংশীদারের মৃত্যু হলে মূল অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে একই রেখে সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়;
- অংশীদারী কারবারের বিলুপ্তির বা সমাপ্তির কারণ;
- কারবার বিলুপ্তির পরে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়ের হিসাবের নিষ্পত্তির পদ্ধতি;
- অংশীদারী কারবারে নাবালকের স্থান ও তার দায় ও কর্তব্য;

৩ (খ).৬ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

(২) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ বলতে কী বোঝায়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আদালত অংশীদারদের আবেদনের ভিত্তিতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের বিলোপের আদেশ দিতে পারেন?

(৩) অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী কারণের জন্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হতে পারে?

(৪) প্রতিষ্ঠান ভঙ্গের পরে অংশীদারদের মধ্যে কীভাবে হিসাবের নিষ্পত্তি হয় তা আলোচনা করুন।

(৫) কোন নাবালক কী অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারেন? যদি হন, তাহলে তার কী কী অধিকার ও দায় থাকবে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) উপর অংশীদার বলতে কী বোঝায়?

২) আদালত কর্তৃক বিলোপসাধনের দুটি কারণ উল্লেখ করুন।

৩) নাবালক অংশীদার বলতে কী বোঝায়?

৪) অংশীদারের স্বত্ব-হস্তান্তর বলতে কী বোঝায়?

৩ (খ). ৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ — কলকাতা-২০০১

২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ১ ❑ কোম্পানীর গঠন ও অর্থসংস্থান

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ কোম্পানী কী এবং তার শ্রেণীবিভাগ

১.৩.১ কোম্পানীর গঠন

১.৩.২ কোম্পানীর কার্যারম্ভ

১.৩.৩ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ

১.৪ কোম্পানীর অর্থসংস্থান

১.৪. ১ শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিলিকরণ

১.৪. ২ ঋণপত্র

১.৪. ৩ নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধন

১.৪. ৪ ঋণ করা মূলধন

১.৫ সারাংশ

১.৬ অনুশীলনী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পরে আপনি জানতে পারবেন :

- কোম্পানী কী এবং কয় প্রকারের হয়;
- কোম্পানী কীভাবে গঠিত হয় এবং কীভাবে কাজ শুরু করে;
- কোম্পানী গঠন করতে এবং পরিচালনা করতে কী কী দলিল লাগে;
- কোম্পানী কীভাবে অর্থসংস্থান করে — শেয়ার, ডিবেঞ্চার, নিজস্ব মুলধন ও ঋণ করা মুলধন।

১.২ প্রস্তাবনা

কোম্পানী সম্পর্কে ভারতের সর্বপ্রথম আইন পাশ হয় ১৮৫০ সালে। ইংল্যান্ডের ১৮৪৪ সালে কোম্পানী আইনের অনুরূপে এই বিধিবদ্ধ আইন করেছিল। পরবর্তীকালে ১৮৫০ সালের আইনের পরিবর্তে ১৮৫৭ সালে আর একটি কোম্পানী আইন পাশ হয়। এই আইনে সর্বপ্রথম শেয়ার হোল্ডারগণের সীমাবদ্ধ দায়ের নীতি স্বীকৃত হয় (Principle of Limited Liability)। কিন্তু ঐ আইনের পরিধি অত ব্যাপক ছিল না। ক্রমশ শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য আরো ব্যাপক আকার নেওয়ার ফলে কোম্পানী আইনের পরিধি ব্যাপক করার প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়। তারপরে ১৮৬০, ১৮৬৬, ১৮৮২, ১৮৯৫, ১৯১০ এবং ১৯১৩ সালে পর পর কোম্পানী আইন সংশোধিত হয়। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন ১৯৩৬ এবং ১৯৫১ সালে সংশোধিত হয়ে ১৯৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য প্রসারের ফলে কোম্পানীর জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতরাং, ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসার ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যা দূর করার জন্য ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনকে শক্তিশালী করে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীতা বোধ হতে লাগল। স্বাধীনতা লাভের পরে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামো এবং নতুন শিল্পনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে নতুন ভাবে কোম্পানী আইন রচনার উদ্দেশ্যে শ্রী সি. এইচ ভাবার নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ঐ কমিটি প্রতিবেদন (Report) পেশ করেন। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রধানত ভাবা কমিটির **(Bhaba Committee)** সুপারিশ অনুসারে রচিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই ১৯১৩ সালের আইন বাতিল হয়ে ১৯৫৬ সালের আইন প্রাধান্য পায়। এই আইন সারা ভারতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। সমস্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম খাটানো যায়। কিন্তু নাগাল্যান্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোন আইন প্রয়োগ করা যায়। [১ (৩) ধারা]

গোয়া, দমন দিউ-এর কোম্পানীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম এর জন্য কোন বিধির পরিবর্তন করতে পারেন। [৬২০ বি ধারা]

কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে — [৬২০ সি ধারা]

আবার যেসমস্ত কোম্পানী ভারতের বাইরে নিবন্ধিত কিন্তু ভারতে কারবার পরিচালনা করে তাদের ক্ষেত্রেও ঐ আইন প্রযোজ্য হবে।

১.৩ কোম্পানী কী এবং তার শ্রেণীবিভাগ

কোম্পানী আইন অনুসারে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত এবং নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে কোম্পানী বলে। ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইনের ৩ (১) (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, "এই আইন অনুসারে গঠিত এবং নিবন্ধীত কোন কোম্পানী অথবা কোন বিদ্যমান (existing) কোম্পানী।"

মাননীয় বিচারপতি লিন্ডলে কোম্পানীর সংজ্ঞা প্রকাশ করেছেন—"কয়েকজন ব্যক্তি একটি সংস্থায় মিলিত হয়ে অর্থ বা অর্থের সমমূল্য কোন সম্পদ প্রদান করেন এবং এই সম্পদ দ্বারা যদি তহবিল গঠিত হয় এবং ঐ মূলধনী তহবিল যদি সাধারণ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয় তবে ঐ সংস্থাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানী (Company) বলা হয়।"

সকলে মিলে যে অর্থ কোম্পানীতে দেওয়া হয় তাই কোম্পানীর যৌথ মূলধন এবং যাঁরা অর্থ প্রদান করেন তারাই কোম্পানীর মালিক বা সদস্য। প্রত্যেক মালিক বা সদস্য যে অনুপাতে মূলধনের অধিকারী সেটাই তার অংশ। কারবারের যৌথ পুঁজিকে সমমূল্যের অংশে ভাগ করা হয় এবং সমমূল্যের এক একটি অংশকে শেয়ার (Share) বলে। শেয়ার ক্রেতাগণকেই সদস্য বা শেয়ার হোল্ডার বলে এবং তারাই কারবারের মালিক। তারাই পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচন করেন।

কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ—

কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানীকে দুভাগে ভাগ করা যায়— প্রাইভেট (Private এবং পাবলিক (Public) কোম্পানী।

প্রাইভেট কোম্পানী (Private Company) — যে সকল কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী দ্বারা (১) সদস্যগণের শেয়ার হস্তান্তর সীমাবদ্ধ করে (২) সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হবে না (কোম্পানীর কর্মচারীরা এই হিসাবের বাইরে) (৩) জনগণের কাছে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনার আহ্বান জানাতে পারে না, তাকে প্রাইভেট কোম্পানী বলে। প্রাইভেট কোম্পানী কখনও সীমাহীন দায় বহন করতে পারে না। [৩ (১) ধারা]

পাবলিক কোম্পানী (Public Company) — প্রাইভেট কোম্পানী ছাড়া সকল কোম্পানীকে পাবলিক কোম্পানী বলে। [৩ (১) (ঘ) ধারা]

পাবলিক কোম্পানী তিন রকমের হতে পারে।

(ক) শেয়ারদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Company Limited by Shares) —

এই শ্রেণীর কোম্পানীর মূলধন কতকগুলো শেয়ারে বিভক্ত। কোন শেয়ারহোল্ডার যতগুলো শেয়ার কিনবেন সেই শেয়ার মূল্য তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং তার কেনা শেয়ারের মূল্যের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। কোম্পানীর দেনা যতই হোকনা কেন, শেয়ারহোল্ডার শেয়ারের মূল্য প্রদানের পর তার আর কোন দায় থাকবে না। শেয়ারহোল্ডার তার কেনা শেয়ারের মূল্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভারতের বেশির ভাগ কোম্পানী এই গোত্রের।

(খ) জামিনদ্বার সীমাবদ্ধ কোম্পানী (Company Limited by Guarantee) —

এই শ্রেণীর কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানীর অবসানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জমি প্রদান করেন। এই মর্মে কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ এবং শেয়ার প্রদানের পরে কোম্পানীর দেনার জন্য শেয়ারহোল্ডারের আর কোন দায় থাকে না।

(গ) সীমাহীন দায়সম্পন্ন কোম্পানী (Unlimited Company) —

এই শ্রেণীর কোম্পানীতে শেয়ারহোল্ডারগণ অংশীদারী কারবারের অংশীদারদের মতো অসীম দায় বহন করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোম্পানী বিশেষ দেখা যায় না।

১.৩.১ কোম্পানীর গঠন

যৌথ মূলধনী কারবার প্রবর্তন করার জন্য কিছু আইনগত আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন। নিবন্ধন ছাড়া কোম্পানী গঠন করা সম্ভব নয়। পাবলিক কোম্পানী গঠনের জন্য কম করে ৭ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানী গঠনের জন্য কম করে ২ জন সদস্য প্রয়োজন। নিবন্ধনের জন্য শুরুতেই কারবারের প্রবর্তকগণকে (Promoters) আইন অনুযায়ী কারবার কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে। এই আইন অনুযায়ী কারবার প্রবর্তন করার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের প্রয়োজন আছে। একটি পরিমেলবন্ধ (Memorandum of Association) এবং অপরটি পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association) নামে পরিচিত। কোম্পানীর নাম, উদ্দেশ্য, সর্বোচ্চ মূলধন, দায়-দায়িত্ব, কর্মস্থল, অফিস প্রভৃতির বিবরণ পরিমেলবন্ধের মধ্যে থাকে এবং কোম্পানীর পরিচালনার বিভিন্ন নিয়মাবলী পরিমেল নিয়মাবলীতে থাকে। কোম্পানীটি যে রাজ্যে স্থাপিত হবে ঐ রাজ্যে কোম্পানীর নিবন্ধকের (Registrar of Companies) নিকট নির্ধারিত স্ট্যাম্পসহ নিবন্ধনের জন্য পেশ করতে হয়;

(১) কারবার স্থাপনের প্রথম ধাপ হলো পরিমেলবদ্ধ এবং পরিমেল নিয়মাবলী রচনা করা এবং নিবন্ধনের আবেদনের সঙ্গে ঐ দুই গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিবন্ধকের কাছ জমা দিতে হবে। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে ৭ জন এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে ২ জন দ্বারা এইদুটি দলিল স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক। এবং স্বাক্ষরকারীগণকে কমপক্ষে কোম্পানীর একটি করে শেয়ার ক্রয় করতে হয়।

(২) ১৯৬৯ সালের Capital Isue (Exemption) Order অনুসারে কোম্পানীর ৩ কোটি টাকার বেশি প্রাপ্ত মূলধনের প্রস্তাব করা হলে কেন্দ্রীয় সরকার (Central Government) এর অনুমোদন প্রয়োজন। পূর্বে এই প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে ঐ টাকার পরিমাণ ৩ কোটি করা হয়েছে।

(৩) প্রস্তাবিত কোম্পানীটি যদি ১৯৫১ সালের **[Industries (Development & Regulation) Act, 1951]** আওতায় পড়ে তবে ঐ আইন অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

(৪) পরিচালকগণের (Directors) নাম, ঠিকানা, পেশা, পরিচালক হিসাবে কাজ করার সম্মতিপত্র এবং ন্যূনতম মূল্যের শেয়ার কেনার প্রতিশ্রুতি নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে।

(৫) কোম্পানী নিবন্ধকের নিকট বিবরণপত্র (Prospecters) অথবা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি (Statement in lieu of Prospectus) জমা দিতে হবে।

(৬) ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে (Collection of Minimum Subscription) এবং শেয়ার বিলিবন্টন ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) কোম্পানী আইন অনুসারে সব শর্ত পালন করা হয়েছে বলে এই মর্মে ঘোষণা কোন এ্যাটর্নি, উকিল বা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেট অথবা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লিখিত পরিচালক ম্যানেজার বা সচিব দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। ঐ ঘোষণাকে বিধিবদ্ধ ঘোষণাপত্র বা **Statutory Declaration** বলে।

এই সকল দলিল পরিদর্শন এবং পর্যালোচনা করে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ঠ হন তাহলে আবেদনকারী কোম্পানীকে নিবন্ধন পত্র (Certificate of Incorporation) প্রদান করবেন। যে তারিখে নিবন্ধন পত্র প্রদান করা হয় সেই তারিখেই কোম্পানীর জন্ম হয়।

১.৩.২ কোম্পানীর কার্যারম্ভ

প্রাইভেট কোম্পানী এই নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরেই ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে কিন্তু পাবলিক কোম্পানীকে কাজ আরম্ভ করার আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়; এবং কোম্পানীর পরিচালক বা সচিবকে ঘোষণা করতে হবে যে —

(ক) ১২০ দিনের মধ্যে বিবরণ পত্রে উল্লিখিত ন্যূনতম পুঁজি সংগ্রহ হয়েছে

(খ) ঐ সময়ের মধ্যে সকল পরিচালক যোগ্যতাসম্পন্ন শেয়ার ক্রয় করেছেন

(গ) শেয়ার বাজারে ঐ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন যোগ্য শেয়ারের তালিকাভুক্তকরণে (Listing) অসমর্থ হলে আবেদনকারীকে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য কোম্পানীর কোন দায় নেই।

এই ঘোষণাপত্রে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে কোম্পানীকে কাজ শুরু করার অনুমতিপত্র প্রদান করবেন। এই অনুমতি পত্র (Certificate for the Commencement of Business) পাওয়ার পরে পাবলিক কোম্পানী এর ব্যবসা আরম্ভ করতে পারে। অনুমতি পত্র পাওয়ার পরে আর কোন আপত্তি চলবে না। এক্ষেত্রে যদি নিবন্ধকরণে পূর্বে কোন ত্রুটি থাকে বলে জানা যায়, তাতেও নিবন্ধন বৈধ বলে বিবেচনা করা হবে। নিম্নলিখিত মামলায় অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল —

(১) পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষরকারী সকলেই নাবালক ছিলেন — Moosa Vs. Ibrahim.

(২) স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে কিন্তু নিবন্ধীকরণের আগে পরিমেলবন্ধের বিভিন্ন জায়গায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। — Peel's Case.

১.৩.৩ কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ

পরিমেলবন্ধ বা Memorandum of Association ঃ

পরিমেলবন্ধ বা Memorandum of Association যৌথ মূলধনী কোম্পানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কোম্পানীর গঠন এবং কার্যকলাপ সংক্রান্ত মূল নিয়মাবলী এতে লিপিবদ্ধ থাকে। এতে কোম্পানীর নাম, অবস্থান, মূলধন কাঠামো, সদস্যদের দায়ের পরিমাণ এবং উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা থাকে। পরিমেলবন্ধে যা উল্লেখ করা থাকবে তা অতিক্রম করার ক্ষমতা কোম্পানীর থাকে না। পরিমেলবন্ধের পরিধির বাইরে সমস্ত

কার্যই আইনত অসিদ্ধ (invalid) বলে বাতিল হবে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিমেলবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকতে হবে ঃ

ক) **নাম (Name Clause) ঃ—** কোম্পানী তার ইচ্ছামতো যেকোন নাম রাখতে পারে, কোম্পানীই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে কিন্তু ঐ নাম কোনমতে কোন চলিত কোম্পানীর (Existing) নামে অনুরূপ হবে না। পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে Public এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে Private কথা দুটি লিখতে হবে।

খ) **অবস্থান (Situation Clause) ঃ—** কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় যে কোন একটা রাজ্যে অবস্থিত হবে। যে রাজ্যে এই কার্যালয় স্থাপিত হবে সেই রাজ্যের নাম উল্লেখ করতে হবে। সেই রাজ্যের নিবন্ধিত কার্যালয় (Registered Office) থেকেই কোম্পানী তার পরিচালনা করতে পারবে।

গ) **উদ্দেশ্য (Object Clause) ঃ—** কোম্পানী কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তা পরিমেলবন্ধে উল্লেখ করতে হবে। কোম্পানী যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তার বাইরে গিয়ে কোন কাজ করতে পারবে না। এবং এই বিষয়ে কোম্পানীর দুটি উদ্দেশ্য পরিমেলবন্ধে উল্লেখ করতে হবে। প্রথমত, প্রধান উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য উদ্দেশ্য।

ঘ) **দায় (Liability Clause) ঃ—** কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যদের দায়ের পরিমাণ কি রকম তা উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ সদস্যরা যে দায় বহন করছে তা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ, না জামিন দ্বারা সীমাবদ্ধ, না অসীম তা উল্লেখ করতে হবে।

ঙ) **কারবার সংগঠনে স্বীকৃতির সম্পত্তি (Association Clause) ঃ—** পরিমেলবন্ধের প্রত্যেক সদস্যকে কম করে একটি শেয়ার কিনতে হয়। এবং পরিমেলবন্ধে যে ক'জন ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন নিয়মানুসারে তাদের এই মর্মে স্বীকৃতি দিতে হয়ে থাকে যে, তারা শেয়ার ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোম্পানী আইনের বিরোধিতা করে কোন কিছু এতে লেখা যাবে না। কোম্পানী আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিমেলবন্ধ মুদ্রিত হতে হবে, ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত হতে হবে এবং কতকগুলো অনুচ্ছেদে ভাগ করে এর সম্পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। প্রত্যেক পরিচালক পরিমেলবন্ধে তার নাম, ঠিকানা ও পেশা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ দেবেন এবং তাতে স্বাক্ষর করবেন।

উপরের উল্লিখিত সমস্ত বিষয় পরিবর্তন করা যায়। কোম্পানীর নাম, উদ্দেশ্য, অবস্থান এবং মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করা যায়। তবে এই পরিবর্তনের জন্য কখনও কেন্দ্রীয় সরকার, কখনও কোম্পানী আইন পর্ষদ আবার কখনও কোম্পানী বিশেষ সভায় এর সম্পর্কে মতামত অনুমোদন করাতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলী বা Articles of Association —

পরিমেল নিয়মাবলী কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অর্থাৎ পরিমেল নিয়মাবলীতে যা উল্লেখ করা আছে তা মেনেই কারবার পরিচালনা করা হয়। এতে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার এবং ক্ষমতা, পরিচালকদের অধিকার সংক্রান্ত বিবিধ আইনকানুন উল্লেখ থাকে। এছাড়া কোম্পানীর সভা আহ্বান ও পরিচালনা, হিসাব রাখার পদ্ধতি, মূলধন কাঠামোর বিন্যাস, শেয়ার বিলিকরণ, শেয়ার হস্তান্তর এবং শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ, লভ্যাংশ প্রদান এবং কোম্পানীর অবসানের পরে সম্পত্তির ভাগাভাগি কীভাবে হবে তাও পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা থাকে। কোন কোম্পানী এই এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কোম্পানী পরিচালনা করতে পারে না। যেসমস্ত কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী প্রস্তুত করে না সে সমস্ত কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম **Table 'A'** তে বর্ণনা করা নিয়ম অনুসারে হয়।

- কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, সীমাহীন দায়সম্পন্ন কোম্পানী, শেয়ার বা জামিনদ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানী যদি প্রাইভেট কোম্পানী হয় তবে অবশ্যই পরিমেল নিয়মাবলী নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে।

- কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, সীমাহীন দায়বদ্ধ কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা কত এবং কতজন সদস্য নিয়ে কোম্পানী নিবন্ধকরন হয়েছে এবং কোম্পানীর শেয়ার মূলধনের পরিমান কত তা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করতে হবে।

- কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, জামিনযুক্ত সীমাবদ্ধ কোম্পানীর ক্ষেত্রে কতজন সভ্য নিয়ে কোম্পানী গঠিত হবে তা পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করতে হবে।

- কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, প্রাইভেট কোম্পানীর সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা ৫০ জন দ্বারা সীমাবদ্ধ, শেয়ার হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ নিষিদ্ধ করে কয়েকটি ধারা অবশ্যই এতে সংযোজন করতে হবে।

- কোম্পানীর আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী, পরিমেল নিয়মাবলী মুদ্রিত, ক্রমিকসংখ্যা যুক্ত এবং কতকগুলি অনুচ্ছেদে ভাগ করে এর পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। পরিমেল নিয়মাবলীতে স্বাক্ষরকারীদের প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, পেশা প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যারা পরিমেলবন্ধে স্বাক্ষর করেছেন, তারা অবশ্যই পরিমেল নিয়মাবলীতেও স্বাক্ষর করবেন।

১.৪ কোম্পানীর অর্থসংস্থান

১.৪.১ শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বিলিকরণ

শেয়ার : — কোম্পানীর বিলিযোগ্য অর্থ ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে ঐ এক একটি অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। মোট মূলধনের ঐ এক একটি অংশকে শেয়ার বলে। যে সমস্ত ব্যক্তি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন তাদের শেয়ারহোল্ডার বলা হয়। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানীর মালিক বলা হয়। প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার যত শেয়ার ক্রয় করেন তারা কোম্পানীর তত অংশের মালিকানা লাভ করেন। এর ফলে শেয়ারহোল্ডার কোম্পানীর লভ্যাংশ এবং কোম্পানীর বিলোপসাধনে কোম্পানীর সম্পত্তিতে প্রদত্ত অর্থের আনুপাতিক অংশ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা যায় যে, শেয়ার কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যেক শেয়ারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) শেয়ার কতকগুলো চুক্তিগত অধিকারের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানীর প্রতি শেয়ারহোল্ডারের অধিকার জন্মায়।

(খ) শেয়ার বলতে অর্থকে বোঝায় না। কিন্তু অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় এমন বস্তুকে বোঝায়।

(গ) কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি (Movable Property) বলে গণ্য করা হয়।

(ঘ) প্রত্যেক শেয়ারের উপর একটি ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে। যার দ্বারা প্রত্যেক শেয়ারকে পৃথক করা যায়।

(ঙ) কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারী স্বত্ব পায়।

(চ) কোম্পানী আইনে এবং পরিমেল নিয়মাবলীতে লিখিত কিছু কর্তব্য ও দায় শেয়ারহোল্ডারগণ বহন করেন।

শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ ঃ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) ইক্যুইটি শেয়ার (Equity Share), (২) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Prefernece Share)।

অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Preference Share) ঃ—কোম্পানী আইনের ৮৫ ধারা অনুযায়ী কোন শেয়ার যদি নিম্নলিখিত সুবিধা এবং অধিকার ভোগ করে তবে তাকে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলে। (ক) অন্য শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বণ্টনের আগেই এই শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়; (খ) কোম্পানীর বিলোপসাধনের পরে মূলধনের অর্থ যদি শেয়ারহোল্ডারদের ফেরত দেওয়া হয় তবে এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ অন্য শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের আগেই অর্থ পাবেন; (গ) পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হলেন অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারক্রেতারা। কোম্পানীর নীট লাভ থেকে ঐ টাকা প্রদান করতে হবে পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ পাবেন।

আবার, লভ্যাংশ বণ্টনের শর্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকামূলক শেয়াকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (১) সঞ্চয়ী (Cumulative) (২) অ-সঞ্চয়ী (Non-cumulative)

⇨ **(১) সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Cumulative Preference Share) ঃ**

এই শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বছরে কোম্পানী যদি নীট মুনাফা করতে না পারে অথবা যদি কোম্পানীর মুনাফা লভ্যাংশ প্রদান করার উপযুক্ত না হয় তাহলে পরবর্তী বছরে কোম্পানী যদি পর্যাপ্ত মুনাফা করতে পারে, তবে সেই বছরের লভ্যাংশ এবং আগের বছরের লভ্যাংশ উভয়ই প্রদেয় হবে। অর্থাৎ, বকেয়া লভ্যাংশ কোম্পানীর দায় বলে বিবেচিত হবে।

(২) অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Cumulative Preference Share) ঃ

এই শ্রেণীর শেয়ারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে কেবলমাত্র চলতি বছরের মুনাফা হতেই লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার ভোগ করে। কোন বছরে মুনাফা না হলে লভ্যাংশ জমা থাকে না এবং পরবর্তী বছরের মুনাফা থেকে তা প্রদান করা হয় না।

আবার, প্রত্যর্পণের শর্ত অনুযায়ী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Redeemable Preference Share) (২) অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকামূলক শেয়ার (Irredeemable Preference Share)।

⇨ (১) প্রত্যপর্ণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Redeemable Preference Share) ঃ

কোম্পানী আইনের ৮০ ধারায় বলা হয়েছে, পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে প্রত্যপর্ণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বিলিকরার ক্ষমতা কোম্পানীর আছে। এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোম্পানী শেয়ার মূল্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যপর্ণ করতে বাধ্য থাকবে। তবে, ঐ শেয়ারের অর্থ পরিশোধের কিছু বিধান আছে। যেমন,

(ক) কেবলমাত্র বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ থেকেই এই শেয়ারের মূল্য প্রত্যপর্ণ করা যাবে অথবা প্রত্যপর্ণের জন্য নতুন শেয়ার বিলি করে সেই অর্থ দিয়েও শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করা যাবে।

(খ) একেকটি শেয়ারের মূল্য কোম্পানী একসঙ্গে নিতে পারে বা আংশিক ভাবেও নিতে পারে। শেয়ারের মূল্য পুরো আদায় না হলে ঐ শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া যায় না।

(গ) শেয়ারের মূল্য যদি অধিহারে (Premium) প্রত্যর্পণ করা হয় তবে সেই অর্থ বণ্টযোগ্য লভ্যাংশ হতে বা শেয়ারের অধিহার হিসাবে (Share Premium Account) থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) যে পরিমাণ অর্থ প্রত্যর্পণ করা হবে সেই সমপরিমাণ অর্থ পুঁজি প্রত্যর্পণ সংরক্ষন হিসাব' (Capital Redemption Reserve) -এ স্থানান্তর করতে হবে।

(২) **অ-প্রত্যর্পনযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Irredeemable Preference Share) ঃ—**

যে শেয়ারের মূল্য প্রত্যর্পণযোগ্য নয় তাকে অ-প্রত্যর্পণযোগ্য অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলে।

মুনাফার অংশগ্রহনের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (১) মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Participating Preference Share) (২) অ-অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Participating Preference Share)।

⇨ (১) **মুনাফায় অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Participating Preference Share) ঃ—**

কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে এই শ্রেণীর শেয়ারের মালিকরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়ার পরেও অবশিষ্ট মুনাফাতে অংশ পাওয়ার অধিকারী।

(২) **অ-অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Non-Participating Preference Share) ঃ—**

এই শ্রেণীর শেয়ার মালিকরা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ অর্থাৎ লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী।

ইক্যুইটি শেয়ার (Equity Share) ঃ— কোম্পানী আইনের ৮৫(২) ধারায় বলা হয়েছে যে, যা অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার নয় তাই ইক্যুইটি শেয়ার। কোম্পানীর লাভের থেকে লভ্যাংশ প্রদানের সময়ে অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার হোল্ডারদের বণ্টনের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডাররা পাওয়ার অধিকারী। কোম্পানীর সকল বিষয়ে তাদের ভোটাধিকার আছে। তবে ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কি কি অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব থাকবে তা কোম্পানী আইন এবং পরিমেল নিয়মাবলীর উপর নির্ভরশীল।

১.৪.২ ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র

কোম্পানীর অর্থসংস্থানের আর একটি প্রধান মাধ্যম হলো ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র। এক্ষেত্রে কোম্পানী কোন সম্পত্তির বন্ধক রেখে জনসাধারণের থেকে ঋণগ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ঋণদাতারা এর পরিবর্তে পেয়ে থাকে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কোম্পানী ঋণদাতার অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন। কোম্পানী আইনের ২(১২) ধারা অনুসারে, অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন কোম্পানী যখন সম্পত্তির বন্ধক রেখে জনসাধারণের থেকে ঋণগ্রহণ করে এবং তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট নথিপত্র প্রদান করে তাকে ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বলে। কোম্পানীর ঋণপত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

হস্তান্তরের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঃ—

(১) **বাহকদেয় ঋণপত্র (Bearer Debenture) ঃ—** বাহকদেয় ঋণপত্র বলতে সেই প্রকার ঋণপত্রকে বোঝায় যায় দ্বারা ধারক g —— অন্য কোন ব্যক্তিকে সহজেই ঋণপত্র হস্তান্তর করতে পারে। অর্থাৎ এই রকম ঋণপত্রের ক্ষেত্রে হস্তান্তরের কোন বাধা নেই এবং হস্তান্তর কোম্পানীর খাতায় নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এর ধারক নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবেন।

(২) **নিবন্ধিত ঋণপত্র (Registered Debenture) ঃ—** এই প্রকার ঋণপত্র সহজেই হস্তান্তর করা যায় না। ধারক এর হস্তান্তর করা যায় না। ধারক এর হস্তান্তর করতে চাইলে হস্তান্তর ভাউচারের (Transfer Voucher) -এর মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়। এই হস্তান্তর ভাউচারে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ধারক উভয়ই স্বাক্ষর করেন। এবং হস্তান্তর হওয়ার পরেই কোম্পানীর ঋণপত্র রেজিস্টার নথিভুক্ত করতে হয়। যে ব্যক্তির নাম রেজিস্টারে লেখা থাকে, তিনিই ঋণপত্রের সুদ পাবেন।

জামিনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঃ

(১) **বন্ধকী ঋণপত্র (Secured or Mortgaged Debenture) ঃ—** বন্ধকী ঋণপত্র বলতে সেই সব ঋণপত্রকে বোঝায় যা কোন সম্পত্তির বন্ধক রেখে বিক্রি করা হয়। এই বন্ধক সম্পূর্ণরূপে বা আংশকিরূপে দুভাবেই হতে পারে। এক্ষেত্রে ধারক যদি সুদ না পান বা মেয়াদ শেষে ঋণপত্রের টাকা না পান তাহলে সেই নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি করে সুদের টাকা এবং ঋণপত্রের মূল্য ফেরত নিতে পারেন।

(২) **অবন্ধকী বা সাধারণ ঋণপত্র (Unsecured or Simple Debenture) ঃ—** যে ঋণপত্র কোম্পানীর কোন সম্পত্তির বন্ধক ছাড়াই জনসাধারণের কাছে বিলি করা হয় তাকে সাধারণ ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্রের টাকা ফেরত নেওয়ার জন্য জনসাধারণ বা ধারক কোম্পানীর কোন সম্পত্তিকে দায়ী করতে পারে না।

পরিশোধের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ ঃ

(১) **পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (Redeemable Debuenture) ঃ—** যে ঋণপত্রের টাকা চুক্তি অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে ফেরত দেওয়া হয় তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। এই প্রকার ঋণপত্রের টাকা বার্ষিক বা অর্ধবার্ষিক কিস্তি পদ্ধতিতে শোধ করা হয়।

(২) **অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র (Irredeemable Debenture) ঃ—** যে ঋণপত্রের টাকা কোম্পানীর অবসান না হলে পরিশোধ করা হয় না তাকে অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে। তবে, কোন কোম্পানী উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এইরূপ ঋণপত্রের টাকা কোম্পানীর অবসানের আগেই মিটিয়ে দিতে পারে।

১.৪.৩ নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধন

কোম্পানী বিভিন্ন উৎস থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকে মূলধন বলে। এখন কোম্পানীর মূলধনকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—নিজস্ব মূলধন এবং ঋণ কার মূলধন। কারবার পরিচালনার জন্য কোম্পানী বাজারে শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন যোগাড় করে তাকে নিজস্ব মূলধন বলে। কোম্পানী যখন ঋণপত্র এবং আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণগ্রহণ করে তখন তাকে ঋণকৃত মূলধন বা ধারকরা মূলধন বলে।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে মূলধন নিম্নপ্রকারের হতে পারে ঃ

(১) **অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) ঃ—**

পরিমেলবন্ধে কোন কোম্পানীকে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে যে টাকা সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাকে অনুমোদিত মূলধন বলে। কোম্পানী ইচ্ছা করলেই এই অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে না। সঠিক পদ্ধতিতে পরিমেলবন্ধ পরিবর্তন করে তবেই অনুমোদিত মূলধন পরিবর্তন করা যাবে।

(২) **বিলিযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য মূলধন (Issued Capital) ঃ—**

অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ জনসাধারণের কাছে বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করা হয় তাকে বিক্রয়যোগ্য মূলধন বলে। বিক্রয়যোগ্য মূলধন অনুমোদিত মূলধনের সমান বা কম হবে।

(৩) **বিলিকৃত মূলধন (Subscribed Capital) ঃ—**

বিলিযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য মূলধনের যে পরিমাণ ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের থেকে আবেদন পাওয়া গেছে তাকে বিলিকৃত মূলধন বলে।

(৪) **আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) ঃ—**

বিলিকৃত মূলধনের যে অংশের টাকা জনসাধারণের নিকট থেকে পাওয়া গেছে বা আদায় করা গেছে তাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলে। সাধারণত বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য জনসাধারণের কাছে তলব (call) করা হয়, এবং তলবের যে টাকা পাওয়া যায় তাকে আদায়ীকৃত মূলধন বলে।

(৫) **তলবী মূলধন (Called up Capital) ঃ—**

কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য যে তলব করা হয় তাকে তলবী মূলধন বলে। এরদ্বারা কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের কতটা তলব করা হয়েছে তা বোঝা যায়।

(৬) **অতলবী মূলধন (Un-called Capital) ঃ—**

কোন কোম্পানীর বিলিকৃত মূলধনের টাকা আদায় করার জন্য যে অংশ তলব করা হয় না তাকে অতবলী মূলধন বলে।

১.৪.৪ ঋণকরা মূলধন (Loan Capital)

কোম্পানী ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে মূলধন গ্রহণ করে তাকে ঋণমূলধন বলে। ভারতে বিভিন্ন প্রকারে ব্যাঙ্ক আছে। অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন প্রকারের সত্তা আছে, যেমন—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্পব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। যে পদ্ধতিতে কোম্পানী ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) **রোক ঋণ (Cash Credit) ঃ—**

সাধারণত কারবারের পণ্য জামিন (Security) হিসেবে জমা রেখে ব্যাঙ্ক এই প্রকার ঋণ দিয়ে থাকে। এই পণ্য বা দ্রব্য অনুমোদিত কোন গুদামে বা ব্যাঙ্কের নিজস্ব গুদামে মজুত থাকে। অবশ্য গুদামে না রেখেও ঐ দ্রব্যের উৎপাদনের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে। যে দ্রব্য এইভাবে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক (Hypothecation) থাকে তা উৎপাদনের পর ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে বিক্রি হয় এবং ব্যাঙ্কের সুদের টাকা এবং ঋণ সঙ্গে সঙ্গে আদায় হয়। এইরূপ ঋণকে বলে রোক ঋণ। এইরূপ ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা থাকে। প্রয়োজন মতো ঋণগ্রহীতা চেকের মাধ্যমে টাকা উঠাতে পারে।

(২) **জমাতিরিক্ত গ্রহম (Overdraft) ঃ—**

কারবারীগণ সাধারণত এই উপায়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। এই প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক আমানতকারীর চলতি হিসাব থেকে চুক্তি অনুযায়ী জমার অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তোলার অনুমতি দিয়ে থাকে। এর জন্য জামিন হিসাবে কোম্পানীকে স্টক, শেয়ার প্রভৃতি ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। কারবারের সুনাম, আর্থিক সচ্ছলতা ইত্যাদির ভিত্তিতে জামিনের মাধ্যমেও জমাতিরিক্ত টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়ার রীতি আছে। এই ব্যবস্থায় যে পরিমাণ টাকা জমাতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপরেই ব্যাঙ্ক সুদ দাবি করে থাকে।

(৩) **ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank Loan) ঃ—**

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দিনের জন্য ঋণের প্রয়োজন হলে এই প্রথায় কারবার ঋণ গ্রহণ করে। শেয়ার, স্টক ইত্যাদি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক এই প্রকার ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক এই ঋণদ্বারা কারবারীর নামে একটি ঋণের হিসাব (Loan Account) খুলে থাকে এবং কারবারী চেকের মাধ্যমে টাকা ব্যবহার করে।

(৪) **মেয়াদী ঋণ (Lien of Credit) ঃ—**

কারবারের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা বিচার করে ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করে থাকে। সাধারণত ঋণগ্রহণকারীকে মঞ্জুরিকৃত ঋণের ১৫ বা ২০% সর্বদা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়। ঋণগ্রহীতাকে মোট ঋণের ওপর সুদ প্রদান করতে হয়।

১.৫ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম ঃ

- কোম্পানীর ধারণা ও কোম্পানীর প্রকারভেদ;
- কোম্পানীর গঠন পদ্ধতি;
- কোম্পানীর কার্যারম্ভ;
- কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ দলিল সমূহ এবং তাদের গুরুত্ব;
- কোম্পানীর অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসসমূহ।

১.৬ অনুশীলনী

(ক) **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

১) কোম্পানী কাকে বলে?

২) শেয়ার বলতে কী বোঝায়?

৩) ডিবেঞ্চার বলতে কী বোঝায়?

৪) ইক্যুইটি শেয়ার বলতে কী বোঝায়?

৫) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার কাকে বলে?

(খ) **দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

১) পরিমেল বন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলী কী? পরিমেলবন্ধের বিষয়গুলি উল্লেখ করুন।

২) কোম্পানী স্থাপন করতে হলে কী কী কর্তব্য তা বর্ণনা করুন।

৩) অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার বলতে কী বোঝায়? এর বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।

৪) ঋণমূলধন বলতে কী বোঝায়? কোম্পানী কোথা থেকে এবং কী কী পদ্ধতিতে ঋণমূলধন সংগ্রহ করে?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ — কলকাতা-2001

২) Business Law–R. S. N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

৩) Elements of Mercantile Law – N. D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ২ ❑ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও কোম্পানীর অবসায়ন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ কোম্পানী পরিচালন পর্ষদ

- ২.৩.১ পারিচালক নিয়োগ
- ২.৩.২ পরিচালকের যোগ্যতা
- ২.৩.৩ পরিচালকের অযোগ্যতা
- ২.৩.৪ পরিচালকগণের কার্যাবলী
- ২.৩.৫ পরিচালকের অধিকার
- ২.৩.৬ পরিচালকের কর্তব্য
- ২.৩.৭ ব্যবস্থাপক পরিচালক
- ২.৩.৮ ব্যবস্থাপক

২.৪ কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের সভা

- ২.৪.১ সভার বিজ্ঞপ্তি
- ২.৪.২ সিদ্ধান্ত

২.৫ কোম্পানীর অবসায়ন

- ২.৫.১ অবসায়নের সংজ্ঞা
- ২.৫.২ অবসায়নের পদ্ধতি

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন —

- কোম্পানী পরিচালনায় পরিচালক পর্ষদের ভূমিকা
- পরিচালকদের নিয়োগ, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
- পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য
- কোম্পানী পরিচালনায় ব্যবস্থাপক পরিচালকের নিয়োগ ও ভূমিকা
- কোম্পানীর অবসায়নের কারণসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ, অবসায়ন সম্পর্কে আদালতের নিয়মাবলী।

২.২ প্রস্তাবনা

আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানী একটি আলাদা পৃথক ব্যক্তি হলেও এর ব্যক্তিসত্তা কৃত্রিম। কোম্পানীর প্রাকৃতিক দেহ বা অনুভূতি কিছুই নেই। খুব স্বভাবতই কোম্পানী নিজের কাজ নিজে পরিচালনা করতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। যাঁরাই কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের যে নাম দেওয়া হোক না কেন তাঁরাই কোম্পানীর পরিচালক বা ডাইরেক্টর।

পরিচালকগণ কোম্পানীর কর্মচারী নন। **তাঁদের কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা হয়।** তাঁদের কোম্পানীর প্রতিনিধি বলা হয় এই কারণে যে, কোম্পানীর হয়ে পরিচালকরাই কোম্পানীর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকেন। আবার, অনেকে পরিচালকদের কোম্পানীর অছি বলে থাকেন, কারণ কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান তাঁদের করতে হয়। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচালকমণ্ডলী একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। পরিচালকদের স্বরূপ কী, কোম্পানীতে পরিচালকদের প্রকৃত ভূমিকা কী, তাঁদের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা এই এককে আলোচনা করবো।

২.৩ কোম্পানীর পরিচলন পর্ষদ

পরিচালক ঃ পরিচালক হলেন এমন একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যারা শেয়ারগ্রহীতাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এই পরিচালকবর্গ কোম্পানীতে শেয়ার-হোল্ডারদের প্রতিনিধি (Agent) হয়ে কাজ করেন এবং পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। একটি কোম্পানীতে কতজন পরিচালক থাকবেন তা পরিমেল নিয়মাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোম্পানী আইনে বলা হয়েছে, পাবলিক কোম্পানীতে কমপক্ষে তিন জন এবং প্রাইভেট কোম্পানীতে কমপক্ষে দুজন থাকবেন। এই সমস্ত পরিচালকদের নিয়ে কোম্পানীতে একটি পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয় (Board of Directors)।

২.৩.১ পরিচালক নিয়োগ

যে কোন ব্যক্তিই কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। কোন সংস্থা, সংঘ বা অংশীদারী কারবার পরিচালক হিসেবে কাজ করতে পারে না। কোম্পানীর সাধারণ সভায় সমস্ত শেয়ার হোল্ডাররা একত্রিত হয় এবং তারাই ভোটের মাধ্যমে পরিচালক নিযুক্ত করেন।

প্রথম পরিচালক — কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে যাদের নাম থাকবে পরিচালক হিসেবে তারাই প্রথম পরিচালক হবেন। কিন্তু পরিমেল নিয়মাবলীতে কোন নাম যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে পরিমেল নিয়মাবলী যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তারাই কোম্পানীর প্রথম পরিচালক হবেন। এঁরাই পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত পরিচালক পদে থাকবেন। —২৫৪ ধারা।

অতিরিক্ত পরিচালক — পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকলে পরিচালকগণ নিজেদের কাজের, সুবিধার জন্য একজন অতিরিক্ত পরিচালক (Additional Director) নিয়োগ করতে পারেন। তিনি পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকবেন — ২৬০ ধারা।

সাময়িক শূন্য পদে পরিচালক নিয়োগ — কোম্পানীতে অনেক সময়ে পরিচালকের মৃত্যু, অযোগ্যতা বা স্বেচ্ছাঅবসরের জন্য ঐ পদটি সাময়িক ভাবে শূন্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অন্য পরিচালকবর্গ নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঐ সাময়িক শূন্য পদে একজন পরিচালক নিয়োগ করেন। এই পদকে সাময়িক শূন্য পদ বা Casual Vacancy বলে। তবে এই সম্পর্কে পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকতে হবে।
— ২৬২ ধারা।

বিকল্প পরিচালক — যে রাজ্যে কোম্পানী নিবন্ধিত সেই রাজ্যেই কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় থাকে। এই প্রধান কার্যালয়ে কোম্পানীর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত থাকে। সেই রাজ্য থেকে কোন পরিচালক যদি কম করে তিনমাস অনুপস্থিত থাকেন তাহলে পরিচালকবর্গ একজন বিকল্প পরিচালক নিয়োগ করেন (Alternative Director) । তবে বিকল্প পরিচালক ততদিন পরিচালক মণ্ডলীতে থাকবেন যতদিন না মূল পরিচালক আবার কাজে ফিরে আসেন। — ৩১৩ ধারা।

তৃতীয়পক্ষের দ্বারা পরিচালক নিয়োগ — পরিমেল নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর ঋণদাতা ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর ঋণগ্রহীতারা পরিচালকগণের এক তৃতীয়াংশ পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন। এই তৃতীয়পক্ষের দ্বারা নিয়োজিত পরিচালকদের পর্যায়ক্রমে অবসর গ্রহর করতে হয় না।

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালক নিয়োগ — কোম্পানীতে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে এবং জনসাধারণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার অনধিক ৩ বছরের জন্য পরিচালক নিয়োগ করেন। তবে এক্ষেত্রে সত্যিই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এই মর্মে কোম্পানীতে তদন্ত করে দেখবেন। যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশানুসারে পরিচালক নিয়োগ হবে। এইরূপ পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার কেনার প্রয়োজন নেই।

২.৩.২ পরিচালকের যোগ্যতা

কোম্পানী আইনে পরিচালকের যোগ্যতা বা Qualification সম্পর্কে যে বিধান দেওয়া আছে তাতে কেবলমাত্র শেয়ার যোগ্যতাকেই বলা হয়েছে। একজন পরিচালকের নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ থাকা প্রয়োজন ঃ

ক) তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবেন।

খ) তাঁর চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি হ হবে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না এবং আইনদ্বারা সিদ্ধ নয়।

গ) পরিচালকের যোগ্যতামূলক শেয়ার থাকতে হবে। কোম্পানীর নিয়মাবলীতে বিধান থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ক্রয় না করলে পরিচালক নিযুক্ত হওয়া যাবে না। একে বলে যোগ্যতামূলক শেয়ার। যোগ্যতামূলক শেয়ারের মোট অভিহিত মূল্য ৫০০০ টাকার বেশি হবে না। যেখানে কোম্পানীর একটি শেয়ারের মূল্য ৫০০০ টাকা, সেখানে একটি শেয়ার কেনাই যথার্থ। কোম্পানীর পরিচালক যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করেন সেখানে পরিচালকদের যোগ্যতামূলক শেয়ার ক্রয় করতে হয় না।

ঘ) কোম্পানী আইনের ২৭৪ ধারায় পরিচালকের অযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা রয়েছে। কোন পরিচালক ঐ ধারায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ঙ) ঐ পরিচালক ২০টির বেশি কোম্পানীর পরিচালক নির্বাচিত হবেন না।

২.৩.৩ পরিচালকের অযোগ্যতা

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ২৭৪ ধারায় পরিচালকদের অযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না ঃ

ক) যে ব্যক্তি আদালতের বিচারে বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হয়েছিলেন এবং তা এখনও বলবৎ আছে।

খ) যে ব্যক্তি আদালতের বিচারে দেউলিয়া ব্যক্তি বলে ঘোষিত হয়েছিলেন এবং তা বলবৎ আছে।

গ) যে ব্যক্তি নৈতিক অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং ছয় মাসের বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে এবং এখনও ৫ বছর উত্তীর্ণ হয়নি।

ঘ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২০৩ ধারা অনুসারে আদালত যে ব্যক্তিকে পরিচালক পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং ঐ আদেশ বলবৎ আছে।

২.৩.৪ পরিচালকগণের কার্যাবলী

কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ কোম্পানীর সমস্ত কাজ করে থাকে। কারণ, কোম্পানী হলো একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বা। অর্থাৎ কোম্পানীর নিজে কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই তাই সমস্ত কাজ সম্পাদন করে পরিচালক মণ্ডলী (Board of Directors)। কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ — সংগঠন একটি কোম্পানীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠন নির্ধারণ করা পরিচালক পর্ষদের একটি প্রধান কাজ। কারবারের সমস্ত কাজকর্মের রূপরেখা নির্ধারণ করা, কোন কর্মী কোন পদে থাকবেন, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা কীভাবে বণ্টন করা হবে এবং কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরকম হবে তা নির্ধারণ করা পরিচালকদের কাজ।

(খ) উদ্দেশ্য নির্ধারণ — পরিচালক পর্ষদ কোম্পানীর উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করেন। কোম্পানীর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি পরিমেলবন্ধে লেখা থাকে। এই উদ্দেশ্যগুলি সঠিক ভাবে পালন করা, এবং কারবারের সমস্ত স্তরে উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা, তা দেখা।

(গ) কারবারের নীতি নির্ধারণ — কোম্পানীর কাজকে সঠিকভাবে পালন করতে হলে সঠিকভাবে নীতি নির্ধারণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সমস্ত নীতি কোম্পানীর পরিচালকরা নির্ধারণ করেন। সঠিক পদক্ষেপ এই নীতির নির্ধারণ না হলে কোম্পানীর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

(ঘ) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী অনুমোদন — কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের কাজ কর্ম দেখে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সঠিক কর্মসূচী নির্ধারণ করা এবং অন্যের দেওয়া কোন কর্মসূচী অনুমোদন দেওয়া পরিচালকদের কাজ।

(ঙ) উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়োগ — কোম্পানীর পরিচালকগণ মুখ্য কার্যনির্বাহক নিয়োগ করেন এবং অন্যান্য উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। পরিচালকগণ ব্যবস্থাপক পরিচালক, সাধারণ

ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, সচিব এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপকদের নির্বাচিত করেন এবং তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

(চ) উচ্চপদাধিকার ব্যক্তিদের নির্দেশদান — কোম্পানীর পরিচালকগণ ব্যবস্থাপক পরিচালক, সাধারণ ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক, সচিব প্রভৃতিকে কারবার পরিচালন বিষয়ে নির্দেশদান করেন।

(ছ) বাজেট নির্ণয় করা এবং অনুমোদন — কোম্পানীর আর্থিক কাজকর্ম সঠিকভাবে রূপায়ণ করার জন্য বাজেট করার প্রয়োজন। অর্থাৎ বিভিন্ন খাতে কোম্পানীর কী পরিমাণ আয়, ব্যয়, সঞ্চয় হবে তা পরিচালকগণ বাজেটের মাধ্যমে অনুমোদন করেন।

(জ) অস্তিত্ব ও অগ্রগতি বাজয় রাখা — কোম্পানীর অস্তিত্ব যাতে বজায় থাকে এবং এর অগ্রগতি যাতে কোনভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তা দেখা পরিচালকদের কাজ।

(ঝ) শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা করা — পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। শেয়ারহোল্ডাররা নিজে কোম্পানীতে অংশগ্রহণ না করে প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকদের নিয়োগ করেন। সুতরাং, শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করা পরিচালকদের একটি বড় কাজ।

(ঞ) কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ — কোম্পানীর পরিচালকগণ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার জন্য তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কাজ করে থাকেন।

(ট) লভ্যাংহ ঘোষণা — পরিচালকগণ কোম্পানীর লভ্যাংশ ঘোষণা করেন। আয়ের কতটা অংশ লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হবে এবং তা কীভাবে স্পষ্টভাবে বণ্টন করা হবে, তা পরিচালক মণ্ডলী স্থির করেন।

২.৩.৫ পরিচালকের অধিকার

কোম্পানীর পরিচালকগণের অধিকার নীচে উল্লেখ করা হলো —

(১) পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার — পরিচালকের যদি অযোগ্যতা না থাকে তাহলে তিনি শেয়ারহোল্ডার মাধ্যমে নির্বাচিত হন এবং পরিচালক-মণ্ডলীর সভায় যোগদান করেন এবং কারবার পরিচালনার সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করেন।

(২) পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার — পরিমেল নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী পরিচালক কোম্পানীর থেকে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী।

(৩) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার — পরিচালকের নির্দিষ্ট কার্যকালের আগে যদি তার অযোগ্যতা ব্যতীত কোন কারণে কার্যকালের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে পরিচালক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। সেই ক্ষেত্রে পরিমেল নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তবে, **নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পরিচালকরা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন না ঃ**

(ক) কোম্পানী আইন অনুযায়ী দাবি পরিচালক পদত্যাগ করেন;

(খ) কোম্পানী অবসান হলে;

(গ) প্রতারণা বা বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হলে;

(ঘ) কোম্পানীর পুর্ণগঠন বা একত্রীকরণ হলে;

২.৩.৬ পরিচালকের কর্তব্য

(১) সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা — **City Equitable Fire Insurance Co.** মামলায় বিচারপতি Romer পরিচালকের কর্তব্য বর্ণনা করেছেন ঃ

(ক) পরিচালককে সততার সঙ্গে তার কাজ করতে হবে।

(খ) সাধারণ অবস্থায় একজন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যে ভাবে কাজ করেন, পরিচালককে সেই পরিমাণ দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

(গ) একজন সাধারণ-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যে পরিমাণ নৈপুণ্য নিয়ে কাজ করেন পরিচালক সেই পরিমাণ নৈপুণ্য নিয়ে কাজ করবেন। এর বেশি নৈপুণয পরিচালকের থাকার প্রয়োজন নেই।

(২) তথ্য প্রকাশের কর্তব্য — ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালককে কোম্পানীর নিকট কিছু তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হয় ঃ

(ক) প্রস্তাবিত কোন চুক্তিতে যদি পরিচালকের স্বার্থ থাকে তবে। পরিচালকমণ্ডলীতে প্রকাশ করতে হবে — **[১৯৯ ধারা]**

(খ) পরিচালকের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি তাঁর নাম, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করবেন — **[৩০৩ এবং ৩০৫ ধারা]**

(গ) পরিচালক কোম্পানীর কতগুলো শেয়ার কিনেছেন তা তাঁকে প্রকাশ করতে হবে — [৩০৮ ধারা]

(৩) **অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ফেরত দেওয়া** — কোম্পানী থেকে নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিলে তা ফেরত দেওয়া পরিচালকের কর্তব্য।

(৪) **সভার আহ্বান** — আইন অনুযায়ী কোম্পানীর সভা-সমিতি, বিজ্ঞপ্তি জারি ও প্রচার করা পরিচালকের কর্তব্য।

(৫) অন্যান্য কর্তব্য —

(ক) প্রত্যেক পরিচালককে তার যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনতে হবে — [২০৭ ধারা]

(খ) প্রত্যেক পরিচালকে তা নিযুক্তির সায় কোম্পানীর নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে হবে — [১৬৬ ধারা]

(গ) পরিচালক হিসাবে কোন গোপন লাভ না করাই পরিচালকের কর্তব্য।

(ঘ) পরিচালকমণ্ডলীর তলব অনুসারে পরিচালককে তলবী টাকা দিতে হবে।

(ঙ) পরিচালক সততা ও বিশ্বাসের সঙ্গে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে তাঁর কর্তব্য পালন করবেন।

(চ) পরিচালকের সঙ্গে চুক্তি যখন পরিচালকমণ্ডলী স্থির করেন, তখন ঐ সভায় পরিচালক অংশগ্রহণ করেন না।

২.৩.৭ ব্যবস্থাপক পরিচালক

কোম্পানী আইনের ২(২৬) ধারায় বলা হয়েছে যে, ব্যবস্থাপক পরিচালক হলেন এমন একজন ব্যক্তি (পরিচালক) যিনি কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবদ্বারা বা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে বা পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা অথবা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলী বা পরিমেলবন্ধ অনুসারে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভূত অধিকারী এবং যে ক্ষমতা অন্য কোনভাবে লাভ করা যায় না এবং তিনি পরিচালকগণের মধ্যে একজন তিনি যে নামেই অভিহিত হোন না কেন তাকে ব্যবস্থাপক পরিচালক বলে।

সুতরাং, যে কোন কোম্পানীই ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন। উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবস্থাপক পরিচালক নিযুক্ত হন ঃ

(১) কোম্পানীর সঙ্গে সাধারণ চুক্তির মাধ্যমে;

(২) পরিমেল নিয়মাবলী বা পরিমেলবন্ধের দ্বারা;

(৩) পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা;

(৪) কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা;

কোম্পানী আইনের ২৬৯ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে সব কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ এক কোটি বা তার বেশি সেই সব পাবলিক কোম্পানী বা পাবলিক কোম্পানীর অধিনস্ত ঘরোয়া কোম্পানী সর্বক্ষনের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ করতে পারে। ব্যবস্থাপক পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীর একজন সদস্য। তিনি সর্বক্ষণের পরিচালকও বটে তাই তিনি কোম্পানীর প্রধান কর্তা। তবে ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। যে সমস্ত কোম্পানী ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগের ৯০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অনুমোদন পাশ করতে হবে। ব্যবস্থাপক পরিচালক সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। তবে, পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি ঐ পদে পুনর্নিযুক্ত হতে পারেন। একজন ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। ব্যবস্থাপক পরিচালকের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) কোম্পানীর ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ — কোম্পানীর সমস্ত কাজকর্ম ঠিকভাবে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থাপকের কাজের মধ্যে পড়ে।

(২) দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা — ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজকর্ম ঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা তদারক করেন এবং কোম্পানীর আইন মেনে সবকিছু হচ্ছে কিনা নজর রাখেন।

(৩) সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ — ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বধান করেন এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

(৪) নেতৃত্বদান — ব্যবস্থাপক পরিচালকের কাজ হলো কোম্পানীর বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নেতৃত্বদান করা এবং তাদের মনে উৎসাহ বাড়িয়ে কাজের গতিযাত্রা বাড়ানো।

(৫) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন — ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন। কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানীর বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও সংযোগকারী হিসাবে কাজ করেন।

(৬) **নির্দেশ জারি করা** — ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই সমস্ত ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা কীভাবে কাজ সম্পাদন করবে তার নির্দেশ ও আদেশ জারি করেন।

(৭) **কর্মী ও বিভাগের মূল্যায়ন** — কর্মীরা ঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা এবং সঠিক ভাবে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তার মূল্যায়ন করাও ব্যবস্থাপক পরিচালকের কাজ।

(৮) **প্রতিবেদন পেশ** — ব্যবস্থাপক পরিচালক কোম্পানীর কাজের গতি প্রকৃতি, সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে পরিচালক পর্ষদের সভায় পেশ করেন। এবং পরিচালক পর্ষদ কোম্পানীর কাজের অগ্রগতি বুঝতে পারেন এবং, সেই মতো শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করেন।

(৯) **সামগ্রিক বাজেট প্রণয়ন** — ব্যবস্থাপক পরিচালক বিভিন্ন বিভাগের (Department) প্রধানদের থেকে বিভাগীয় বাজেট নিয়ে প্রতিষ্ঠানের **সামগ্রিক বাজেট (Master Bedget)** তৈরি করেন এবং সেগুলো বিবেচনা করে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ করেন।

অযোগ্যতা — নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ব্যবস্থাপক পরিচালক নিযুক্ত হতে পারেন না ঃ

ক) যে ব্যক্তি দেউলিয়া হয়েছেন বা দেউলিয়া হয়েছিলেন কিন্তু এখনও মুক্তিপ্রাপ্ত হন নি।

খ) যে ব্যক্তি আদালত কর্তৃক নৈতিক অধঃপতনের জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন।

গ) যে ব্যক্তির ২৫ বছর বয়স হয় নি।

ঘ) যিনি ভারতীয় নাগরিক নন।

ব্যবস্থাপক পরিচালকের সংখ্যা — সাধারণত কোন ব্যক্তি একটির বেশি পাবলিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপক পরিচালক নিযুক্ত হতে পারে না। যদি তিনি কোন দ্বিতীয় পাবলিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন তাহলে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আহ্বায়ন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে কোন ব্যক্তি দুটির বেশি কোম্পানীর ব্যবস্থাপক পরিচালক থাকতে পারেন না। তবে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ করার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে, বিশেষ আদেশ জারি করে ঐ কোম্পানীতে অন্য একজন ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগের অনুমোদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি দুটির বেশি কোম্পানীর ব্যবস্থাপক পরিচালক নিযুক্ত হতে পারেন।

কার্যকাল — কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে পাঁচ বছরের বেশি ব্যবস্থাপক পরিচালক নিযুক্ত হতে পারে না। অবশ্য তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার পরে তাকে পূর্ণনিয়োগ করা যেতে পারে। — **[৩১৭ ধারা]**

কোন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত হয় না।

২.৩.৮ ব্যবস্থাপক

ব্যবস্থাপক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে কোন সংগঠন পরিচালনা করার জন্য, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তত্ত্বাবধান করার জন্য নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২(২৪) ধারায় বলা হয়েছে, ব্যবস্থাপক এমন একজন ব্যক্তি যিনি নির্বাহী নিযুক্তক নন, কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর আদেশ, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখন পরিচালক বা অন্য কোন ব্যক্তি চুক্তি বলেই হোক বা না হোক এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকেই ব্যবস্থাপক বলা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপক সম্পর্কে আইনের কিছু বিধান —

(১) কোন ব্যক্তি সাধারণত একটি কোম্পানীর ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতে পারেন। যে শর্তে কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক কোম্পানীর পরিচালক নিযুক্ত হতে পারেন সেই একই শর্তে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন কোম্পানীর ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতে পারেন। [৩৮৬ ধারা]

(২) কোম্পানীর ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক মাসিক হিসাবে অথবা নীট মুনাফার একটি অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ নীট মুনাফার ৫% এর বেশি হবে না। [৩৮৭ ধারা]

(৩) কোম্পানী ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত কোন চুক্তি পরিবর্তন করে ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হলে পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। [৩১০, ৩১১ ধারা]

(৪) কোন প্রতিষ্ঠান, আইনসৃষ্ট সংস্থা, সংঘকে ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত করা যায় না। [৩৮৪ ধারা]

(৫) নিম্নলিখিত ব্যক্তি ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতে পারেন না ঃ

ক) মুক্তি দেওয়া হয়নি এইরূপ কোন ব্যক্তি যাকে দেউলিয়া বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল;

খ) যিনি নীতিবিরুদ্ধ কাজ করার জন্য আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে কখনও এই কারণে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

(৬) কোন কোম্পানী ব্যবস্থাপক একাদিক্রমে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতে পারবেন না। [৩১৭ ধারা]

(৭) ব্যবস্থাপকের পদ হস্তান্তরযোগ্য নয়। [৩১২ ধারা]

২.৪ কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের সভা

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে বিভিন্ন ধরনের সভার কথা বলা হয়েছে।

(১) বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting)

(২) বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting)

(৩) অতিরিক্ত বিশেষ সাধারণ সভা (Extra-ordinary General Meeting)

(৪) পরিচালক পর্ষদের সভা (Board of Directors Meeting)

(৫) অন্যান্য সভা (Other Meeting)

এই সভাগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) বিধিবদ্ধ সভা — ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৬৫ ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কোম্পানী ব্যবসা আরম্ভের দিন হতে কমপক্ষে একমাস পরে এবং ছয় মাসের মধ্যেই অবশ্যই তাদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। এই আবশ্যিক সভাকে বিধিবদ্ধ সভা বলে। তবে ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক নয়। এই বিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ২১ দিন আগে কোম্পানীর সচিব একটি বিধিবদ্ধ বিবরণী (Statutory Report) তৈরি করে প্রত্যেক সদস্যর কাছে এই বিবরণী সভার বিজ্ঞপ্তি সহ পাঠিয়ে দেন। কোন কোম্পানী (সার্বজনিক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে অক্ষম হলে অপরাধী পরিচালক এবং কর্মচারীগণের ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভা — কোম্পানী আইনের ১৬৬ ধারায় বলা হয়েছে, যে কোম্পানী নিবন্ধিতে হওয়ার ১৮ মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। এবং এর পরে প্রত্যেক বছরে একটি করে সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। কিন্তু দুটি বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যবর্তী মেয়াদ ১৫ মাসের বেশি হবে না।

কোম্পানী আইনের ১৭১ ধারায় বলা হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ২১ দিন আগে লিখিত বিজ্ঞপ্তি সমস্ত সদস্যদের পাঠাতে হবে এবং পাঠানোর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে। তবে কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা না হলে বা অনুষ্ঠিত না হলে তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত পরিচালক এবং পদস্থ কর্মচারীগণের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে এবং ক্রমাগত অমান্য করার জন্য দৈনিক আরো ২৫০ টাকা জরিমানা হতে পারে।

(৩) **অতিরিক্ত বিশেষ সাধারণ সভা** — কোম্পানীর আইনের ১৬৯ ধারা অনুসারে বলা হয়েছে, কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট শর্তপালন করে সদস্যগণের আবেদন ক্রমে কোম্পানীর পরিচালকগণ অতিরিক্ত বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারে। সদস্যরা যদি একমত হন তাহলে পরিচালকগণ ২১ দিনের অনুসারে সভার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সভা আহ্বান করেন। দাবি পাঠানোর ৪২ দিনের মধ্যে পরিচালকগণ এইরূপ সভা অনুষ্ঠিত না করলে দাবির দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে সদস্যগণ নিজেরাই এইরূপ সভা আহ্বান করতে পারেন।

(৪) **পরিচালকপর্যদের সভা** — ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে পরিচালকদের সভা সম্পর্কে কিছু বিধান দেওয়া আছে ঃ

i) ভারতে বসবাসকারী সকল পরিচালকদের কাছে সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে এই মর্মে সভা আহ্বান করতে হবে — 286 ধারা

ii) পরিচালকদের সভা প্রত্যেক তিন মাসে অন্তত একবার এবং প্রত্যেক বছরে অন্তত চারবার পরিচালক পর্যদের সভা আহ্বান করতে হবে। তবে দুটি সভার মধ্যে সময়ের পার্থক্য কখনও দুই মাসের বেশি হবে না — 285 ধারা

iii) মোট পরিচালকদের এক-তৃতীয়াংশ সভার গণপূতি সংখ্যা (Quorum) হবে — 287 ধারা

iv) গণপূর্তি সংখ্যার অভাব কোন সভা অনুষ্ঠিত না হলে এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে কোন উল্লেখ না থাকলে, পরবর্তী সপ্তাহের এই দিনে ঐ সময়ে পর্যন্ত সভাটি মুলতবী থাকবে। কিন্তু ঐ দিনটি যদি ছুটির দিন হয় তবে তার পরবর্তী দিনে ঐ সভাটি অনুষ্ঠিত হবে — 288 ধারা

(৬) **অন্যান্য সভা** — উপরে বর্ণিত সভা ছাড়াও আরো কিছু প্রকার সভা কোম্পানীতে হয়ে থাকে যেমন শেয়ারগ্রহীতাদের সভা, ঋণগ্রহীতাদের সভা, পাওনাদারদের সভা প্রভৃতি আহ্বান করে থাকে। তবে এইসভা কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা সাধারণত কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকতে হবে।

২.৪.১ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানীর বিভিন্ন ধরনের সভায় কোম্পানীর সদস্যগণের আহ্বানের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব পাঠানো হয় তাকে সভার বিজ্ঞপ্তি বলা হয়। — 172 ধারা

প্রত্যেক সভার বিজ্ঞপ্তি, সভার তারিখের পূর্বে অন্তত ২১ দিন আগেই পাঠাতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার অধিকারী।

(১) সভার আলোচ্য বিষয়ের ভোটদানকারী প্রত্যেক সদস্য;

(২) মৃতু বা দেউলিয়া সদস্যদের আইনগত প্রতিনিধি;

(৩) কোম্পানীর নিরীক্ষকগণ;

(৪) কোম্পানীর পাওনাদারগণ;

তবে ২১ দিনের কম সময়েও সভার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যায় —

(১) বাৎসরিক সাধারণ সভার সকল সদস্য যদি সম্মত হন

(২) শেয়ার মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানীর ভোটাধিকারী শেয়ারহোল্ডারদের ৯৫% এবং শেয়ার মূলধন না থাকলে এই সভার ভোটাধিকারী সদস্যগণের ৯৫% যদি সম্মত হন;

বিষয়সূচী (Agenda) ঃ সভার বিজ্ঞপ্তিতে কী কী বিষয়ে উক্ত সভাতে আলোচনা হবে তা নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। সভায় আলোচ্য বিষয় দুটি ভাবে বিভক্ত করা যায় (ক) সাধারণ (খ) বিশেষ — 173 ধারা

সভার আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে আয়ব্যয় ও হিসাব-নিকাশপত্র আলোচনা, লভ্যাংশ ঘোষণা, পরিচালক নিযুক্ত করা, নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক ঠিক করা সভার সাধারণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় বিশেষ বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

গণপূর্তি (Quorum) ঃ গণপূর্তির উদ্দেশ্য হলো সভার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যার উপস্থিতি। পাবলকি কোম্পানীর সভার ক্ষেত্রে ৫ জন এবং প্রাইবেট কোম্পানীর সভার ক্ষেত্রে ১ জন সদস্যদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সভা আরম্ভের সময় হতে আধঘণ্টার মধ্যে কোরাম না হলে সভা ভেঙে যায়। সদস্যদের অনুরোধে যদি অতিরিক্ত সাধারণ সভা ডাকা হয় এবং তাতে যদি প্রয়োজনীয় কোরাম না হয় তাহলে সভা মুলতুবী হয় এবং পরবর্তী সপ্তাহের ঐ দিন, ঐ স্থানে এবং সময়ে সভা আবার বসবে। তবে, মুলতুবী সভার জন্য পুনরায় কোরামের প্রয়োজন হয় না। —**174 ধারা**

সভাপতি (Chairman) ঃ কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে যদি অন্যকোন বিধান না থাকে তাহলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ হাত তুলে নিজেদের মধ্যে থেকে কোন সদস্যকে সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যদি গোপন ভোট বা ব্যালট দাবি করেন তাহলে সভাপতি নির্বাচিত করে তাকে দিয়ে গোপন ভোট বা ব্যালট পরিচালনা করা হয়। —**175 ধারা**

নিযুক্ত প্রতিনিধি (Proxy) ঃ সভার বৈধ ভোটদানের অধিকারী কোন সদস্য নিজে সভায় উপস্থিত হতে না পারলে অন্য কোন ব্যক্তিকে তার পক্ষে সভায় যোগদান করে ভোট দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করতে পারেন।

ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় নিযুক্ত প্রতিনিধি। সদস্য একটি লেখ্যপত্র স্বাক্ষর করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কিন্তু ঐ লেখ্যপত্র সভা আরম্ভ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই কোম্পানীতে দাখিল করতে হয়।

কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে অন্যকোন বিধান না থাকলে নিযুক্ত প্রতিনিধি সভায় কোন আলোচনায় যোগদান করতে পারেন না কেবলমাত্র ব্যালট ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এবং নিযুক্ত প্রতিনিধি কোম্পানীর সদস্য না হতেও পারে। প্রাইভেট কোম্পানীর কোন সদস্য এই সভায় যোগদানের জন্য একাধিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন না। —**176** ধারা

২.৪.২ সিদ্ধান্ত

কোম্পানীর সভায় কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রস্তাব পেশ করা হয়। সভায় যদি ঐ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, তা হলে ঐ গৃহীত প্রস্তাবকে সিদ্ধান্ত বলা হয়ে।

সিদ্ধান্ত দুইপ্রকার হতে পারে (১) বিশেষ সিদ্ধান্ত (Special Resolution) — 189 (2) ধারা

(২) সাধারণ সিদ্ধান্ত (Ordinary Resolution) — (189) (1) ধারা

(১) বিশেষ সিদ্ধান্ত ঃ— কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য Special Resolution পেশ করা হয়। সাধারণ নোটিশ দ্বারা সদস্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করে বিশেষ সিদ্ধান্ত পাকা করা যায়। তবে বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুটি শর্ত পালন হওয়া প্রয়োজন ঃ

(i) সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত পাশের প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে তা নোটিশে উল্লেখ করতে হবে।

(ii) যে সকল সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন তাঁদের সংখ্যা প্রস্তাবের বিপক্ষে যাঁরা ভোটদেবেন তাদের অন্তত তিনগুণ হওয়া প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত কারণে কোম্পানীতে বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় ঃ—

ক) কোম্পানী যদি তার আইন বোর্ডের সম্মতিক্রমে পরিমেল বন্ধ পরিবর্তন করে কোম্পানীর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে চায় বা নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য হতে অন্য রাজ্যে পরিবর্তন করতে চায়;

খ) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে কোম্পানী যদি তার নাম পরিবর্তন করতে চান;

গ) কোম্পানী যদি পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তন করতে চান;

ঘ) যদি কোম্পানী শেয়ার মূলধন হ্রাস করতে চান;

ঙ) যদি কোম্পানী মূলধন হতে সুদ প্রদান করতে চান;

চ) পরিচালকদের দায় অসীম করার জন্য যদি পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তন করা হয়;

ছ) স্বেচ্ছাকৃত ভাবে কোম্পানীর অবসায়ন;

জ) কোম্পানী যদি তার অতলবী মূলধনের কোন অংশকেসংরক্ষিত মূলধনে পরিবর্তন করতে চান;

ঝ) কোম্পানীর যদি শেয়ার হোল্ডারদের অধিকারের পরিবর্তন করার দরকার হয়।

(২) সাধারণ সিদ্ধান্ত ঃ— বিশেষ সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য সকল সিদ্ধান্তকে বলে সাধারণ সিদ্ধান্ত। কোন প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হলে তাই সাধারণ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হয়।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের 190 (1) ধারায় বলা হয়েছে যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যেমন, অবসরপ্রাপ্ত নিরীক্ষকের পূর্ণ নিয়োগ না করা, অবসরপ্রাপ্ত নিরীক্ষক বাদে অন্য নিরীক্ষক নিয়োগ, মেয়াদপূর্তির আগেই পরিচালকের অপসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২.৫ কোম্পানীর অবসায়ন

২.৫.১ অবসায়নের সংজ্ঞা ঃ

কোম্পানীর অবসায়ন বলতে কী বোঝায় কোম্পানীর অস্তিত্বের বিলোপসাধন। যে কাজের দ্বারা কোম্পানীর আইনগত সত্তা ও কার্যাবলীর অবসান ঘটে এবং কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যায়ন করে বিক্রিয় মাধ্যমে পাওনাদারদের প্রাপ্য পরিশোধ করা হয় এবং পরিশোধের পরে উদ্বৃত্ত টাকা শেয়ারগ্রহীতাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে ফেরত দেওয়া হয় তাকে কোম্পানীর অবসায়ন বলা হয়।

২.৫.২ অবসায়নের পদ্ধতি

কোম্পানী আইনের ৪২৫ ধারায় কোম্পানীর অবসায়নের তিনটি পদ্ধতি আছে ঃ (১) আদালতের আদেশে বাধ্যতামূলক অবসায়ন (২) স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন (৩) আদালতের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন।

(১) আদালতের আদেশে বাধ্যতামূলক অবসায়ন ঃ

আদালতের আদেশ বা নির্দেশে কোম্পানীর অবসায়ন হলে তাকে বাধ্যতামূলক অবসায়ন বলা হয়। ৪৩৩ ধারা। কিছু কারণে জন্য আদালত অবসায়নের আদেশ দিতে পারেন ঃ

ক) কোম্পানীর সকল সদস্যগণ যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আদালত কর্তৃক কোম্পানীর অবসায়ন করা হোক।

খ) যদি কোম্পানীর সংবিধিবদ্ধ বিবরণী (Statutory Statement) নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করতে বা সংবিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting) আহ্বায়ন করতে অযথা দেরি হয়।

গ) কোম্পানী সৃষ্টি হওয়ার একবছরের মধ্যে যদি কাজ আরম্ভ না করে, যদি আদালত মনে করেন, কোম্পানী সত্যই কারবার চালাতে চায়, তবে এই আদেশ আদালতের বিচার সাপেক্ষ।

ঘ) প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা যদি দুই এর কম এবং পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা যদি সাত-এর কম হয় তবে আদালত অবসায়নের আদেশ দিতে পারেন।

ঙ) কোম্পানী যদি তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়।

চ) আদালত যদি কোম্পানীর অবসায়ন "সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত" মনে করেন।

নীচের উদাহরণ থেকে "সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত" কথাটির সঠিক অর্থ বোঝা যায় ঃ—

১) কোন কোম্পানী লোকসান স্বীকার করে ব্যবসা চালাচ্ছে এবং মুনাফা লাভ প্রায় অসম্ভব— সেই ক্ষেত্রে আদালত "সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত" কথাটি বিচার করে অবসায়নের আদেশ দিতে পারেন।

২) কোম্পানীর পরিচালনায় সম্পূর্ণ বন্ধের অবস্থা সৃষ্টি হলে আদালত অবসায়নের আদেশ দিতে পারেন।

(২) স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন ঃ

স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যাতে কোম্পানী এবং তার পাওনাদারগণ আদালতের আশ্রয় না নিয়েই কারবার গোটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৪৮৪ ধারা।

নিম্নলিখিত ভাবে কোম্পানীর স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন ঘটে ঃ

ক) কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে কোন মেয়াদ যদি নির্ধারিত থাকে সেই মেয়াদ শেষ হলে অথবা পরিমেল নিয়মাবলীতে যদি উল্লেখ থাকে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে কোম্পানীর অবসায়ন হবে তবে সেই ঘটনা ঘটার পরে কোম্পানীর সাধারণ সভায় কারবার অবসায়নের সাধারণ প্রস্তাব পাস হয়।

খ) কোম্পানীর যদি কারবার গোটানোর জন্য বিশেষ প্রস্তাব পাশ করে, তাহলে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময় হতেই কোম্পানীর কারবার গোটানোর কার্য আরম্ভ হলো বলে গণ্য করা হবে।

স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন দুই প্রকারের হতে পারে ঃ

১) সভ্যগণের স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন (Members' Voluntary Winding up (২) পাওয়ানাদারগণের স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন (Creditors' Voluntary Winding up)

কোম্পানীর অবসায়নের প্রস্তাবের সময়ে যদি কোম্পানীর যাবতীয় ঋণশোধে সক্ষম থাকে এবং এই মর্মে পরিচালকবর্গ যদি শপথপত্র ঘোষণা করেন তবে তাকে সভ্যগণের স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন বলা হয়।

আবার, যেক্ষেত্রে কোম্পানী ঋণপরিশোধে অক্ষম এবং কোম্পানীর আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে পরিচালকবর্গ কোন ঘোষণা করে না তাকে পাওনাদারগণের স্বেচ্ছাকৃত সমাপন বলে।

(৩) আদালতের তত্ত্বধানে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন ঃ

কোম্পানীর আইনের ৫২২ ধারা অনুসারে স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নের প্রস্তাব গ্রহণ করার পরে যেকোন সময়ে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে, কোম্পানীর গোটানোর কাজ আদালতের তত্ত্বাবধানে হবে এবং তারসঙ্গে পাওনাদারদের, দায়বহনকারী এবং অন্যান্যদের আদালতে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে। মূলত পাওনাদারগণ এবং দায়বহনকারীদের স্বার্থরক্ষার্থে আদালতের তত্বাবধানে অবসায়নের আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

আদালতের তত্ত্বাবধানের ফলাফল হলো ঃ

(ক) আদালত কর্তৃক কারবার সমাপনের মতো সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা ঐ আদালতের আওতায় আসবে। ৫২৩ ধারা।

খ) আদালত এক বা একাধিক প্রসমাপক (Liquidator) নিয়োগ করতে পারেন। আদালত প্রসমাপক নিয়োগ বা প্রয়োজন হলে তার অপাসরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছাকৃত অবসায়নকালে বাধ্যতামূলক অবসায়ন (Compulsory Winding up Pending Voluntary Winding up) ঃ

কোম্পানী আইনের ৪৪০ ধারা অনুসারে, স্বেচ্ছাকৃত অবসায়ন বা আদালতের তত্ত্বাবধানে অবসায়নকালে সরকারী প্রসমাপক (Official Liquidator) বা অবসায়নে আবেদন করার অধিকারী কোন ব্যক্তি আদালতে নিকট বাধ্যতামূলক অবসায়নের জন্য আবেদন করতে পারে। ঐ আবেদন পেয়ে আদালত যদি মনে করেন, পাওনাদার বা অন্যান্য দায়বহনকারীদের স্বার্থরক্ষার্থে বাধ্যতামূলক অবসায়ন প্রয়োজন, তবে আদালত বাধ্যতামূলক অবসায়নের আদেশে দিতে পারেন।

২.৬ সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম ঃ

- পরিচালক পর্যদের ধারণা, নিয়োগ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা কার্যাবলী;
- পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য;
- ব্যবস্থাপক পরিচালকদের নিয়োগ ও কার্যাবলী;
- কোম্পানীর অবসায়ন, অবসায়নের পদ্ধতি এবং এই সম্পর্কে আদালতের নিয়মাবলী।

২.৭ অনুশীলনী

ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) কোম্পানী আইনে কোম্পানী পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা করুন।

২) কোম্পানী পরিচালকদের কার্যাবলীগুলি আলোচনা করুন।

৩) কোম্পানী পরিচালকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?

৪) কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক পরিচালক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন? ব্যবস্থাপক পরিচালকের কার্যাবলীগুলি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৫) কোম্পানীর ব্যবস্থাপক কারা? কোম্পানী আইনে ব্যবস্থাপকের জন্য যে বিধান আছে তা আলোচনা করুন।

৬) কত রকমভাবে কোম্পানীর অবসায়ন হতে পারে? আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসায়ন কখন হয়ে থাকে?

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) অতিরিক্ত পরিচালক বলতে কী বোঝায়?

২) তৃতীয় পক্ষের দ্বারা কখন পরিচালক নিযুক্ত হন?

৩) পরিচালকদের যোগ্যতামূলক শেয়ার বলতে কী বোঝায়?

৪) কোম্পানী ব্যবস্থাপকের সংজ্ঞা দিন?

৫) কোম্পানীর অবসায়ন বলতে কী বোঝ?

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অরুণকুমার সেন, জিতেন্দ্রকুমার মিত্র—দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিঃ — কলকাতা-2001

২) Business Law–R.S.N. Pillai, Bagavathi– S. Chand & Company Ltd.– New Delhi-1999.

৩) Elements of Mercantile Law – N.D. Kapoor – Sultan Chand & Sons – New Delhi.

একক ৩ (ক) ❑ বৈদেশিক বিনিময় পরিচালন আইন, ১৯৯৯

গঠন

৩ (ক).০ উদ্দেশ্য
৩ (ক).১ প্রস্তাবনা
৩ (ক).২ ফেমা আইনে রির্জাভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা
৩ (ক).৩ এই আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা সমূহ
৩ (ক).৪ চলতি হিসাব লেনদেন
৩ (ক).৫ বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী বা সীমাবদ্ধতা
৩ (ক).৬ জরিমানা
৩ (ক).৭ বিদেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা
৩ (ক).৮ **Global Depository Receipt**
৩ (ক).৯ **FEMA**-র বলবৎকরণ
৩ (ক).১০ আপীল বা বিচার প্রার্থনা
৩ (ক).১১ সারাংশ
৩ (ক).১২ অনুশীলনী
৩ (ক).১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৩ (ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- ফেমা কী?
- ফেমার প্রয়োজনীয়তা
- ফেমার বলবৎকরণের নিয়ম

৩ (ক).১ প্রস্তাবনা

বৈদেশিক বিনিময় বলতে বৈদেশিক মুদ্রাকে (Foreign Currency) বুঝায় এবং সব ধরনের জমা, খরচ, জের যা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় এবং কোনও (Draft) ড্রাফট, ট্রাভেলারস্ চেক, বাণিজ্যিক হুণ্ডি যা ভারতীয় মুদ্রায় লিখিত হয়েছে তাকে বুঝায় কিন্তু তা প্রদেয় হবে বৈদেশিক মুদ্রায়।

১৯৪৭ সালে সাময়িক ভাবে সর্ব্বপ্রথম বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন (Foreign Exchange Regulation Act) রচিত হয়েছিল। ইহা ১৯৫৭ সালে পাকাপাকিভাবে Act 39 হিসাবে স্থান করে নেয়। তার পর থেকে বহুবার এই আইনটির সংশোধন হয়। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে Directorate of Enforcement এবং Reserve Bank of India কিছু প্রস্তাব দেয় যেমন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মূলক দেশে আগমন, বিদেশীদের ভারতে চাকুরি করা ইত্যাদি। ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যবসায়িক নীতির (Trade Policy) বেশ কিছু পরিবর্তনের ফলে মুক্ত অর্থনীতির ধ্যানধারণায় ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্প উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রগতি, বিশেষত রপ্তানি বৃদ্ধি হয়েছে।

১৯৪৭ সালে Foreign Exchange Regulation Act (FERA) টি হটিয়ে FERA, 1973 গঠিত হয়।

এই আইনটিও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় Foreign Exchange Management Act (FEMA) এ। এবং পুরোনো FERA আইন বাতিল হয়ে যায়। যদি পুরোনো আইনের কোনো পুরোনো আপিল অমীমাংসিত থাকে তবে তা ১৯৯৯ সালের FEMA আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুন আইনে আপিলের আওতায় আসবে। ফেমা আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটা 'Civil' আইন। সুতরাং ফেমা আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি কেবল 'জরিমানা' (Penalty)। অবশ্য জরিমানা দিতে না পারলে গ্রেপ্তার করবার বিধান আছে।

৩ (ক).২ ফেমা আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৈদেশিক বিনিময় পরিচালন আইনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। এই কাজ দুই ভাবে পরিচালিত হয়।

ক) অনুমোদিত ব্যক্তির প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ জারি (ধারা ১১)

খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট পরিদর্শন (ধারা ১২)

১১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে —

১) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে সময়ে সময়ে বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক ঋণপত্র সংক্রান্ত নিয়মাবলী, বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা জারি করতে পারেন

২) অনুমোদিত ব্যক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া নির্দেশগুলো যথাযথ ভাবে পালন করেছেন এই মর্মে তথ্য চাইতে পারেন

৩) অনুমোদিত ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করলে অথবা তথ্য সম্বলিত রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হলে অনুমোদিত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার সুযোগ দেবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট না হলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করতে পারেন। নির্দেশ ক্রমাগত লঙ্ঘন হলে ভঙ্গকালীন দিনগুলোর জন্য দিনপিছু দু-হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়েছে।

১২ নং ধারায় বলা হয়েছে যে—

১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন পদাধিকারী পরিদর্শক যে কোন সময়ে অনুমোদিত ব্যক্তির কোন বিবরণী, তথ্য, হিসাব সত্যতা যাচাই-এর জন্য পরীক্ষা করতে পারেন।

২) যদি অনুমোদিত কোন কোম্পানী বা ফার্ম হয় তবে সেই কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার বা অন্যান্য অফিসার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পদাধিকারী পরিদর্শককে চাহিবামাত্র হিসাব, বইপত্র, এবং অন্যান্য দলিলাদি সহ সব তথ্য যা পরিদর্শক চাইবেন তা দাখিল করা কর্তব্য।

৩ (ক).৩ এই আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা সমহূ

ক) Adjucating Authority — ন্যায় নির্ণায়ক ব্যক্তি বলতে এমন একজন পদাধিকারীকে বুঝায় যিনি ১৬ নং ধারায় ১নং উপধারায় বর্ণিত ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেন।

খ) আপিলসংক্রান্ত ট্রাইবুন্যাল — ১৮নং ধারায় বর্ণিত Appelate Tribunal for Foreign Exchange কে বুঝায়।

গ) বেঞ্চ বলতে বোঝায় অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের বেঞ্চ।

ঘ) মূলধন হিসাবে লেনদেন (Capital Account Transportion) — এই লেনদেন বলতে বুঝায় যা কোন সম্পত্তি বা দেনার পরিবর্তন ঘটায়। দেনার মধ্যে Contingent Liabilities (ঘটনাপেক্ষ দেনাকে) ও বুঝায়।

ঙ) চেয়ারপার্সন — বলতে বুঝায় Appellate Tribunal এর সভাপতি।

চ) চার্টার্ড একাউন্টটেন্ট — বলতে বুঝায় ধরা 2 (1) Clause b -তে উল্লিখিত ব্যক্তি যিনি Institute of Chartered Accountants of India আয়োজিত Final পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

ছ) কারেন্সি [ধারা 2(h)] — বলতে বোঝায় কারেন্সি নোট, পোস্টাল নোট, পোস্টাল অর্ডার, মানি অর্ডার, চেক, ড্রাফট, ট্রাভেলরস চেক, বাণিজ্যিক হুণ্ডি, প্রত্যর্থ পত্র, ক্রেডিড কার্ড অথবা অন্যান্য কোন দলিল যা R.B.I. কর্তৃক ঘোষিত হবে।

জ) ব্যক্তি — ব্যক্তি বলতে বোঝায়;

- কোন ব্যক্তি। (individual)
- যৌথ হিন্দ পরিবারের সদস্য
- কোম্পানী
- কোন ফার্ম
- কোন ব্যক্তিবর্গ (an association of persons or a body of individuals)
- কোনো প্রতিনিধিত্ব (any agency)

ছ) কোন কৃত্রিম Juridical person।

ঝ) বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign Currency) — এটি বলতে বুঝায় যে কোনো মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা ছাড়া।

ঞ) বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) [ধারা 2(n)] — এটি বলতে বুঝায় বৈদেশিক মুদ্রা এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্গত

i) কোনো জমা, খরচ এবং জেরা যা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয়।

ii) ড্রাফট, ট্রাভেলরস চেক, বাণিজ্যিক হুণ্ডি, যা ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনো বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিত অথচ ভারতীয় মুদ্রায় প্রদেয়।

iii) ড্রাফট, ট্রাভেলরস্ চেক্, বাণিজ্যিক হুণ্ডি ভারতীয় মুদ্রায় লিখিত কিন্তু বিদেশী মুদ্রায় প্রদেয়।

ট) রপ্তানি — কোনো পণ্য ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে ভারতের বাইরে, পাঠিয়ে দেওয়াকে রপ্তানি বলে। ভারত থেকে কোনো সেবাকার্য ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়াকে রপ্তানি বলে।

ঠ) আমদানি — কোনো দ্রব্য বা সেবাকার্যকে ভারতের বাইরে থেকে ভারতে আনাকে আমদানি বলে।

ড) Repatriate to India [ধারা 2(y)] এর অর্থ আদায়ীকৃত বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) অন্যদেশ থেকে ভারতে আনয়ন করা এবং

i) টাকার বিনিময়ে ভারতে অনুমোদিত কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা

ii) কোনো এক অনুমোদিত ব্যক্তি দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তি মারফত সেই আদায়ীকৃত অর্থ রেখে দেওয়া।

ঢ) Security (ঋণপত্র) — এটি বলতে বোঝায় কোন শেয়ার, স্টক, বণ্ড, ঋণপত্র, সরকারি ঋণপত্র যা 1944 সালের Public Debt Act দ্বারা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

ন) সেবাকার্য — সেবাকার্য বলতে বোঝায় যে কোনো ধরনের সেবাকার্য যা ভোগকারীকে দেওয়া হয়, যেমন ব্যাঙ্কিং বিষয়ে, আর্থিক বিষয়ে, বীমাসংক্রান্ত বিষয়ে, চিকিৎসা বিষয়ে আইনগত বিষয়ে চিট্ ফাণ্ড, গৃহসংক্রান্ত বিষয়ে, পরিবহন বিষয়ে, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য বিষয়ে, থাকা ও খাওয়া বিষয়ে, প্রমোদজনিত বিষয়ে, সংবাদ পরিবেশন বিষয়ে বা অন্যান্য তথ্যগত বিষয়ে। এগুলোকে সেবাকার্য (Service) বলা হয়ে থাকে।

ত) হস্তান্তর (Transfer) — এর মধ্যে অন্তর্গত বিক্রয়, ক্রয়, বিনিময়, বন্ধকীকরণ, গচ্ছিতকরণ, দানকরণ, ঋণ, অথবা অন্য যে কোনো অধিকার দখলের হস্তান্তরকে বুঝায়।

থ) অনুমোদিত ব্যক্তি (Authorised Person) — রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনো দরখাস্তের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে অনুমোদন করতে পারেন বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) ব্যাপারে কাজ করার জন্য (to deal in foreign exchange বা Foreign Securities)। অনুমোদিত ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক বা কোন ব্যক্তি বিশেষ হতে পারে। [ধারা 10(1)]

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই অনুমোদন লিখিত হতে হবে যাকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই অনুমোদন বাতিল করতে পারে যদি ব্যাঙ্ক মনে করে যে ঃ

(a) জনগণের স্বার্থে এই প্রত্যাহারটি হয়েছে।

(b) অনুমোদিত ব্যাক্তি শর্ত ভঙ্গ করেছেন অর্থাৎ যে শর্ত R.B.I আরোপ করেছিল অথবা FEMA-র কোনো ধারা লঙঘন করেছেন।

অনুমোদিত ব্যবসায়ী (Authorised Dealer) —অনুমোদিত dealer বলতে বোঝায় এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি Sec 10 (1), FEMA এই আইনের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছেন এবং তাঁর কাজ R.B.I-র নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩ (ক).৪ চলতি হিসাব লেনদেন

চলতি হিসাব লেনদেন (Current A/cs Transaction) বলতে বোঝায় এমন একটি হিসাবের লেনদেন যা মূলধন হিসাব লেনদেন নয় এবং এই লেনদেনগুলোর মধ্যে অন্তর্গত হয়েছে নিম্নলিখিতগুলো —

(1) কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য, অন্যান্য চলতি ব্যবসায় বা সেবাকার্য, স্বপ্নমেয়াদী ব্যাঙ্কিং বা ঋণদান সংক্রান্ত কারবারগুলি জন্য প্রদেয় অংশ;

(2) ঋণের উপর সুদ এবং বিনিয়োগের উপর নীট আয়ের প্রদেয় অংশ।

(3) বিদেশে বসবাসকারী পিতামাতা, স্বামী/স্ত্রী (spouse) এবং তাদের সন্তানাদির জন্য জীবননির্বাহের ব্যয় সমূহ।

(4) পিতামাতা, স্বামী/স্ত্রী (spouse) এবং তাদের সন্তানদের বিদেশভ্রমন, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বহন।

৩ (ক).৫ বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী বা সীমাবদ্ধতা

এই আইনে অন্য কিছু উল্লেখ না থাকলে, কোনো নিয়ম কানুন যা আইনে উল্লিখিত আছে, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালিত হবে।

নিয়মাবলী :

1) কোনো ব্যক্তি বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত কোন কাজ অন্য কোনো ব্যক্তিকে (যদি তিনি অনুমোদিত ব্যক্তি না হন) হস্তান্তর করতে পারেন না।

2) ভারতের বাইরে আবাসিক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত এমন কোনো ব্যক্তিকে কোন অর্থ প্রদান করতে পারবেন না বা তার হিসাবে জমা করতে পারবেন না।

3) ভারতের বাইরে আবাসিক এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও উপায়ে কোনো অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যম ছাড়া কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না।

4) কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষে কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনে আবদ্ধ থাকতে পারবেন না এবং কোনো সম্পত্তি ক্রয়, অধিকার, সৃষ্টি ভারতের বাইরে করতে পারবেন না।

5) কোনো ভারতীয় আবাসিক (যদি এই আইনে অন্য কিছু উল্লেখ না থাকে) ভারতের বাইরে অবস্থিত কোনো বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) গ্রহণ, দখল, হস্তান্তর করতে পারবেন না বা কোন স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ, হস্তান্তর, দখল করতে পারবেন না।

6) চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে আইনে বিপরীত কিছু উল্লেখ না থাকলে যে কোনো ব্যক্তি বৈদেশিক বিনিময় বিক্রয় বা তুলতে পারেন। অবশ্য তা অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট থেকে লেনদেন করতে হবে।

7) মূলধন হিসাবের ক্ষেত্রেও এই আইনে বিপরীত কিছু উল্লেখ না থাকলে যে কোনো ব্যক্তি বৈদেশিক বিনিময় গ্রহণ বা বিক্রয় করতে পারেন অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে।

৩ (ক).৬ জরিমানা

যদি কোনো ব্যক্তি FEMA আইনের কোনো ধারা লঙঘন করেন বা কোনো নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ অথবা কোনো আদেশ লঙঘন করেন, যে আদেশ এই আইন বলে প্রচারিত হয়েছে অথবা কোনো শর্ত (Condition) বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে তা লঙয়ন করেন, তিনি এই লঙঘনের দায়ে যে অর্থের পরিমাণ জড়িত আছে তার তিনগুণ অর্থ জরিমানা দেবেন বা দু' লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দেবেন। জরিমানা আদায় করা ছাড়াও উপযুক্ত Adjudicating Authority যদি মনে করেন তা হলে যদি কোনো মুদ্রা, বা অর্থ বা সম্পত্তি যা লঙঘনের আওতায় পড়ে তা কেন্দ্রীয় সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। এখানে সম্পত্তি বলতে কোনো ব্যাঙ্ক জমা, কোনো ভারতীয় মুদ্রাকে বোঝাচ্ছে।

৩ (ক).৭ বিদেশীয় বিনিয়োগকারী সংস্থা

একটি নিবন্ধিত Foreign Institutional Investor (FII) SEBI-র মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে কোনো

শেয়ার বা Convertible ডিবেঞ্চার ক্রয় করার জন্য অনুমতি চাইতে পারে Potfolio Investment Scheme এর অধীনে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শর্ত আরোপ করে অনুমোদন প্রদান করতে পারে।

নিবন্ধিত FII (Foreign Institirinal Investor) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি পাবার পর ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ার বা রূপান্তরযোগ্য ডিবেঞ্চার কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের নিবন্ধিত দালালের মারফৎ ক্রয় করতে পারেন।

৩ (ক).৮ Global Depository Receipt

Global Depository Receipt (GDR) বলতে বোঝায় কোনো ব্যাঙ্ক কর্তৃক দেওয়া হয়েছে অথবা ভারতের বাইরে কোনো Depository যা ভারতে গঠিত কোনো কোম্পানীর টাকা / শেয়ার।

৩ (ক).৯ FEMA-র বলবৎকরণ

- **Directorate of Enforcement**

1) কেন্দ্রীয় সরকার Directorate of Enforcement গঠন করবেন। এর অধীনে একজন Director এবং অন্যান্য কিছু অফিসার থাকবেন যাদেরকে Officers of Enforcement বলা হবে এই আইনের উদ্দেশ্যের জন্য।

2) কেন্দ্রীয় সরকার Asstt. Director of Enforcement -এর নীচু পদমর্যাদার কোনো Officer নিয়োগ করবার জন্য Director of Enforcement অথবা Additional Director of Enforcement অথবা Special Director of Enforcement অথবা Deputy Director of Enforcement কে সুপারিশ (authorise) করতে পারেন।

3) কেন্দ্রীয় সরকার উপরে বর্ণিত Officer গণকে তাঁদের ক্ষমতা, কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ন্যস্ত করতে পারেন।

4) Director of Enforcement বা অন্য কোন Officer এই আইন লঙঘনের দায়ে অনুসন্ধান কার্য চালাতে পারেন এবং লঙঘনকারীকে Search এবং তার হেফাজতে প্রাপ্ত জিনিষ পত্র Seize করতে পারেন।

৩ (ক).১০ আপীল বা বিচার প্রার্থনা

কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি মারফত একটি Appellate Tribunal গঠন করতে পারেন যাকে Appellate Tribunal for Foreign Exchange বলা হয়ে থাকে। এই Appellate Tribunal Adjudicating Authority এর আদেশের বিরুদ্ধে বা Special Director এর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনতে পারেন।

FEMA আইনের 19নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো ব্যক্তি যদি Adjudicating Authority -র আদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন তবে তিনি Appellate Tribunal -র কাছে আপীল করতে পারেন।

তবে যদি কোনো ব্যক্তির Adjudicating Authority বা Special Director এর নির্দেশে কোনো জরিমানা (Penalty) ধার্য হয় তবে আপীল ফাইল করার সঙ্গে সেই জরিমানার অর্থ জমা দিতে হবে এবং তার পর আপীল করতে পারবেন। অবশ্য যদি Appellate Tribunal র মনে হয় যে জরিমানা জমা দেওয়া সেই ব্যক্তির পক্ষে দুর্বিষহ ও কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তবে Appellate Tribunal সেই জরিমানার অর্থ প্রদান স্থগিত রাখতে পারেন।

প্রত্যেকটি আপীল Adjudicating Authority বা Special Director (Appeal) র আদেশের ৪৫ দিনের মধ্যে করতে হবে সেই ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে। তবে যদি Appellate Tribunal মনে করেন যে ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল না করতে পারার মূলে যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে তবে সেই ৪৫ দিন অতিবাহিত হবার পরেও আপীল করতে পারেন।

৩ (ক).১১ সারাংশ

The Foreign Exchange Management Act - 1999 বা ফেমা 6ই জানুয়ারী 2000 থেকে কার্যকরী হয়েছে। এই আইন কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে The Foreign Exchange Regulation Act - 1973 এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

বৈদেশিক বিনিময়ে উদার অর্থনীতি প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে ফেমা আইনের প্রয়োজন হয়। ফলে বৈদেশিক বিনিময়ে পূর্বের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিধিও শিথিল হয়ে যায়।

ফেমা আইন প্রণয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটা Civil আইন। সুতরাং আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তির শাস্তি হল ১৩নং ধারা অনুযায়ী কেবল জরিমানা (Penalty)। অবশ্য জরিমানা অনাদায়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করবার বিধান আছে। Reserve Bank of India ফেমা আইনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে।

অনুমোদিত ব্যক্তি R.B.I. এর অনুমোদন ক্রমে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) অথবা (Foreign Secutrities) বিদেশী ঋণপত্র সংক্রান্ত কোন কাজ অনুমোদিত ব্যবসায়ী (Authorised Dealer) অর্থ বিনিময়কারী (Money Changer) বা ব্যাঙ্কার হিসাবে (Offshore Banking unit)বা অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে কাজ করবেন।

ভারতীয় আবাসিক বা ভারতের বাইরে আবাসিকগণ বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই আইনের সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণ করবেন। ফেমা আইনের আদেশ লঙঘনকারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের সুযোগও আছে।

৩ (ক).১২ অনুশীলনী

১। **উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্ন — (Objective type)**

(ক) ন্যায় নির্ণায়ক ব্যক্তি (Adjudicating Authority)

(খ) মূলধন হিসাব লেনদেন (গ) কারেন্সী

(ঘ) রপ্তানি (ঙ) অনুমোদিত ব্যক্তি (Authorised Person)

(চ) ভারতে বৈদেশিক বিনিময় আনয়ন (Repatriate to India)

(ছ) ঋণপত্র (জ) অনুমোদিত ব্যবসায়ী (Authorised Dealer)

(জ) বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange)

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Type)**

(ক) চলতি হিসাব লেনদেন বলতে কী বোঝায়?

(খ) ফেমা আইনে অনুমোদিত ব্যক্তি কে?

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কী ভাবে প্রতিকার চাইতে পারেন?

৩। **দীর্ঘ প্রশ্ন (Broad type)**

(ক) বৈদেশিক পরিচালন আইনের উদ্দেশ্য কী?

(খ) ফেমা আইনের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বর্ণনা করুন।

(গ) কোন অনুমোদিত ব্যক্ত বা ব্যবসায়ীর উপর প্রযোজ্য বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত নিয়মাবলী বর্ণনা করুন।

৩ (ক).১৩ গ্রন্থপঞ্জী

1) Business Law – Kapoor N.D, Sultan Chand

2) FEMA – 1999.

একক ৩ (খ) ❑ হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১

গঠন

৩ (খ).০ উদ্দেশ্য
৩ (খ).১ এই আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ
৩ (খ).২ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহ
৩ (খ).৩ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহের যোগ্যতা
৩ (খ).৪ হুণ্ডি
৩ (খ).৪.১ হুণ্ডির প্রকারভেদ
৩ (খ).৫ ব্যাঙ্কার ও গ্রাহক
৩ (খ).৬ পরিবর্তনজনিত ফল
৩ (খ).৭ সারাংশ
৩ (খ).৮ অনুশীলনী

৩ (খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—

- আইনে প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা
- হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বিভিন্ন পক্ষসমূহ
- হস্তান্তরযোগ্য দলিলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩ (খ).১ এই আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ

হস্তান্তর যোগ্য দলিল — অর্পণের দ্বারা হস্তান্তর করা যায় এরূপ লিখিত দলিলকে হস্তান্তরযোগ্য দলিল বলা হয়। বাণিজ্যিক হুণ্ডি প্রত্যর্থপত্র এবং চেক এই তিন প্রকার লেখ্যপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

এই তিন প্রকার লেখ্যপত্র হস্তান্তরযোগ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত।

১) **বাণিজ্যিক হুণ্ডি (Bill of Exchange)** — এটা হল এমন একট লিখিত দলিল যার মধ্যে একটা নিঃশর্ত আদেশ থাকবে বা লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে, কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ

অর্থপ্রদান করবার আদেশ দেবেন, সেই অর্থ তাকে অথবা তাঁর আদিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়ার কথা বলবেন। (ধারা ৫)

বাণিজ্যিক হুণ্ডির বৈশিষ্ট্য — বৈধ বাণিজ্যিক হুণ্ডির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) দলিলটি লিখিত হবে।

২) দলিলে অর্ত প্রদানের আদেশ থাকবে, অনুরোধ নয়

৩) নিঃশর্ত অর্থ প্রদানের উল্লেখ থাকবে।

৪) হুণ্ডির লেখক দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

৫) হুণ্ডিতে তিনটি পক্ষ থাকবে যেমন হুণ্ডিলেখক, হুণ্ডিগ্রহীতা ও প্রাপক।

৬) নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকবে।

বাণিজ্যিক হুণ্ডির নমুনা ঃ One month after date pay B or order Rs. 500

৩) প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note) — ধারা ৪ অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিঃশর্তভাবে দলিলে উল্লিখিত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলিলের বাহককে উল্লিখিত নির্দিষ্ট অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত লিখিত দলিলকে প্রত্যর্থপত্র বলা হয়।

প্রত্যর্থপত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ

১) এটা লিখিত ও সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

২) এতে অর্থপ্রদানের সুস্পষ্ট লিখিত প্রতিশ্রুতি থাকবে।

৩) এতে প্রতিশ্রুতি নিঃশর্ত হবে।

৪) এতে প্রাপক নির্দিষ্ট ব্যক্তি হবেন।

৫) এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের উল্লেখ থাকবে।

৬) এতে ১৯৬৬ সালের স্ট্যাম্প আইন অনুযায়ী দলিল স্ট্যাম্পযুক্ত হবে।

৭) দলিলে তারিখ উল্লিখিত হবে।

প্রত্যর্থপত্রের নমুনা ঃ (ক) I promise to pay Amal or order Rs 1000/-

(ক) Six months after date I promise to pay B or order Rs. 2000/-

৩) চেক — চেক হচ্ছে একটা বিনিময়পত্র যা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কের উপর লিখিত এবং দাবি মাত্র প্রদানযোগ্য (ধারা ৬)

চেকের বৈশিষ্ট্য ঃ

১) কোনো ব্যাঙ্কের উপর এই বিনিময় পত্র লেখা হয়।

২) এটা চাওয়া মাত্র প্রদানযোগ্য হয়।

চেকের প্রকারভেদ —

চেক দুই প্রকারের হয় (ক) বাহক দেয় (খ) আদেশ দেয়।

বাহক দেয় চেকের ধারক ব্যাঙ্ক হতে টাকা পাবার অধিকারী। আদেশ দেয় চেকের ক্ষেত্রে চেকের নামধারী অথবা তার নির্দেশমত অন্যান্য ব্যক্তি টাকা পাবেন।

চেকের অর্থ প্রাপ্তিকে নিরাপত্তার জন্য রেখাঙ্কন করা যায় দুভাবে —

(ক) সাধারণ রেখাঙ্কন (খ) বিশেষ রেখাঙ্কন।

প্রথম ক্ষেত্রে চেকের উপর দুটি সমান্তরাল রেখা টানা হয়। বিশেষ রেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে কোন সমান্তরাল রেখার উপর কোনো ব্যাঙ্কের নাম উল্লেখ থাকে। এই মন্তব্যের জন্য সেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই চেক ভাঙাইতে হয়।

৩ (খ).২ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহ

ধারক — যে ব্যক্তি দলিল নিজের নামে দখলে রাখার এবং দলিলের পক্ষসমূহের নিকট দলিলের অর্থ পাওয়ার বা দাবি করার অধিকারী সেই ব্যক্তিকে দলিলের ধারক বলা হয়। (ধারা — ৮)

২) যথাকালে ধারক (Holder in Due Course) — হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের যথাকালে ধারক বলতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে বুঝায় ঃ

ক) যে ব্যক্তি প্রতিদানের বিনিময়ে বাহককে দেয় কোন হস্তান্তরযোগ্য দলিলের অধিকারী হয় অথবা

খ) দলিলের টাকা পাওয়ার সময় হওয়ার আগেই এবং দলিলের কোন ত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞাত থেকে অদিষ্ট প্রদেয় দলিলের প্রাপক হয়।

৩ (খ).৩ হস্তান্তরযোগ্য দলিলের পক্ষসমূহের যোগ্যতা

১) নাবালক — নাবালক দলিল প্রস্তুত করে বা পৃষ্ঠাঙ্কন করে অর্পণের দ্বারা দলিলের স্বত্ব হস্তান্তর করে অপরপক্ষগণকে দায়বদ্ধ করতে পারে। নাবালক কিন্তু নিজেকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না।

২) নিবন্ধিত সংস্থা — নিবন্ধিত সংস্থা আইনের চোখে কৃত্রিম ব্যক্তি (artificial person) হিসাবে গণ্য হয়। দলিল আইনের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে এইরূপ সংস্থার পক্ষে প্রযোজ্য আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে এইরূপ সংস্থা দলিল প্রস্তুত, পৃষ্ঠাঙ্কন ও স্বীকৃতি দিতে পারবেন।

৩) দেউলিয়া — দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি দেউলিয়া থাকাকালীন অবস্থায় দলিলের কোন পক্ষ হতে পারেন না। কিন্তু দেউলিয়া হবার পূর্বে তিনি যদি কোন পক্ষ হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে নিয়মানুসারে দলিলের ধারক সংশ্লিষ্ট দেউলিয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য সব পক্ষকে দলিলের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবেন।

৪) প্রতিনিধি — মুখ্য ব্যক্তির নিযুক্ত প্রতিনিধি প্রাপ্তক্ষমতার মধ্যে থেকে যদি দলিলের কোন পক্ষ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর দলিল সংক্রান্ত কাজের জন্য মুখ্যব্যক্তি দায়বদ্ধ হবেন। এক্ষেত্রে দলিলে স্বাক্ষর করবার সময় প্রতিনিধিকে স্পষ্ট করে লিখতে হবে যে তিনি মুখ্যব্যক্তির হয়ে স্বাক্ষর করেছেন।

৩ (খ).৪ হুণ্ডি

সাধারণত হিন্দিতে লেখা হস্তান্তরযোগ্য দলিল হচ্ছে হুণ্ডি। প্রত্যর্থপত্রের মত হলেও এই দেশীয় হুণ্ডিকে বিনিময় পত্র (Bill of Exchange) হিসাবে গণ্য করা হয় না। প্রচলিত স্থানীয় রীতিনীতি অনুসারে হুণ্ডি কার্যকর হয়। বিপরীত মর্মে স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রথা না থাকলে হুণ্ডির ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য দলিলের নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ের আদিকাল থেকে হুণ্ডির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।

৩ (খ).৪.১ হুণ্ডির প্রকারভেদ

হুণ্ডির প্রকার ভেদ ঃ

১) দর্শনী হুণ্ডি — চাহিবামাত্র অর্থ প্রদান করতে হয় এই হুণ্ডিতে।

২) মেয়াদী হুণ্ডি — নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে এই হুণ্ডি ভাঙ্গানোর যায়।

৩) শাহযোগ্য হুণ্ডি — "শাহ" বলতে ব্যবসায়িক বাজারে বিত্তের অধিকারী সম্মানিত কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। এই হুণ্ডির দ্বারা লেখক শুধুমাত্র ঐ "শাহ" কে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

৪) নাম যোগ হুণ্ডি — যে হুণ্ডিতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই শুধু বা তাঁর নির্দেশ মতো অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে সেই দলিলকে নাম যোগ হুণ্ডি বলে।

৫) জখমী হুণ্ডি — "জখমী" শব্দের অর্থ ঝুঁকিহীন। এই হুণ্ডিতে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে একটি শর্ত থাকে। দ্রব্য নিরাপদে পৌঁছালে তবেই হুণ্ডির টাকা প্রদান করা হবে।

৩ (খ).৫ ব্যাঙ্কার ও গ্রাহক

ব্যাঙ্কার — কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার ব্যবসা হচ্ছে গ্রাহকদের জন্য টাকা ও ড্রাফট গ্রহণ করা এবং গ্রাহকদের কাটা চেক সম্মানার্থে পরিশোধ করা।

গ্রাহক — ব্যাঙ্কে যিনি হিসাবের বই খোলেন এবং যার ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

ব্যাঙ্কারের দায় — ব্যাঙ্কের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া চেকের অর্থ চেকের ধারককে প্রদান করা। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া চেক অনাদৃত হলে ব্যাঙ্ক চেকপ্রদানকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে যদি প্রেরকের কোন ক্ষতি হয়। চেকের গ্রাহক কিন্তু চেক প্রত্যাখ্যানের জন্য ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আইনগত অধিকার প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেন না।

৩ (খ).৬ পরিবর্তনজনিত ফল

যে পরিবর্তনের ফলে সম্প্রদেয় পত্রের কোন পক্ষের বা সব পক্ষের অধিকার ও দায়িত্বের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, অথবা যার দ্বারা সম্প্রদেয় পত্রের আকারে বা প্রকৃতি পরিবর্তন হয় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসাবে গণ্য হয়ঃ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, পরিশোধের তারিক ও সময়, সুদের হার, অতিরিক্ত পক্ষের সংযুক্তি ইত্যাদি।

ইংরাজী মামালার রায়ে বলা হয়েছে যে সম্প্রদেয় বর্হিভূত কারও দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হলে সম্প্রদেয় পত্র বাতিল হয়ে যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তনকালীন দায় মুক্তি হয়। কিন্তু পরিবর্তনের পর যাঁরা পক্ষভুক্ত হন, তারা দায়বদ্ধ থাকেন।

দুর্ঘটনার ফলে সম্প্রদেয়পত্রের কোন পরিবর্তন ঘটলে তা অসিদ্ধ হয়ে যায় না। কোন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে বা নির্দেশক্রমে পরিবর্তন ঘটলে তবে সম্প্রদেয় পত্র অসিদ্ধ হবে। Hongkong and Shanghai Banking Corporation v. Lo Lee Shi রেখাঙ্কনবিহীন চেক রেখাঙ্কিত করা, সাধারণ রেখাঙ্কন বিশেষ রেখাঙ্কনে পরিবর্তন করা এবং রেখাঙ্কিত চেকে 'হস্তান্তরের অযোগ্য' শব্দগুলি সংযোজন করা পরিবর্তন বলে গণ্য হয় না।

৩ (খ).৭ সারাংশ

বাণিজ্যিক লেনদেনের আর্থিক নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত এক প্রকার লেখ্যপত্র হল হস্তান্তর যোগ্য দলিল। নগদ টাকার পরিবর্তে এই লেখ্যপত্র হস্তান্তর বা পৃষ্ঠাঙ্কন করে স্বত্ত্বান্তর করা যায়। প্রত্যর্থপত্র, বাণিজ্যিক হুণ্ডি এবং চেক এই তিনটি দলিল হল আইন স্বীকৃত লেখ্যপত্র। এই তিনটি দলিলের বিধানগুলি সম্প্রদেয় পত্র আইনে উল্লিখিত আছে।

দেশীয় হুণ্ডির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয়। প্রচলিত স্থানীয় রীতি এই হুণ্ডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রত্যর্থ পত্র ঃ — ঋণ হিসাবে কোন নির্দিষ্ট অর্থের স্বীকার এবং নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি হল প্রত্যর্থপত্র।

বাণিজ্যিক হুণ্ডি ঃ — যে লেখ্যপত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর করে অপর কোন ব্যক্তিকে অথবা তার হুকুমমত অথবা লেখ্যপত্র বাহককে নির্দিস্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তহীন আদেশ দেন তাকে বাণিজ্যিক হুণ্ডি বলা হয়।

চেক ঃ — এই লেখ্যপত্রের দ্বারা আমানতকারী তার ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের আদেশ দেন।

সম্প্রদেয় পত্র আইনের ৮ ধারা অনুসারে যিনি নিজের নামে কোন প্রত্যর্থ পত্র, বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা চেক দখলে রাখবার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের থেকে অর্থ পাবার অধিকারী সেই ব্যক্তিকে ধারক বলা হয়।

অপরদিকে এই আইনের ৯ ধারা অনুসারে যিনি উপযুক্ত প্রতিদানের বিনিময়ে মেয়াদ পূর্তির আগেই কোন সম্প্রদেয় পত্রের দখল পেয়েছেন তাকে যথাকালে ধারক বলা হয়।

ব্যাঙ্কার ও গ্রাহকের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব সম্প্রদেয় পত্র আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন ব্যাঙ্কে হিসাব খুলবার সাথে সাথে আমানতকারী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন ব্যাঙ্ক আমানতকারীর নির্দেশমত অর্থপ্রদানে বাধ্য থাকেন। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অর্ত প্রদানে অস্বীকার করতে পারে।

যে পরিবর্তনের ফলে সম্প্রদেয় পত্রের কোন পক্ষের বা সব পক্ষের অধিকার ও দায়িত্বের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে অথবা যার দ্বারা সম্প্রদেয় পত্রের আকারও প্রকৃতি পরিবর্তন হয় তাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বলে। যেমন, টাকার পরিমাণ, তারিখ, কোন পক্ষের সংযুক্তি ইত্যাদি।

৩ (খ).৮ অনুশীলনী

১। উদ্দেশ্যমুখী প্রশ্ন —

ক) সম্প্রদেয় পত্র কাকে বলে? এর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

খ) প্রত্যর্থ পত্রের সংজ্ঞা ও একটি নমুনা দিন।

গ) বাণিজ্যিক হুণ্ডির সংজ্ঞা ও একটি নমুনা দিন।

ঘ) যথাকালে ধারক কে?

ঙ) পৃষ্ঠাঙ্কর বলতে কী বোঝায়?

চ) নাবালক কি হস্তান্তর যোগ্য দলিলের পক্ষ হতে পারে?

ছ) ধারকের সংজ্ঞা দিন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও চেকের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

খ) প্রত্যর্থ পত্র ও বাণিজ্যিক হুণ্ডির পার্থক্য লিখুন।

গ) যথাকালে ধারকের অধিকারগুলি কী কী?

ঘ) চেক আড়ি করবার কারণ এবং উপায় কী কী?

ঙ) বাণিজ্যিক হুণ্ডি কে স্বীকার করতে পারে?

৩। দীর্ঘ প্রশ্ন

ক) বাণিজ্যিক হুণ্ডি ওপ্রত্যর্থ পত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

খ) কখন একজন ব্যাঙ্কার তার খরিদ্দারের চেক বাবদ অর্থপ্রদানে অস্বীকার করতে পারে?

গ) সম্প্রদেয় পত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কাকে বলে? এর ফল কী? কোন কোন ক্ষেত্রে সম্প্রদেয় পত্রের পরিবর্তন বৈধ?

একক ৪ (ক) ❑ কারখানা আইন, ১৯৪৮

গঠন

৪ (ক).০ উদ্দেশ্য
৪ (ক).১ কারখানা আইন অনুসারে সংজ্ঞা
৪ (ক).২ শ্রমিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মাবলী
৪ (ক).৩ শ্রমিকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি
৪ (ক).৪ শ্রমিকের কল্যাণের জন্য বিধানসমূহ
৪ (ক).৫ নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ
৪ (ক).৬ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ
৪ (ক).৭ কিশোরদের নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ
৪ (ক).৮ সারাংশ
৪ (ক).৯ অনুশীলনী

৪ (ক).০ উদ্দেশ্য

কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজকর্মের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে এই অধিনিয়ম পাশ হয়। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন ১.৪.১৯৪৯ থেকে কার্যকরী হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সমেত সমগ্র ভারতের বেসরকারি এবং সরকারি কারখানায় এই আইন প্রযোজ্য।

৪ (ক).১ কারখানার আইন অনুসারে সংজ্ঞা

১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে উক্ত আইনে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ

১) **প্রাপ্তবয়স্ক (Adult)** ঃ যার ১৮ বছর বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে, অর্থাৎ ১৮ বছর বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবে। — ২এ ধারা।

২) **কৈশোরপ্রাপ্ত (Adolescent)** ঃ যার ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি তাকে কৈশোরপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে। — ২ বি ধারা।

৩) **শিশু (Child)** ঃ যার ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি, তাকে শিশু বলা হয়। — ২ সি ধারা।

৪) **অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি (Young Person)** ঃ শিশু বা কৈশোরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বলা হয় । — ২ ডি ধারা।

৫) **দিবস (Day)** ঃ মধ্যরাত্রি (রাত্রি ১২টা) থেকে গণনা করে ২৪ ঘণ্টা কালকে দিবস বলা হয়। — ২ ই ধারা।

৬) **শক্তি (Power)** ঃ শক্তি বলতে বোঝায় বৈদ্যুতিক শক্তি বা অন্য কোনরূপ শক্তি যা যন্ত্রপাতি পরিবাহিত এবং যা মনুষয বা জন্তু দ্বারা উৎপাদিত হয় না। — ২ জি ধারা।

৭) **সপ্তাহ** ঃ শনিবার মধ্যরা (রাত্রি ১২টা) থেকে শুরু করে ৭ দিন ব্যাপী সময়কে সপ্তাহ বলে। — ২ এফ ধারা।

৮) **কারখানা (Factory)** ঃ কারখানা বলতে বোঝায় এরূপ কোন গৃহ (তৎসংলগ্ন জমি সহ) যে স্থানে (ক) ১০ জন বা তার অধিক শ্রমিক কাজ করে বা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোনো দিন কাজ করেছে এবং যার যে কোনো অংশে শক্তির সাহায্যে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে বা সাধারণ পরিচালিত হয়ে থাকে অথবা (খ) ২০ জন বা তার সঠিক শ্রমিক কাজ করে বা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোনোও দিন কাজ করেছে এবং যার কোনো অংশ শক্তির সাহায্য ছাড়া কোনও উৎপাদনপ্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে বা সাধারণত হয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যেই ঘরে (তৎসংলগ্ন জমিসহ) শক্তির সাহায্যে ১০ জন বা ততোধিক ব্যক্তি এবং শক্তির সাহায্য ছাড়া ২০ জন বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত সেই ঘরকেই কারখানা বলা হবে। — ২ এম ধারা।

৯) **উৎপাদনপ্রক্রিয়া (Manufacturing Process)** ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়া বলতে নিম্নলিখিত যে কোনো প্রক্রিয়া বোঝাবে।

(ক) প্রস্তুতকরণ, পরিবর্তন, মেরামত, কারুকার্য, সম্পূর্ণকরা, বস্তাবন্দী, মোড়ক বাঁধাই তৈলসিক্তকরণ, ধৌতকরণ, পরিষ্কারকরণ, বিচ্ছিন্ন বা চূর্ণকরণ অথবা ব্যবহার বা বিক্রয়, পরিবহন, অর্পণ বা বিন্যাসের উদ্দেশ্যে কোনো দ্রব্য বা বস্তুকে অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার বা পরিবর্তন করা, বা

(খ) তৈল, জল, ময়লা পাম্প করা,

(গ) শক্তির উৎপাদন, রূপান্তরকরণ বা প্রেরণ

(ঘ) মুদ্রণের জন্য অক্ষর সাজানো, মুদ্রণ যন্ত্রের দ্বারা মুদ্রণ, প্রস্তরের ওপর ছাপানো, ফটো খোদাইকরণ বা অনুরূপ প্রক্রিয়া বা পুস্তক বাঁধাই।

(ঙ) জাহাজ বা জনযান নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, মেরামতি, পুনর্যোজন, সম্পূর্ণকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ। — ২ কে ধারা।

(চ) হিমঘরে কোন বস্তুর রক্ষাণাবেক্ষণ বা সঞ্চয় ইত্যাদি।

১০) **শ্রমিক ঃ** শ্রমিক বলতে বোঝায় এমন একজন ব্যক্তি যে ব্যক্তি মালিক কর্তৃক সরাসরি বা প্রতিনিধি কর্তৃক মজুরির বিনিময়ে বা বিনা মজুরিতে কোনো উৎপাদনপ্রক্রিয়ার কাজকর্মের বা যন্ত্রপাতির কোন অংশ বা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত গৃহ পরিষ্কারকরণে অথবা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত আনুষঙ্গিক যে কোনো কাজে নিযুক্ত হয়েছে। — ২ এল ধারা।

১১) **দখলকারী (occupier) ঃ** কারখানা পরিচালনার সর্বময় ভার বা দায়িত্ব যে লোকের উপর ন্যস্ত থাকে তাকে দখলকারী বলা হয়। অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে কোনও অংশীদার, কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে তার কোনো পরিচালককে, সমিতির ক্ষেত্রে যে কোনো পরিচালককে দখলকারী বলা হয়। — ২ এন ধারা।

১২) **পালা বা বদলীদল (Shift and Relay) ঃ** একাধিক শ্রমিকদল একই কাজ বিভিন্ন সময় ধরে ভাগ করে কাজ করে তা হলে বিভিন্ন কাজের সময়কে 'পালা' বলে এবং শ্রমিকদলকে 'বদলীদল' বলে। — ২ আর ধারা।

৪ (ক).২ শ্রমিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মাবলী

কারখানা আইনে ১১-২০ ধারায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিধানগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) **পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness)** — প্রত্যেক কারখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নর্মদা, পায়খানা বা অন্য কোনো বিশ্রী পদার্থের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বিশেষত কারখানার মেঝে,

শ্রমিকের বসার জায়গা, সিঁড়ি, যাতায়াতের পথ প্রভৃতি জমে থাকা ধূলা ও আবর্জনা সক্রিয় কোনো পদ্ধতির দ্বারা বা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে বা মুছে আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারখানার ঘরের মেঝে সপ্তাহে অন্তত একবার কীটনাশক দ্রব্যের সাহায্যে পরিষ্কার করতে হবে। — ১১ নং ধারা।

২) **আবর্জনা ও তরল ময়লা অপসারণ (Disposal of Wastes)** — প্রত্যেক কারখানা থেকে নির্মাণ প্রক্রিয়াজাত আবর্জনা ও তরল ময়লা অপসারণের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। — ১২ নং ধারা।

৩) **বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা (Ventilation and Temperature)** — কারখানার যে সমস্ত গৃহে শ্রমিকরা কাজ করে সেখানে যথেষ্ট নির্মল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং যে তাপমাত্রায় শ্রমিকরা যুক্তিসংগতরূপে আরামদায়কভাবে কাজ করতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটতে পারে তা বজায় রাখতে হবে। — ১৩ নং ধারা।

৪) **ধূলা ও ধোঁয়া (Dust and Fume)** — কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে শ্রমিকদের পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর বা ক্ষতিকারক কোন ধূলা বা ধোঁয়া না জমে তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরে না যায় তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। — ১৪ নং ধারা।

৫) **কৃত্রিম আর্দ্রকরণ (Artificial Humidification)** — কারখানায় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ানোর দরকার হলে আর্দ্রতাকরণে শুধুমাত্র পানীয় জল ব্যবহার করতে হবে। — ১৫ নং ধারা।

৬) **অত্যধিক ভিড় (Over Crouding)** — শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এইভাবে কোনো ঘরে তাদের অত্যধিক ভিড় করতে দেওয়া হবে না, এই আইন প্রচলিত হবার আগে কারখানাগুলোতে শ্রমিক পিছু অন্তত ৩৫০ ঘটফুট এবং আইন প্রচলনের পরবর্তীকালের কারখানাগুলোতে শ্রমিকপিছু অন্তত ৩৫০ ঘটফুট এবং আইন প্রচলনের পরবর্তীকালের কারখানাগুলোতে শ্রমিকপিছু অন্তত ৫০০ ঘটফুট জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। — ১৬ নং ধারা।

৭) **আলো (Light)** — যে সব ঘরে শ্রমিকরা কাজ করে বা যাতায়াত করে সে সব ঘরে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা উভয় প্রকার আলোর যথেষ্ট ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচের জানালা পরিষ্কার রাখতে হবে। — ১৭ নং ধারা।

৮) **পানীয় জল (Drinking water)** — প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে

বিশুদ্ধ পানীয় জলের যথেষ্ট সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব স্থানে অধিকাংশ শ্রমিক বুঝতে পারে এরূপ ভাষায় 'পানীয় জল' লিখে রাখতে হবে। যে কারখানায় ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে সেই কারখানায় পানীয় জল শীতল করবার ও সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। — ১৮ নং ধারা।

৯) **শৌচাগার (Latrines)** — প্রত্যেক কারখানায় সরকার নির্ধারিত ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক পায়খানা ও প্রসাবাগার শ্রমিকদের সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে। ২৫ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানায় সমস্ত পায়খানা ও প্রস্রাবাগারগুলো সরকার নির্ধারিত স্যানিটারি ধরনের হবে। — ১৯ নং ধারা।

১০) **থুথু ফেলবার পাত্র (Spilloon)** — প্রত্যেক কারখানায় যথাযথস্থানে যথেষ্ট সংখ্যক থুথু ফেলবার পাত্র রাখতে হবে। এগুলোকে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কেউ পাত্র ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে থুথু ফেলে তবে তার ৫ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। — ২০ নং ধারা।

৪ (ক).৩ শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি

কারখানা আইনের ২১-৪১ নম্বর ধারায় শ্রমিদের নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১) **যন্ত্রপাতির জন্য বেড়া** — কারখানাগুলোতে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি মজবুত বেড়া দিয়ে এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যে যন্ত্র চলবার সময়ও যেন বেড়া না নড়ে (ক) আদি চালক যন্ত্রের প্রতিটি চলমান অংশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি ফ্লাই হুইল; (খ) ওয়াটার টারবাইনের বা ওয়াটার হুইলের প্রত্যেকটি হেড রেস্ট ও টেল রেস্ট; (গ) লেদ মেশিনের হেডস্টক ছেড়ে বার হয়ে থাকা স্টকবারের যে কোনো অংশ; (ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, মোটর, ব্যাটারী কনভার্টারের প্রত্যেকটি অংশ, ট্রান্সমিশন যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ এবং অন্যান্য যন্ত্রের সব বিপজ্জনক অংশ। — ধারা ২১।

২) **চলমান যন্ত্রপাতির ওপরে বা কাছে কাজ** — ২১ নং ধারায় উল্লেখিত কোন যন্ত্রের কোন অংশ চলমান অবস্থায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন হলে সেইকাজ একমাত্র পুরুষ শ্রমিককে দিয়ে করাতে হবে। সংশ্লিষ্ট পুরুষ শ্রমিক এই বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন এবং আঁটোসাটো পোষাক পরে পরীক্ষার কাজ করবেন। — ধারা ২২।

৩) **বিপজ্জনক যন্ত্রে অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিয়োগ** — বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না করে বা ক্ষক্ত কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা না দিয়ে অথবা যন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে না রেখে কোনো বিপজ্জনক যন্ত্রের কোন কাজে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাবে না। — ধারা ২৩।

৪) **স্ট্রাইকিং গিয়ার ও বিদ্যুৎ সরাবরাহ বন্ধ করবার উপায়** — প্রত্যেক কারখানায় স্ট্রাইকিং গিয়ার বা অন্য কোনো উপযুক্ত যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ট্রান্সমিশন যন্ত্রের অন্তর্গত দৃঢ় ও শিথিলভাবে আবদ্ধ পুলিতে ড্রাইভিং বেল্ট চালাবার ব্যবস্থা করা যায়। সংকট কালে চলমান যন্ত্র থেকে যাতে শক্তি বিচ্ছেদ হয় তার ব্যবস্থা থাকবে। — ধারা ২৪।

৫) **স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Self-acting Machine)** — কারখানায় যদি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চলে এবং সেই স্থান দিয়ে শ্রমিকদের যাতায়াতের পথ হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের অংশ নয় এরূপ কোনো চিরস্থায়ী কাঠামো হতে ১৮ ইঞ্চির মধ্যে কোন শ্রমিক বা ব্যক্তিকে আসতে দেওয়া যাবে না। — ধারা ২৫।

৬) **যন্ত্রের আবরণ** — যাতে কোনো বিপদ না হয় সেজন্য শক্তিচালিত সব যন্ত্র, চলন্ত শাফ্‌ট ইত্যাদির ওপর স্ক্রু, বল্টু বা কেতা গভীরভাবে বসাতে ও ঢেকে রাখতে হবে। যে সব দাঁতযুক্ত বা ফ্রিকশন গিয়ারিং চলার সময় ঘন ঘট ঠিক করার প্রয়োজন হয় না, তা সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হবে। — ধারা ২৬।

৭) **তুলা খুলবার যন্ত্রের কাছে স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ** — যে সব কারখানায় তুলা খুলবার যন্ত্র চালু থাকে সেই সব কারখানায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়োগ করা যাবে না। — ধারা ২৭।

৮) **উত্তোলক যন্ত্রাদি** — প্রত্যেকটি উত্তোলক যন্ত্র দোষশূন্য মালমশলার দ্বারা প্রস্তুত, উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন এবং উত্তম যান্ত্রিক গঠনের হতে হবে। প্রত্যেকটি উত্তোলক যন্ত্রে নিরাপদ বোঝার পরিমাণ পরিষ্কারভাবে লিখে রাখতে হবে। — ধারা ২৮।

৯) **মালবাহী যন্ত্র, চেন, রোপ, ট্যাকল** — উত্তোলক যন্ত্রাদি ভিন্ন মালবাহী যন্ত্র, দড়ি, চেন ও ট্যাকল সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করতে হবে।

ক) ১২ মাস অন্তর একবার পরীক্ষা করাতে হবে।

খ) কোনো যন্ত্রই নিরাপদ মাত্রার বেশি বহন করতে পারবে না।

গ) ভারতোলার যন্ত্রে খাঁচার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন — ধারা ২৯।

১০) **ঘূর্ণায়মান যন্ত্র** — যে কারখানায় যাঁতাকল প্রভৃতি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র চালানো হয়, সেইখানে স্থায়ীভাবে লাগানো একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার ব্যাস, বেগ ইত্যাদি লিখে রাখতে হবে এবং বেগের নিরাপদ সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। — ধারা ৩০।

১১) **চাপযন্ত্র (Pressure Plant)** — কারখানা আইনে বলা হয়েছে যে কোন যন্ত্র উৎপাদনকাজে ব্যবহারের জন্য যদি সাধারণ চাপের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হয়, সেইজন্য যাতে কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তার সুব্যবস্থা করতে হবে। — ধারা ৩১।

১২) **মেঝে, সিঁড়ি ও প্রবেশপথ**— কারখানায় যাবতীয় মেঝে, সিঁড়ি, প্রবেশপথ ইত্যাদি মজবুতভাবে তৈরি করতে হবে। — ধারা ৩২।

১৩) **গর্ত ও মেঝেতে ফাটল** — মাটির গর্ত বা কোন জমি বা মেঝেতে ফাটল ধরলে অথবা জলাধারের অবস্থিতি বা নির্মাণ পদ্ধতি বা ভেতরর বস্তু থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা থাকলে তা ঢেকে বা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। — ধারা ৩৩।

১৪) **অত্যধিক বোঝা** — কারখানার কোন ব্যক্তির পক্ষে তার আঘাত ঘটতে পারে এরূপ ভারসম্পন্ন বোঝা তোলা বা বহন করা নিষিদ্ধ। নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে যেকোন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক ও কৈশোরপ্রাপ্ত পুরুষ ৬৫ পাউণ্ড, বালক ৩৫ পাউণ্ড এবং বালিকা ৩০ পাউণ্ডের বেশি ভার তুলতে পারবে না। — ধারা ৩৪।

১৫) **চক্ষু রক্ষা** — উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নির্গত বস্তু বা গুড়ার দ্বারা অথবা অত্যধিক উজ্জ্বল আলোর রিশ্ম চোখের পক্ষে বিপজ্জনক হলে রাজ্য সরকার চক্ষু রক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম করতে পারেন। — ধারা ৩৫।

১৬) কারখানার কোন ঘরে, জলের পাত্রে বা নল প্রভৃতি থেকে শ্বাসরোধ হতে পারে এরূপ বিপজ্জনক বাষ্প বা ধোঁয়া নির্গত হলে এবং তা বার করবার জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে সেই স্থানে কোনো ব্যক্তিকে কাজ করবার জন্য নিয়োগ করা চলবে না। — ধারা ৩৬।

১৭) **বিস্ফোরক বা দাহ্য ধূলা ও গ্যাস প্রভৃতি** — কোন কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে নির্গত ধূলা, গ্যাস বা বাষ্প যদি সহজে বিস্ফোরণ পক্ষে সহায়ক হয় তা হতে বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে সেই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। — ধারা ৩৭।

১৮) **অগ্নি থেকে সতর্কতা** — প্রত্যেক কারখানাতে আগুন লাগলে সহজে বার হবার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে। বার হবার দরজা যাতে সহজে খোলা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া আগুন লাগার সংকেত জ্ঞাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ধারা ৩৮)

১৯) **দোষযুক্ত অংশের তথ্যাদির দাবি করবার ক্ষমতা** — কারখানার ঘর বা কোন অংশ, চলাচলের পথ, যন্ত্র ইত্যাদি যদি নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয় তবে কারখানার পরিদর্শক নির্দিষ্ট তারিখের আগে ঐ ব্যাপারে তথ্যাদি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপকের ওপর বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে পারেন। — ধারা ৩৯।

২০) **বাড়ী ও যন্ত্রাদির নিরাপত্তা** — কারখানার কোন বাড়ী বা যন্ত্র বা তাদের কোন অংশ মানুষের জীবনের বা তার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থায় যদি থাকে তবে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য পরিদর্শক ব্যবস্থাপককে নির্দেশ দিতে পারেন। — ধারা ৪০।

২১) **রাজ্যসরকারের ক্ষমতা** — উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ ছাড়া অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়মাবলী রাজ্য সরকার প্রণয়ন করতে পারবেন। — ধারা ৪১।

৪ (ক).৪ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিধানসমূহ

কারখানা আইনের ৪২-৫০ নং ধারায় শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

১) **ধৌত করবার সুবিধা ঃ** পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের জন্য আদালা আলাদা যথেষ্ট সংখ্যক ধোবার জায়গা রাখতে হবে সুবিধাজনক স্থানে। — ধারা ৪২।

২) **বস্ত্রাদি রাখবার ও শুকোবার সুবিধা ঃ** কাজের সময় ব্যবহার করতে হয় না এইরকম কাপড় রাখবার ও ভিজা কাপড়-চোপড় শুকাবার সুবিধাজনক জায়গা রাখবার জন্য রাজ্য সরকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন। — ধারা ৪৩।

৩) **বসবার ব্যবস্থা ঃ** শ্রমিককে যদি দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তবে তার বসবার জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক কাজের ফাঁকে যে সময়টুকু বিশ্রামের জন্য পাবে তা যেন সে ভাল ভাবে কাটাতে পারে। — ধারা ৪৪।

৪) **প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ঃ** প্রত্যেক কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত

সরঞ্জামসহ বাক্স বা আলমারী রাখতে হবে। প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য এইরকম একটি বাক্স বা আলমারীর ব্যবস্থা করতে হবে। যে ক্ষেত্রে ৫০০ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত আছে সেখানে একটা Ambulance ঘর থাকবে। — ধারা ৪৫।

৫) **ক্যান্টিন ঃ** যে কারখানায় ২৫০ জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকে সেই কারখানায় দখলকারী কর্তৃক এক বা একাধিক ক্যান্টিন রাখবার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিতে পারেন। — ধারা ৪৬

৬) **বিশ্রামাগার ও খাবার ঘর ঃ** যে সব কারখানায় ১৫০ জনের বেশী শ্রমিক সাধারণত কাজ করেন সেখানে কোনো ক্যান্টিন না থাকলে শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য এবং সঙ্গে আনা খাবার খাওয়ার জন্য একটি বিশ্রামাগার ও খাবার ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। — ধারা ৪৭

৭) **শিশু পালনাগার (Creche) ঃ** কোনো কারখানায় নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা সাধারণত ২০ জনের অধিক হলে সেই কারখানায় কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের ছয় বছরের নীচে শিশুদের রাখার জন্য শিশু পালনাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু পালনাগার সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন। — ধারা ৪৮।

৮) **শ্রমিক কল্যাণ অফিসার (Welfare Officer) ঃ** কারখানার নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা সাধারণত ৫০০ বা তার অধিক হলে সংশ্লিষ্ট কারখানার দখলকারীকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক কল্যাণ অফিসারকে নিয়োগ করতে হবে। — ধারা ৪৯।

৯) **নিয়মরচনায় রাজ্য সরকারের ক্ষমতা ঃ** কোনো কারখানাকে বিকল্প শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থার বিনিময়ে আইনে উল্লেখিত শ্রমিক কল্যাণমূলক নিয়মগুলি পালন থেকে অব্যাহতি দিতে রাজ্য সরকার নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন। — ধারা ৫০।

৪ (ক).৫ নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ

কারখানা আইনের ৬৬নং ধারায় নারী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কতগুলো অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

১) শ্রমিকগণ দিনে ৯ ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না এই নিয়ম রাজ্যসরকার পুরুষ শ্রমিকদের

ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর কোনো পরিবর্তন করতে পারবেন না।

২) সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা হচ্ছে মহিলা শ্রমিকের কার্যকাল। এই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ করা যায় না।

৩) রাত্রি ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নারী শ্রমিককে নিয়োগ কোন মতেই করা যাবে না। রাজ্য সরকারও এই সময়ে নিয়োগ করবার অধিকার কোনো কারখানাকে দিতে পারবেন না।

৪) সাপ্তাহিক ছুটি অন্য বা কোনো ছুটির পর ছাড়া অন্য কোনো সময়ে নারী শ্রমিকদের পালা পরিবর্তন করা যাবে না। তবে মৎস্য সংক্রান্ত শিল্পে রাজ্যসরকার এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন ও শিথিল করতে পারেন।

৪ (ক).৬ অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

অল্পবয়স্ক বলতে বোঝায় শিশু বা কৈশোরপ্রাপ্তকে — ১৪ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৫ বছর পূর্ণ হয় নি এরূপ ব্যক্তিকে শিশু শ্রমিক বলা হয়। আবার যে ব্যক্তির বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছর পূর্ণ হয় নি তাকে বলা হয় কৈশোরপ্রাপ্ত। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়োগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলতে হবে ঃ

১) আইনের ৬৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে ১৪ বছর পূর্ণ হয় নি এরূপ শিশুকে কোনোও কারখানায় নিয়োগ করা বা কাজ করতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু যার ১৪ বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু ১৫ বছর পূর্ণ হয় নাই তাকে নিয়োগ করতে হলে ৬৯ নং ধারার নিময় অনুযায়ী একটি যোগ্যতামূলক প্রত্যয়নপত্র ব্যবস্থাপকের কাছে রাখতে হবে এবং কাজের সময় শিশুকে প্রত্যয়নের একটা নিদর্শন রাখতে হবে। উক্ত ব্যক্তি শিশু হিসাবে কাজ করবে।

৪ (ক).৭ কিশোরদের নিয়োগ সম্পর্কে বিধিনিষেধ

কৈশোরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োগের পূর্বে প্রত্যয়নকারী চিকিৎসকের নিকট থেকে তার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্র ব্যবস্থাপকের কাছে রাখতে হবে এবং কৈশোরপ্রাপ্তকে তার একটি নিদর্শন দিতে হবে। ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও কারখানার কাজের জন্য উক্ত কৈশোরপ্রাপ্ত শিশু

বলে গণ্য হবে। তবে যে কৈশোরপ্রাপ্তের ১৭ বছর এখনও পূর্ণ হয়নি তাকে রাত্রিকালে কাজ করতে দেওয়া হবে না। রাত্রি বলতে বুঝাবে পর পর অন্তত ১২ ঘণ্টা এবং এর মধ্যে রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত থাকতে হবে। — ধারা ৬৮, ৬৯, ৭০।

৪ (ক).৮ সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনি কারখানা আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ঐ আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারলেন।

৪ (ক). ৯

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Question)**

(ক) কারখানা অধিনিয়ম অনুযায়ী সংজ্ঞা বলুন — (i) কারখানা (ii) শ্রমিক (iii) উৎপাদন প্রক্রিয়া (iv) শিশু শ্রমিক (v) কৈশোরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

(খ) প্রত্যয়কারী চিকিৎসক কে?

(গ) যার বয়স ১৫ বছর পার হয়নি, তাকে কারখানায় নিয়োগ করা যায় কী?

(ঘ) কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কী কারখানা বলা যায়?

(ঙ) কৈশোরপ্রাপ্ত শ্রমিককে যোগ্যতার প্রত্যয়নপত্র দেওয়ার ফলাফল কী?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)**

(ক) কারখানায় নিযুক্ত শিশু শ্রমিকের কাজের মসয় সম্পর্কিত নিয়মাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(খ) কারখানায় অত্যধিক ভিড় এবং পানীয় জল সংক্রান্ত বিধানগুলো আলোচনা করুন।

(গ) কারখান আইনে আগুন সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক বিধানগুলো আলোচনা করুন।

(ঘ) কোন কারখানায় নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে যে সব বিধিনিষেধ আছে তা বলুন।

৩। দীর্ঘ প্রশ্নাবলী **(Broad Questions)**

(ক) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৮৪৮ সালের কারখানা অধিনিয়মের বিধানগুলো বর্ণনা করুন।

(খ) ১৯৪৮ সালের কারখানা অধিনিয়মে বর্ণিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিধানগুলো আলোচনা করুন।

(গ) ১৯৪৮ সালের ফলাফল আইনে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিধানসমূহ আলোচনা করুন।

একক ৪ (খ) ❑ শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭

গঠন

৪ (খ).০ উদ্দেশ্য

৪ (খ).১ শিল্পবিরোধ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা

৪ (খ).২ আইনের অন্তর্গত কর্তৃপক্ষসমূহ এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

৪ (খ).২.১ ওয়ার্কস কমিটি

৪ (খ).২.২ আপস কর্মচারী

৪ (খ).২.৩ আপস পর্ষদ

৪ (খ).২.৪ অনুসন্ধান আদালত

৪ (খ).২.৫ শ্রম আদালত

৪ (খ).২.৬ শিল্প আদালত

৪ (খ).২.৭ জাতীয় শিল্প আদালত

৪ (খ).৩ ছাঁটাই সম্পর্কে নিয়মাবলী ও ক্ষতিপূরণ

৪ (খ).৪ অনুশীলনী

৪ (খ).০ উদ্দেশ্য

শিল্পে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকগণের মধ্যে বিরোধসমূহের কারণ অনুসন্ধান এবং তার নিষ্পত্তির জন্য এই অধিনিয়ম গঠিত হয়েছে। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার রক্ষা করাও এই আইনের উদ্দেশ্য।

৪ (খ).১ শিল্পবিরোধ আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা

১) গড়বেতন **(Average Pay)** ঃ— গড় বেতন বলতে কোন শ্রমিককের প্রাপ্য মজুরির গড়পড়তা পারিশ্রমিককে বোঝায়।

১) মাসিক বেতনের নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে — তিনটি সম্পূর্ণ মাসের বেতনের গড়।

২) সাপ্তাহিক বেতনে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে — চারটি সম্পূর্ণ সপ্তাহের বেতনের গড়।

৩) দৈনিক দেয় বেতনে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে — বারটি সম্পূর্ণ দিনের বেতনের গড়।
— ধারা ২ (ক ক ক)।

২) **নিয়োগকর্তা (Employer)** — কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কোনো বিভাগের পরিচালনাধীনে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃপক্ষ বলে উল্লেখ করে তাকে নিয়োগকর্তা বলে হবে। — ধারা ২ (ছ)।

৩) **শিল্প (Industry)** — শিল্প বলতে কোনো ব্যবসায়, বাণিজ্য কোনো কর্মভারগ্রহণ, দ্রব্য উৎপাদন অথবা নিয়োগকারীদের পেশাকে বোঝায়। তা ছাড়া শ্রমিকদের কোনো পেশা, কাজ নিয়োগ, হস্তশিল্প এবং শিল্পকার্য বা কোনো বৃত্তি প্রভৃতিও শিল্পের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। — ধরা ২ (ঞ)।

৪) **শিল্প বিরোধ (Industrial Dispute)** — কোনো ব্যক্তির নিয়োগ বা অনিয়োগ; নিয়োগের শর্ত বা শ্রমের শর্ত সম্পর্কে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের বা নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকর্তা বা শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের মতপার্থক্যকে শিল্প বিরোধ বলা হয়। (ধারা ২ কে) কোন শ্রমিকের চাকুরী থেকে ছাঁটাই বা বরখাস্ত সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিকের সঙ্গে নিয়োগকর্তার মতবিরোধকে শিল্পবিরোধ আখ্যা দেওয়া হবে।

৫) **শ্রমিক (Workman)** — কোনো শিল্পে শারীরিক, দক্ষ, অদক্ষ, তদারকি, কারিগরী বা করণিকের কাজে ভাড়া বা পুরস্কারের বিনিময়ে নিযুক্ত শিক্ষানবীশ সহ যে কোনো ব্যক্তিকে শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয় এই আইনে। নিযুক্তির চুক্তির শর্তাবলী ব্যক্ত বা অনুক্ত হতে পারে। — ধারা ২ এস।

৬) **কার্যাপসারণ (Lay off)** — যে শ্রমিকের কারখানার হাজিরা খাতায় নাম আছে এবং ছাঁটাই হয়নি, সেইরকম শ্রমিককে নিম্নলিখিত যে কোনো কারণের জন্য কাজে নিয়োগ করতে নিয়োগকর্তা বিফল হলে বা অস্বীকার করলে অথবা অক্ষমতা দেখা দিলে, তাকে কার্যাপসারণ বলা হয় ঃ

(ক) কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি বা কাঁচামালের অভাব দেখা দিলে

(খ) অবিক্রীত দ্রব্য জমে গেল

(গ) যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলে

(ঘ) স্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটলে বা অন্য কোনো অনুরূপ কারণে। — ধারা ২ (টটট)।

৭) **তালাবন্ধ (Lockout)** — নিয়োগের স্থান বন্ধ রাখা বা কাজ স্থগিত রাখা বা নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্তি চালিয়ে যেতে নিয়োগকর্তার অস্বীকৃতিকে তালাবন্ধ বলে। (ধারা ২ ঠ) এর উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি।

৮) **ধর্মঘট (Strike)** — কোনো শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত কিছু সংখ্যক শ্রমিক একযোগে কাজ বন্ধ করে দিলে অথবা একসঙ্গে যদি কাজ করতে অস্বীকার করে বা নিজের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ করতে অস্বীকার করে, তা হলে ঐ কাজ বন্ধ করা, কাজ করতে অস্বীকার করাকে ধর্মঘট বলে। (ধারা ২ থ)। এর উদ্দেশ্য হল নিয়োগকর্তার ওপর চাপ সৃষ্টি।

৯) **জনহিতকর সেবাপ্রতিষ্ঠান (Public Utility Service)** — জনহিতকর সেবা সংস্থা বলতে বোঝায় ঃ

(ক) যে কোন রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান (খ) ডাক ও তার বিভাগ, জল, বিদ্যুৎ ও শক্তি প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, (গ) কোন শিল্প প্রতিষ্টানের কোন অংশ যার ওপর সমগ্র প্রতিষ্ঠান অথবা তার শ্রমিকদের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

জরুরি অবস্থায় এবং জনস্বার্থের প্রয়োজনে উপযুক্ত সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে কোন শিল্পকে জনহিতকর সেবাপ্রতিষ্ঠান ৬ মাসের জন্য ঘোষণা করতে পারেন। — ধরা ২ (এন)।

১০) **ছাঁটাই (Retranchment)** — নিয়োগকর্তা কোনো শ্রমিককে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাকুরি থেকে বরখাস্ত করলে তাকে ছাঁটাই বলা হবে।

কোনো শ্রমিককে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিযুক্ত করা হলে সেই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার শ্রমিককে পুনরায় নিয়োগের জন্য সময় সম্প্রসারণ না করলে তার চাকরির অবসানকে ছাঁটাই বলা যাবে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাঁটাই বলে গণ্য হবে না।

ক) শ্রমিকের স্বেচ্ছায় কাজে অবসর নেওয়া, (খ) নিরন্তর খারাপ স্বাস্থ্য জন্য শ্রমিকের কাজের পরিসমাপ্তি ঘটানো (গ) নিয়োগের চুক্তিতে শর্ত থাকলে অবসর নেওয়ার বয়সে উপনীত হয়ে কাজে অবসর নেওয়া। — ধারা ২ (০ ০)।

১১) **মীমাংসা (Settlement)** — আপোষ মীমাংসার কার্যধারার ফলে উপনীত মীমাংসা এইরূপ কার্যধারা ছাড়াও নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পাদিত লিখিত চুক্তি এবং সম্মতিকে মীমাংসা বলে। — ধারা ২ পি।

১২) **মজুরি (Wages)** — নিযুক্তির ব্যক্ত বা অনুক্ত শর্তাদি শ্রমিক কর্তৃক পলিত হয়ে থাকলে কোন শ্রমিককে প্রদেয় যাবতীয় পারিশ্রমিক যা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তাকে মজুরি বোঝায়। নিম্নলিখিত পাওয়না ও সুবিধা এর অন্তর্গত ঃ

ক) শ্রমিকের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা সহ অন্যান্য ভাতা, (খ) বাসস্থান, আলো, জল, চিকিৎসা ও অন্য কোনো সুবিদা অথবা কমমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহজনিত সুবিধা, (গ) সস্তায় ভ্রমণের সুবিধ। — ধারা ২ আর আর।

৪ (খ).২ আইনের অন্তর্গত কর্তপক্ষসমূহ এবং তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য

শিল্পবিরোধের নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করবার জন্য নিম্নলিখিত সাত প্রকার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা আছে ঃ

১) ওয়ার্কস কমিটি (Works Committee)

২) আপস কর্মচারী (Conciliation Officer)

৩) আপস পর্ষদ (Board of Conciliation)

৪) অনুসন্ধান আদালদ (Court of Enquiry)

৫) শ্রমিক আদালত (Labour Court)

৬) শিল্প আদালত (Tribunal)

৭) জাতীয় শিল্প আদালত (National Tribunal)

৪ (খ).২.১ ওয়ার্কস কমিটি (Works Committee)

যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করে বা পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে যে কোনো দিন কাজ করেছে তাতে ওয়ার্কস কমিটি গঠনের নির্দেশ সরকার দিতে পারে। ওয়ার্কস কমিটিতে শ্রমিকদের ও নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি থাকবে। শ্রমিকদের প্রতিনিধি সংখ্যা নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি সংখ্যা থেকে কম হতে পারবে না।

কাজ — মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার চেষ্টা এই কমিটিকে করতে হবে। উভয়পক্ষের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়ে এই কমিটি মত প্রকাশ করবে। মতবিরোধের আপস মীমাংসার জন্য উক্ত কমিটি প্রচেষ্টা চালাবে। — ৩ নং ধারা।

৪ (খ).২.২ আপস কর্মচারী (Conciliation Officer)

যথোচিত সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে শিল্প বিরোধের মীমাংসার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক আপোস কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন। — ধারা ৪।

কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ (ক) কোনো শিল্পে শিল্পবিরোধ সৃষ্টি হলে বা বিরোধের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আপস কার্যক্রম শুরু করা আপস কর্মচারীর কর্তব্য।

(খ) বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিলম্ব না করে বিরোধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে উভয়পক্ষকে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিরোধ মেটানোর জন্য প্রভাবিত করা তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

(গ) আপস কার্যধারার ফলে বিরোধের নিষ্পত্তি হলে সেই সম্পর্কে একটি তথ্য তিনি দাখিল করবেন যথোচিত সরকারের কাছে। সংশ্লিষ্ট বিবরণীর সঙ্গে দুই পক্ষের স্বাক্ষর করা বিরোধ নিষ্পত্তির স্মারকপত্র সরকারের নিকট দাখিল করবেন।

ঘ) বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণসমূহ যথোচিত সরকারকে অবহিত করবেন।

আপস কর্মচারী কোনো দলকে বাধ্যতামূলকভাবে সভায় হাজির করাতে পারেন না।

৪ (খ).২.৩ আপস পর্ষদ (Board of Conciliation)

৫ ধারা অনুসারে যথোচিত সরকার কর্তৃক আপস পর্ষদ গঠিত হয়। ঐ পর্ষদ একজন চেয়ারম্যান এবং ২ বা ৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তাঁরা সম-সংখ্যক শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হবেন। চেয়ারম্যান নিরপেক্ষ ব্যক্তি হবেন।

কর্তব্য — কোনো বিরোধ আপস পর্ষদের কাছে পাঠানো হলে তা অবিলম্বে আপস নিষ্পত্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা আপস পর্ষদের কর্তব্য। বিরোধ নিষ্পত্তি হলে মীমাংসা পত্রে বা স্মারকলিপিতে সকল পক্ষ স্বাক্ষর করবে। সেই স্মারকলিপি বিবরণসমূহ যথোচিত সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

মীমাংসা না হলে, সব তথ্য আপস পর্যদ কীভাবে মীমাংসার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, মীমাংসা না হওয়ার কারণ ও আপস পর্যদের সুপারিশ সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

ক্ষমতা — ১) যে শিল্প বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা, ২) কোনো ব্যক্তিকে হাজির হতে বাধ্য করা ও তাকে জেরা করা, আপস পর্যদের ক্ষমতা বা অধিকার।

৪ (খ).২.৪ অনুসন্ধান আদালত (Court of Enquiry)

৫ ধারা অনুসারে যথোচিত সরকার কর্তৃক অনুসন্ধান আদালত গঠিত হয়। এই আদালতের সদস্য সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। একের বেশি সদস্য হলে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

কর্তব্য — অনুসন্ধানের জন্য আদালতের কাছে পাঠানো সকল বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে ৬ মাসের মধ্যে এর বিষদ বিবরণ যথোচিত সরকারের কাছে প্রেরণা করা অনুসন্ধান আদালতের কর্তব্য।

আদালতের সব সদস্যের স্বাক্ষরসহ বিবরণী দাখিল করতে হবে। কোনো সদস্য কোন বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলে তাও সরকারকে জানাতে হবে।

ক্ষমতা — নোটিশ দিয়ে বিরোধ সম্পর্কিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা, ২) কোনো ব্যক্তিকে হাজিরা দেওয়া ও জেরা করা, ৩) বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তিদের আদালতের কাজে সাহায্যের জন্য নিয়োগ করা অনুসন্ধান আদালতের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে।

বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি করা অনুসন্ধান আদালতের ক্ষমতা নেই।

৪ (খ).২.৫ শ্রম আদালত (Labour Court)

সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যথাযথ সরকার ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের ৭ ধারায় দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিল্প বিরোধের রায় প্রদান করার জন্য এক বা একাধিক শ্রম আদালত গঠন করে। ঐ আদালতকে অন্যান্য কাজ করার দায়িত্বও ন্যস্ত করা যেতে পারে। একজন সদস্য নিয়ে এই আদালত গঠিত হয়। শ্রম আদালতের প্রধান কর্মকর্তাকে Presiding Officer বলা হয়ে থাকে।

কর্তব্য ও দায় — ১) ৭নং ধারা অনুসারে দ্বিতীয় তপসিলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে শিল্প বিরোধ বিচার করা এবং অন্যান্য যে সব বিষয়ে কাজ করার ক্ষমতা সরকার এই আদলত দিয়েছিলেন সেই সব কাজগুলো সম্পাদন করা।

২) যথাশীঘ্র সম্ভব বিচার সম্পন্ন করে প্রদত্ত রায় সরকারের কাছে দাখিল করা।

৩) যে কোনো ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা।

৪) শিল্পবিরোধ সম্পর্কীত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা।

৫) সাক্ষীদের জেরা করা।

৪ (খ).২.৬ শিল্প আদালত (Tribunal)

শিল্প বিরোধ আইনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় তপশীলে উল্লিখিত যে কোন বিষয়সংক্রান্ত বিরোধ বিচারপূর্বক রায় দানের গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ যথাযথ সরকার এক বা একাধিক শিল্প আদালত গঠন করতে পারে। — ধারা ৭ (এ)।

কর্তব্য — যথাশীঘ্র সম্ভব কর্মধারা আরম্ভ করা এবং তার রায় যথোপযুক্ত সরকারের কাছে দাখিল করা শিল্প আদালতের কর্তব্য।

ক্ষমতা — শ্রম আদালতের ন্যায়।

৪ (খ).২.৭ জাতীয় শিল্প আদালত (National Tribunal)

৭(বি) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে এক বা একাধিক জাতীয় শিল্প আদালত গঠন করতে পারেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পবিরোধ বা যে শিল্পবিরোধের প্রকৃতি ভারতের অন্য রাজ্যে অবস্থিত সমগোত্রীয় শিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এইরূপ শিল্প বিরোধ বিচারের জন্য জাতীয় শিল্প আদালত গঠন করা যায়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের যে কোন একজনকে নিয়ে এই জাতীয় শিল্প আদালত গঠিত হয়।

(ক) হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি বা (খ) দু-বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো প্রাক্তন বা বর্তমান (Labour Appellate Tribunal) -এর চেয়ারম্যান বা কোনো কর্মকর্তা। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বোধ করলে আরও দু-জন ব্যক্তিকে পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন।

কর্তব্য ও ক্ষমতা — জাতীয় শিল্প আদালতের কর্তব্য ও ক্ষমতামূহর শ্রম আদালত ও শিল্প আদালতের অনুরূপ। যতশীঘ্র সম্ভব বিচারকার্য সমাধা করে জাতীয় শিল্প আদালত তার রায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করবেন।

৪ (খ).৩ ছাঁটাই সম্পর্কে নিয়মাবলী ও ক্ষতিপূরণ

১) ২৫ চ ধারায় ছাঁটাই সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে পর্যন্ত না নিম্নোক্ত শর্তাদি পালিত হবে সেই পর্যন্ত কোন নিয়োগকর্তার অধীনে একটানা ও অন্তত এক বছরের জন্য কাজে নিযুক্ত কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না।

ক) শ্রমিককে একটি লিখিত এক মাসের নোটিশ দিতে হবে এবং তাতে ছাঁটাই-এর কারণ দেখাতে হবে। এরূপ নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে অথবা এই নোটিসের পরিবর্তে শ্রমিককে একমাসের বেতন দেওয়া হলে তবে ছাঁটাই করা যাবে।

খ) ছাঁটাইয়ের জন্য শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, শিল্পবিরোধ আইনে বলা হয়েছে শ্রমিককে সে যে সময় কাজ করেছে এইরূপ প্রতি বছর ও তার অংশ স্বরূপ ছয় মাসের অধিককালের জন্য বছরে ১৫ দিনের গড় বেতনের হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

গ) ছাঁটাই সম্পর্কে যথাযথ সরকারকে নির্ধারিত নিয়মে নোটিশ দিতে হবে।

২) ২৫ ছ ধারায় বলা হয়েছে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি নিয়োগকর্তা কোন ভারতের নাগরিক বা অন্য কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করতে চান তা হলে তিনি সর্বশেষে নিযুক্ত হয়েছেন সেরূপ শ্রমিককে সর্বাগ্রে ছাঁটাইয়ের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৩) ২৫ জ ধারায় ছাঁটাই শ্রমিকের পুনরায় নিয়োগের বিদান দেওয়া হয়েছে। ওই বিধানে বলা হয়েছে যে নুতন শ্রমিক নিয়োগ করার সময় নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই ছাঁটাই শ্রমিকদের নিয়োগের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

8 (খ).8 অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Question)**

(ক) ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ অধিনিয়ম অনুসারে সংজ্ঞা লিখুন —

(i) শিল্প বিরোধ (ii) শ্রমিক (iii) শিল্প (iv) মজুরি (v) গড় বেতন (vi) ছাঁটাই (vii) কার্যপসারণ (viii) তালাবন্ধ (ix) ধর্মঘট।

(খ) নিম্নলিখিতগুলি শিল্প কিনা বলুন —

(i) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ii) হাসপাতাল (iii) পৌরসভা (iv) সাধনা ঔষধালয়।

(গ) শিল্প বিরোধ কে উত্থাপন করতে পারে?

(ঘ) শিল্প বিরোধ অধিনিময়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)**

(ক) কোন্ কোন্ বিষয় শ্রমিক আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত?

(খ) ধর্মঘট ও তালাবন্ধের পার্থক্য কী?

(গ) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেগুলো ছাঁটাই কী না কারণ সহ লেখ —

(i) শ্রমিকের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ (ii) ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানির জন্য চাকরির অবসান

(ঘ) শিল্প বিরোধ অধিনিয়মে নিয়োগকর্তা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) শিল্প বিরোধ আইন অনুযায়ী কারা শ্রমিক বলে গণ্য হয় না?

(চ) মজুরি ও বোনাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

(ছ) কখন ধর্মঘট ও তালাবন্ধ অবৈধ হয়?

৩। **দীর্ঘ প্রশ্নাবলী (Broad Questions)**

(ক) শিল্পবিরোধ অধিনিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষগুলির নাম উল্লেখ করুন।

(খ) শিল্প বিরোধ মীমাংসার জন্য কর্তপক্ষগুলির গঠন, কর্তব্য ও ক্ষমতা বর্ণনা করুন।

৪। শিল্প বিরোধ অধিনিয়মে ধর্মঘট ও তালাবন্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ আছে তা বর্ণনা করুন।

৫। শিল্প বিরোধ অধিনিয়মে ছাঁটাই-এর সংজ্ঞা দাও। কোন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পূর্ব শর্ত সমূহ কী কী? সাময়িক কর্মবন্ধ ও ছাঁটাইয়ের পার্থক্য কী?

একক ৫ (ক) ❑ শ্রমিক সংঘ আইন, ১৯২৮

গঠন

৫ (ক).০ উদ্দেশ্য

৫ (ক).১ শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা

৫ (ক).২ শ্রমিক সংঘের নিবন্ধন

৫ (ক).৩ শ্রমিক সংঘের অধিকার

৫ (ক).৪ শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধন

৫ (ক).৫ অনুশীলনী

৫ (ক).০ উদ্দেশ্য

১৯২৬ সালে ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আইন পাশ হয়। ১৯৬৪ সালের সংশোধিত আইনে 'ভারতীয়' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল শ্রমিক সংঘগুলির স্বীকৃতি দান যাতে মালিকের সঙ্গে যৌথ দরকষির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

৫ (ক).১ শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা

শ্রমিক সংঘ আইনে 2(h) ধারায় শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তা ও নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য অথবা কোনো বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণমূলক শর্ত আরোপের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবে গড়ে ওঠা মিলিত রূপকে বাণিজ্য সংঘ হিসাবে গণ্য করা হয়। দুই বা ততোধিক শ্রমিক সংঘের যুক্ত সংঘও এই সংজ্ঞার অন্তর্গত।

৫ (ক).২ শ্রমিক সংঘের নিবন্ধন

শ্রমিক সংঘ নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হবে।

১) শ্রমিক সংঘের নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করেছেন এরূপ যে কোনো ৭ জন বা তার অধিক সংখ্যক সদস্য সংঘের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২) নিবন্ধনের দরখাস্ত দাখিল করার পরে আবেদনকারী সদস্যদের মধ্যে কিছু সদস্য তাঁদের সদস্যপদ ত্যাগ করলে অথবা নিবন্ধককে সংঘের সঙ্গে সম্পর্কছেদ সম্পর্কে লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করলেও নিবন্ধনের দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে না এই আইনের ৪ নং ধারানুসারে। কিন্তু অর্ধেকের বেশি সদস্য যদি সদস্যপদ ত্যাগ করে তবে এই ধারা অনুসারে নিবন্ধনের আবেদনপত্র বাতিল হবে।

৩) শ্রমিকসংঘ নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ করবার পূর্বে সংঘের পরিচালক পর্ষদ গঠন করতে হবে নতুবা সংঘ নিবন্ধিত হবে না।

৪) নিবন্ধনের আবেদনের সঙ্গে সংঘের নিয়মাবলীর একটি কপি দাখিল করতে হবে।

৫) সংঘের নিয়মাবলীর কপিসহ নিবন্ধনের দরখাস্ত নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে। দরখাস্তে দরখাস্তকারীর নাম, ঠিকানা, উপজীবিকা, পদাধিকারীদের পদ নাম, (title) উল্লেখ করতে হবে।

৬) সংঘের নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ না থাকলে নিব্রন্ধনের আবেদন বাতিল হয়ে যাবে।

(ক) সংঘের নাম, (খ) সংঘের উদ্দেশ্যসমূহ, (গ) সংঘের সাধারণ তহবিল খরচের উদ্দেশ্যসমূহ, (ঘ) সংঘের সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ, (ঙ) সংঘের সদস্যদের মাসিক চাঁদা প্রদান (সদস্য প্রতি কমপক্ষে ২৫ পয়সার কম নয়), (চ) সদস্যদের সংঘের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ, (ছ) সংঘের নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার পদ্ধতি, (জ) সংঘের পরিচালক পর্ষদের সদস্য ও পদাধিকারীদের নিয়োগ ও অপসারণ সংক্রান্ত নিয়ম, (ঝ) সংঘের সাধারণ তহবিলের নিরাপদ হেফাজত, হিসাবের বার্ষিক নিরীক্ষা এবং হিসাব খাতা সদস্য ও পদাধিকারীদের দ্বারা পরিদর্শনের পর্যাপ্ত সুবিধা, (ঞ) সংঘ অবসানের পদ্ধতি।

৭) নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করার আগে যদি বাণিজ্য সংঘ এক বছরের বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সংগে সংঘের সম্পদ ও দায়িত্বের একটি সাধারণ বিবৃতি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।

৮) এই আইনের ৫ নং ও ৬ নং ধারার নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে নিবন্ধক আরও সন্তুষ্ট হতে চাইলে আবেদনকারী সংঘকে আরো অতিরিক্ত বিষয় তার নিকট পেশ করতে আদেশ দিতে পারেন। সকল তথ্য সরবরাহ না করা পর্যন্ত নিবন্ধন স্থগিত থাকবে।

৯) আবেদনকারী বাণিজ্য সংঘের নাম যদি বিদ্যমান অন্য কোন নিবন্ধিত সংঘের নামের অনুরূপ

বা সাদৃশ্য থাকার ফলে জনসাধারণ বা সদস্যরা বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে নিবন্ধক ঐ নাম পরিবর্তনের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং নাম পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধক স্থগিত থাকবে।

নিবন্ধন সংক্রান্ত এই আইনের সব নিয়ম আবেদনকারী বাণিজ্য সংঘ যথাযথভাবে পালন করলে এবং এই বিষয়ে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে সংঘকে তিনি নিবন্ধিত করবেন। — ধারা ৮।

৫(ক).৩ শ্রমিক সংঘের অধিকার

নিম্নে নিবন্ধিত শ্রমিক সংঘের অধিকার বা সুবিধাগুলি আলোচনা করা হল ঃ—

১) **নিগমবদ্ধ** — যে নাম শ্রমিক সংঘ নিবন্ধিত হয়েছে সেই নামে তা একটি আইন দ্বারা সৃষ্ট সংস্থা বলে বিবেচিত হবে ও তার চিরস্থায়ী অস্তিত্ব ও সাধারণ শীলমোহর থাকবে। এরা স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। — ধারা ১৩।

২) **রাজনৈতিক তহবিল** — নিবন্ধিত বাণিজ্য সংঘ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পৃথক রাজনৈতিক তহবিল গঠন করতে পারে। — ধারা ১৬।

৩) **ফৌজদারী বিচার থেকে অব্যাহতি** — শ্রমিক সংঘের কোন উদ্দেশ্যের। যা ১৫নং ধারায় উল্লিখিত রয়েছে, উন্নতিসাধনের জন্য সদস্যদের মধ্যে কোন চুক্তি হলে তার জন্য শ্রমিক সংঘের কোনো সদস্য বা পদাধিকারী ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২০ (খ) (২) নং ধারা অনুযায়ী কোন দণ্ডভোগ করবে না। — ধারা ১৭।

৪) **দেওয়ানী মামলা থেকে অব্যাহতি** — কোনো শ্রমবিরোধের ফলস্বরূপ যদি কোনো শ্রমিক সংঘ তার পদাধিকারী বা সদস্য চাকুরীর শর্তাবলী ভঙ্গ করে বা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে বা শ্রমের ইচ্ছামতো বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী আদালতে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। — ধারা ১৮।

৫) **চুক্তির প্রবর্তনীয়তা** — নিবন্ধিত সংঘের সদস্যবর্গের মধ্যে চুক্তির কোনো উদ্দেশ্য বাণিজ্য অবরোধক হলেও তা বাতিল বা রদযোগ্য হবে না। — ধারা ১৯।

৬) **শ্রমিক সংঘের বই পরিদর্শনের অধিকার** — নিবন্ধিত বাণিজ্য সংঘের হিসাব বই এবং

সদস্যদের তালিকা পদাধিকারী বা সদস্যদের কাছে উন্মুক্ত থাকবে তাদের পরিদর্শনের জন্য। — ধারা ২০।

৭) **অপ্রাপ্ত বয়স্কের সদস্যপদের অধিকার** — ১৫ বছরের ব্যক্তি নিবন্ধিত বাণিজ্য সংঘের সদস্য হতে পারে। — ধারা ২১।

৮) **শ্রমিক সংঘের নাম পরিবর্তন** — শ্রমিক সংঘের নাম পরিবর্তনের জন্য লিখিতভাবে বিজ্ঞপ্তি নিবন্ধিত সংঘের সম্পাদক ও সাতজন সদস্যের স্বাক্ষরসহ নিবন্ধকের কাছে পাঠাতে হবে। নাম পরিবর্তনের জন্য মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি আবশ্যক। নাম পরিবর্তনের জন্য সদস্যদের বা শ্রমিক সংঘের দায়িত্ব বা অধিকারের কোনো পরিবর্তন হবে না।

৫ (ক).৪ শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধন

কোন শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধন করলে, শ্রমিক সংঘের সম্পাদক ও ৭ জন সদস্য বিলোপসাধনের ১৪ দিনের মধ্যে বিলোপসাধনের বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষর করে নিবন্ধকের কাছে পেশ করবে। বিজ্ঞপ্তি পেয়ে যদি নিবন্ধক মনে করে যে শ্রমিক সংঘ আইন যথাযথ ভাবে পালন করে তবুও শ্রমিকসংঘের বিলোপসাধন করা হয়েছে, তা হলে তা নিবন্ধন করবে এবং নিবন্ধন করার তারিখ থেকে শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধন কার্যকর হবে। — ধারা ২৭ (১)।

যে ক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধন নিবন্ধন করা হয়েছে এবং শ্রমিক সংঘের বিলোপ সাধন হলে তার তহবিলের টাকা বণ্টনের বিষয় যদি শ্রমিক সংঘের নিয়মাবলীতে উল্লেখ না থাকে তা হলে নিবন্ধক সেই টাকা আইন অনুসারে সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দেবে।

৫ (ক).৫ অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Type Question) :—**

(ক) ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইন অনুযায়ী শ্রমিক বিরোধ কাকে বলে?

(খ) শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা দিন

(গ) ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইন অনুসারে শ্রমিক বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) শ্রমিক সংঘ নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে কতজন সভ্যের প্রয়োজন হয়।

(ঙ) শ্রমিক সংঘ নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্রের সহিত কী কী দলিল দাখিল করতে হয়?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short type Questions) :—**

(ক) শ্রমিক সংঘের নিবন্ধন সম্পর্কিত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করুন

(খ) একটি নিবন্ধিত শ্রমিক সংঘের বিলোপসাধনের নিয়মগুলি কী কী?

৩। **দীর্ঘ প্রশ্নাবলী (Broad type Questions) :—**

(ক) একটি নিবন্ধিত শ্রমিক সংঘের ও তার সদস্যদের অধিকার সুবিধাগুলি বর্ণনা করুন।

(খ) ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইন অনুযায়ী শ্রমিক সংঘের নিবন্ধন ও বিলোপসাধন সংক্রান্ত নিয়মগুলি আলোচনা করুন।

একক ৫ (খ) ❑ মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬

গঠন

৫ (খ).০ উদ্দেশ্য
৫ (খ).১ মজুরি প্রদান আইন অনুসারে সংজ্ঞা
৫ (খ).২ মজুরি প্রদান সংক্রান্ত নিয়মালবী
৫ (খ).৩ মজুরি থেকে ছাড়
৫ (খ).৪ আইনের বলবৎকরণ
৫ (খ).৫ সারাংশ
৫ (খ).৬ অনুশীলনী

৫ (খ).০ উদ্দেশ্য

শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মজুরি প্রদান নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই আইনটি ১৯৩৬ সালে রচিত হয়েছে। অনিয়মিত মজুরি প্রদান এবং মজুরি থেকে অবৈধ ছাড় বন্ধ করাই মজুরি প্রদান আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য। কারখানা, শিল্পসংস্থা, রেলওয়েতে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে তাদের মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে। যে সব শ্রমিকের মাসিক গড় মজুরি ১৬০০ টাকার বেশি সেই সব শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসবে।

৫ (খ).১ মজুরি প্রদান আইন অনুসারে সংজ্ঞা

১) কারখানা — কারখানা বলতে বোঝায় কারখানা আইনের কারখানাকে।

২) শিল্প-সংস্থা — শিল্প-সংস্থা বলতে বোঝায়, (ক) ট্রামওয়ে পরিবহন এবং সড়ক পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন, (খ) আকাশপথে বে-সামরিক পরিবহন, (গ) ডক (ঘ) যন্ত্রচালিত অভ্যন্তরীন জাহাজ, (ঙ) খনি ও খনিজ তৈল, (চ) বাগিচা, (ছ) উৎপাদন কাজে নিযুক্ত সংস্থা, (ঝ) বাড়ী, রাস্তা, ব্রীজ ও খাল তৈরি ও মেরামতির কাজে নিযুক্ত সংস্থা।

৩) মজুরি — বেতন, ভাতা বা অন্যভাবে অর্থের মাধ্যমে দেয় পারিশ্রমিক বা যে অর্থ নিয়োগ-সংক্রান্ত

চুক্তির ব্যক্ত বা অনুজ্ঞ শর্তাবলী পালিত হলে শ্রমিককে তার কাজের জন্য দেওয়া হয়, সেই পারিশ্রমিক বা অর্থকে মজুরি বলা হয়।

কর্মচারীকে বিনা ভাড়ায় বাড়ী প্রদান, ভ্রমণ-ভাতা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা মজুরির অন্তর্গত হয় না।

৫ (খ).২ মজুরি প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী

মজুরী প্রদানের দায় — নিযোগকর্তা নিযুক্ত ব্যক্তিদের আইন অনুযায়ী প্রদেয় সব মজুরি প্রদানে বাধয থাকবেন। নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরাও মজুরি প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন। (ক) কারখানার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি, (খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিল্পসংস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (গ) রেলওয়ের ক্ষেত্রে রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। (৩ ধারা)

মজুরি কালের নির্দিষ্টকরণ — মজুরি প্রদানের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি মজুরি কাল নির্দিষ্ট করে দেবেন যা একমাসের বেশি সময়ের জন্য হতে পারবে না। (৪ ধারা)

মজুরি প্রদানের সময় — (৫ ধারায়) মজুরি প্রদানের সময় সম্পর্কে নিয়মাবলী নিম্নে আলোচনা করা হল—

(ক) রেলওয়ে, কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যদি ১০০০ এর কম হয় তবে মজুরি কালের ৭ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মজুরি প্রদান করতে হবে,

(খ) নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যদি ১০০০ এর বেশি হয় তবে মজুরি-কালের ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ারপূর্বেই মজুরি প্রদান করতে হবে,

(গ) ডক, জেটি প্রভৃতিতে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের পর প্রদেয় অবশিষ্ট মজুরি পণ্যখালাস্ বা পণ্যবোঝাই সম্পূর্ণ করবার পর ৭ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মজুরি প্রদান করতে হবে।

৫ (খ).৩ মজুরি থেকে ছাড়

নিম্নলিখিত বিষয়ে মজুরি থেকে টাকা ছাড় হিসাবে বাদ দেওয়া যেতে পারে (৭ ধারা)

১) জরিমানা — (ক) সরকার অনুমোদিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই কেবল জরিমানা কাটা হবে।

(খ) জরিমানা আদায় করবার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

(গ) মোট জরিমানার পরিমাণ প্রদেয় মজুরির ৩ -এর বেশি হতে পারবে না।

(ঘ) জরিমানা সম্পর্কে সকল তথ্য নির্ধারিত রেজিষ্টারে রাখতে হবে।

(ঙ) ১৫ বছরের নীচে কোন ব্যক্তির ওপর জরিমানা ধার্য হবে না।

২) কাজের অনুপস্থিতি — কাজের জায়গা থেকে শ্রমিক সম্পূর্ণ দিন বা আংশিক সময়ের জন্য অনুপস্থিত থাকলে তার মজুরি থেকে আনুপাতিক হারে টাকা বাদ যাবে।

৩) ক্ষতি এবং ক্ষতিপূরণ জনিত ছাড় — নিযুক্ত কর্মীর হেফাজতে রক্ষিত পণ্য বা অর্থের কোন ক্ষতি হলে, উক্ত ক্ষতির জন্য মজুরি থেকে ছাড় কাটা যাবে।

৪) প্রদত্ত সেবার জন্য ছাড় — কর্মীকে বাড়ী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকলে তার জন্য নিয়োগকর্তা সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে মজুরি থেকে ছাড় কেটে রাখতে পারবে।

৫) অগ্রিম বেতনের জন্য ছাড় — নিয়োগকর্তা অগ্রিম বেতন প্রদান করে থাকলে মজুরি থেকে উক্ত অগ্রিম বেতনের টাকা কেটে রাখতে পারবে।

৬) প্রদত্ত ঋণের জন্য ছাড় — নিয়োগকর্তা প্রদত্ত ঋণের জন্য ছাড় কেটে রাখতে পারবেন।

৭) বিবিধ ছাড় — কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রদেয় অর্থের জন্য ছাড়, প্রদেয় আয়করের জন্য ছাড়, জীবনবীমার জন্য প্রদেয় ছাড় বৈধ বলে গণ্য হবে।

৫ (খ).৪ আইনের বলবৎকরণ

পরিদর্শক — ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন অনুযায়ী কারখানার পরিদর্শক হিসাবে যে ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হন, সেই ব্যক্তিরাই মজুরি প্রদান আইনের ব্যাপারেও পরিদর্শক হিসাবে বিবেচিত হবেন সেই সব কারখানায়, যে কারখানাগুলি তাঁদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। মজুরি প্রদান আইনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার রেলপথ সংস্থায় যে সব শ্রমিক কাজ করে (কারখানা ছাড়া) তাদের ক্ষেত্রে পরিদর্শক নিয়োগ করতে পারবে। — ১৪ ধারা।

পরিদর্শকের ক্ষমতা — পরিদর্শক রেলপথ, কারখানা, শিল্প বা অন্যান্য সংস্থায় লোকজনসহ আগে থেকে

বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যুক্তিসংগত কাজের সময় পরিদর্শন করতে পারেন। পরিদর্শক শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

কোন নিয়োগকর্তাকে অপরাধী মনে হলে, খাতাপত্র ক্রোক করতে পারেন বা খাতাপত্রের নকল নিতে পারেন।

পরিদর্শককে কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার জন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বা কোন কিছু ব্যক্ত করতে বাধ্য করা যাবে না।

কর্তৃপক্ষ — বিলম্বে মজুরিপ্রদান অথবা মজুরি কর্তনজনিত বিবাদ শ্রবণ ও মীমাংসার জন্য রাজ্যসরকার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে কোন আধিকারিক নিয়োগ করতে পারেন। ধারা ১৫।

৫ (খ).৫ সারাংশ

এই এককটিতে মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬ নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি নিশ্চই এই আইন অনুসারে প্রদত্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন শিল্প সংস্থা, মজুরি ইত্যাদি জেনেছেন। আবার এই আইনের নিয়মাবলী এবং মজুরি থেকে ছাড় সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

৫ (খ).৬ অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Question) —

(ক) ১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান অনুযায়ী মজুরির সংজ্ঞা লিখুন।

(খ) মজুরি প্রদান আইন অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা লিখুন।

(গ) মজুরি প্রদান আইন অনুযায়ী মজুরি প্রদানের দায়িত্ব কার উপর ধার্য?

(ঘ) নিয়োগকর্তা শ্রমিকের মজুরি থেকে আয়কর কাটতে পারেন কী?

(ঙ) শ্রমিকের অবহেলার কারণে কারখানার দ্রব্যাদি যা তার হেপাজতে আছে যদি ক্ষতিসাধন হয় তবে মজুরি থেকে কাটা যেতে পারে কী?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions)

(ক) মজুরি প্রদান আইন অনুযায়ী মজুরি প্রদানের সময় সম্পর্কিত বিধানসমূহ আলোচনা করুন।

(খ) অনুপস্থিতির কারণে মজুরি থেকে বাদ দেওয়া সম্পর্কে বিধানগুলি কী কী?

(গ) মজুরি প্রদান আইন অনুযায়ী নিযুক্ত ব্যক্তির ওপর জরিমানা সংক্রান্ত বিধানগুলো আলোচনা করুন?

(ঘ) কোন কর্মচারীর মোট মজুরি ৬০০ টাকা। নিয়োগকর্তা ৪০০ টাকা কেটে কর্মীকে বাকি টাকা দিলেন। নিয়োগকর্তা মজুরিপ্রদানের শর্ত পালন করেছেন কী?

৩। দীর্ঘ প্রশ্নাবলী (Broad Questions)

(ক) মজুরি প্রদান আইন অনুসারে শ্রমিকের মজুরি থেকে কী কী বাদ দেওয়া যায় আলোচনা কর।

(খ) মজুরি প্রদান আইন অনুসারে — মজুরি বলতে কী বোঝায়?

মজুরি প্রদানের জন্য দায়ী কে?

মজুরি প্রদান আইন অনুযায়ী মজুরি প্রদানের সময় সম্পর্কিত নিয়মাবলী কী?

নিয়োগকর্তা মজুরি প্রদান সংক্রান্ত বিধান অমান্য করলে ফল কী?

একক ৫ (গ) ❑ ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮

গঠন

৫ (গ).০ উদ্দেশ্য

৫ (গ).১ ন্যূনতম মজুরি আইন অনুসারে সংজ্ঞা

৫ (গ).২ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধন

৫ (গ).৩ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধনের পদ্ধতি

৫ (গ).৪ আইনের বলবৎকরণ

৫ (গ).৫ সারাংশ

৫ (গ).৬ অনুশীলনী

৫ (গ).৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫ (গ).০ উদ্দেশ্য

ন্যূনতম মজুরি আইন অনুযায়ী কয়েকটি নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের বঞ্চনাকে প্রতিরোধ করা। এই আইন জম্মু ও কাশ্মীর সহ সমগ্র ভারতেই প্রযোজ্য।

৫ (গ).১ ন্যূনতম মজুরি আইন অনুসারে সংজ্ঞা

যথাযথ সরকার (Appropriate Government) — কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো তালিকাভুক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারই যথাযথ সরকার। অন্যান্য তালিকাভুক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারই যথাযথ সরকার। — ধারা ২ (খ)।

মজুরি (Wages) — মজুরি শব্দটির দ্বারা এমন সব পারিশ্রমিক বোঝায় যা অর্থের বিনিময়ে প্রকাশ করা যায় কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করা হলে নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তির শর্ত পূরণের জন্য অর্থ প্রদান। বাড়ী ভাড়া ভাতা এর অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিতগুলো মজুরির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ক) বাড়ীতে আশ্রয়ের মূল্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল্য, জল সরবরাহের মূল্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বা কোন সেবামূলক ব্যয় বা যথাযথ সরকার বাদ দিয়েছে।

(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড; পেনসন বা কোন সামাজিক বীমা প্রকল্পে নিয়োগকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ,

(গ) কোন ভ্রমণভাতা বা ভ্রমণমূলক ছাড়ের মূল্য

(ঘ) অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুইটি প্রদান।

তালিকাভুক্ত নিয়োগ (Schedule Employment) — তালিকাভুক্ত নিয়োগ বলতে তালিকায় নির্দিষ্ট কোনো নিয়োগকে বোঝায় অথবা ঐ নিয়োগের অংশ হিসাবে কোন পদ্ধতি বা শাখা কার্যে নিয়োগকে বোঝায়। তালিকা দুভাগে বিভক্ত। প্রথমটিতে উলের কার্পেট বা শাল বুনন কার্য, ধানকল, আটাকল, ডালকল, তামাক ও বিড়ি তৈরির কারখানা, তেলকল, পাথর ভাঙা, লাক্ষা তৈরি, অভ্র, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি; দ্বিতীয়টিতে যথা—খামার, দুগ্ধ প্রকল্প, শয্য বপণ, পশুপালন, মৌমাছি পালন ইত্যাদি।

নিয়োগকারী (Employer) — নিয়োগকারী বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি সরাসরি বা প্রতিনিধি মারফৎ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত নিয়োগে নিযুক্ত করেছেন, যে সব নিয়োগের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিযুক্ত ব্যক্তি (Employee) — নিযুক্ত ব্যক্তি বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি পারিশ্রমিকের বদলে দক্ষ বা অদক্ষ, শ্রমসাধ্য বা করণিকের কোন তালিকাভুক্ত নিয়োগের অধীন তাতে নিযুক্ত এবং এই নিয়োগের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে।

সাবালক, কৈশোরপ্রাপ্ত, শিশু — এদের সংজ্ঞা কারখানা আইনে ব্যবহৃত শব্দগুলির অনুরূপ।

৫ (গ).২ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধন

ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ (৩ নং ধারা) — এই আইন অনুসারে যথাযথ সরকার মজুরির ন্যূনতম হার নির্ধারণ করবেন এবং নিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তার প্রদান করতে হবে নিয়োগকারীকে। ন্যূনতম মজুরির হার একটি রাজ্যের জন্য বা রাজ্যের কোনো অংশের জন্য বা বিশেষ শ্রেণীর নিয়োগের জন্য নির্ধারিত হতে পারে। এই হার সময়ভিত্তিক কাজ ফুরণ কাজ বা অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য নির্ধারিত হতে পারে। যদি কোনো তালিকাভুক্ত নিয়োগে ১০০০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে, ন্যূনতম হার নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১০০০ না হয়।

ন্যূনতম হার, সময়ভিত্তিক কাজ, ফূরণভিত্তিক কাজ অথবা অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য নির্ধারিত হতে পারে। ফূরণকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি ন্যূনতম পারিশ্রমিক দিতে হবে যাতে তারা কাজের সময়ের ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি পায়।

বিভিন্ন তালিকাভুক্ত নিয়োগের শ্রমিকগণ বিভিন্ন প্রকার মজুরির হার পেতে পারেন। একটি তালিকাভুক্ত নিয়োগের বিভিন্ন কাজের জন্য সাবালক, কৈশোরপ্রাপ্ত ও শিশু শ্রমিকগণ, বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন মজুরির হার পেতে পারে না।

নূন্যতম মজুরির হার এক বা একাধিক মজুরি কালের জন্য নির্ধারিত হতে পারে যেমন (১) ঘণ্টার দ্বারা (২) দিনের দ্বারা, (৩) মাসের দ্বারা (৪) বৃহত্তর মজুরি কালের দ্বারা।

মজুরির হার দিবস ও মাসের দ্বারা নির্ধারিত হলে সেক্ষেত্রে একমাস ও একদিনের মজুরি হিসাবের পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে।

মূল ন্যূনতম মজুরির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না।

কোনো মজুরি কাল ১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইনের ৪ নং ধারা অনুসারে নির্ধারিত হলে, ন্যূনতম মজুরিও সেই অনুসারে নির্ধারিত হবে।

আইনে ৪ নং ধারা অনুসারে যথোপযুক্ত সরকার দ্বারা নির্ধারিত বা সংশোধিত ন্যূনতম মজুরির হারের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্গত—

১) মূল মজুরির সঙ্গে জীবনধারণের ব্যয়ের ভাতাকে ব্যয়ের সূচক হারের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রাখতে হবে।

২) একটি ব্যাপক হার যার মূল হার জীবনধারণের ব্যয়ের ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার অর্থমূল্য অন্তর্ভুক্ত বা

৩) মূল মজুরির হার এবং তার সঙ্গে জীবনধারণের ব্যয়ের ভাতা যুক্ত করে বা না করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুবিধা হারে সরবরাহের ক্ষেত্রে তার মূল্য।

৫ (গ).৩ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধনের পদ্ধতি

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য যথাযথ সরকার

১) একটি কমিটি নিয়োগ করতে পারেন, অথবা

২) সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এর প্রস্তাব প্রকাশ করতে পারেন এবং দিন স্থিরীকৃত করতে পারেন, যে দিন প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে পারেন।

প্রথমটির ক্ষেত্রে কমিটির উপদেশ বিবেচনা করার পর এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ঐ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিগণের কাছ থেকে মতামত নেবার পর যথোপযুক্ত সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ন্যূনতম হার নির্ধারণ করবে। বিপরীত কোনো নির্দেশ না থাকলে বিজ্ঞপ্তির পর তিনমাস অতিক্রান্ত হলে কার্যকরী হবে। — ধারা ৫।

ন্যূনতম মজুরির হার সংশোধনের জন্য যথাযথ সরকার উপদেষ্টা কমিটি ও সাব-কমিটিগুলো গঠন করতে পারেন। কমিটিগুলোর কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে উপদেশ দেবার জন্য ও উপদেষ্টা বোর্ডগুলোর কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করতে পারেন। কমিটি ও বোর্ডগুলোর সদস্যগণ যথাযথ সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। সংশোধিত হার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে। অন্য কোনো শর্তের উল্লেখ না থাকলে, গেজেট প্রকাশের তিন মাস পরে সংশোধিত হার কার্যকরী হবে।

৫ (গ).৪ আইনের বলবৎকরণ

পরিদর্শক (Inspector) — যথাযথ সরকারি সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দানের পর এই আইনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনে পরিদর্শকদের নিয়োগ করতে পারেন এবং যে স্থানীয় এলাকার মধ্যে তাঁর কাজ করবেন তা চিহ্নিত করে দিতে পারেন।

পরিদর্শকের ক্ষমতা — (ক) কোন পরিদর্শক যুক্তিসংগত সময়ে প্রয়োজনমত তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে তালিকাভুক্ত নিয়োগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে কোন নিবন্ধগ্রন্থ, মজুরি রেকর্ড ও নোটিশ পরিদর্শন করতে পারেন।

খ) বাইরে কর্মরত কোনো শ্রমিকের কাজ ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

গ) কোনো কর্মচারীকে পরীক্ষা করতে পারেন।

ঘ) কোনো নিবন্ধনগ্রন্থ, মজুরির রেকর্ড, নোটিশ ও তার অংশ বা কোনো তথ্যের নকল চাইতে পারেন এবং ঐগুলো আটক করতে পারেন। যদি পরিদর্শক মনে করেন যে নিয়োগকর্তা আইন অনুযায়ী কোনো অপরাধ করেছেন।

ঙ) নির্দেশিত অন্যান্য ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন।

শাস্তি ঃ কোন নিয়োগকারী যদি ন্যূনতম মজুরির কম মজুরি প্রদান করেন বা ১৩ নং ধারা অনুযায়ী কোন

নিয়ম বা আদেশ ভ ঙ্গ করেন তবে তাকে ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ বা ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারা যায়।

৫ (গ).৫ সারাংশ

বর্তমান এককে ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কীভাবে এই আইন বলবৎ হয় এবং আইনটির নিয়মাবলী সম্পর্কে আপনি বিভিন্ন বিষয় জেনেছেন। এছাড়া এই আইনে আপনি কীভাবে মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধন করবেন তাও জেনেছেন।

৫ (গ).৬ অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective Question)**

ক) ন্যূনতম মজুরি আইন অনুসারে যথাযথ সরকার কে?

খ) তালিকাভুক্ত নিয়োগ বলতে কী বোঝায়?

গ) ন্যূনতম মজুরি আইন অনুসারে মজুরির সংজ্ঞা দিন।

ঘ) নিয়োগকারীর সংজ্ঞা দিন।

ঙ) নিযুক্ত ব্যক্তি কাকে বোঝায়?

চ) পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে কী?

২। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (Short Questions) :—**

(ক) মজুরি বলকে কী বোঝায়? কোন কোন মজুরির অন্তর্ভুক্ত নয়?

(খ) ন্যূনতম মজুরি আইনে পরিদর্শকের ক্ষমতা বর্ণনা করুন।

৩। **দীর্ঘ প্রশ্নাবলী (Broad type Questions) :—**

(ক) ন্যূনতম মজুরি আইন অনুসারে ন্যূনতম মজুরির হার কিভাবে নির্ধারণ করা হয় আলোচনা করুন।

(খ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও সংশোধনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৫ (গ).৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Kapoor, N. D. — Business Law, Sultan Chand.
2. Chandha, P. R. — Business Law, Galgotia.
3. Sen and Mitra — Commercial & Industrial Law, World Press.
4. (a) The Factories Act, 1948.

   (b) Industrial Dispute Act, 1947.

   (c) Trade Union Act — 1926.

   (d) Payment of Wages Act, 1936.

   (e) Payment of Minimum Wages Act, 1948.
5. সেন ও মিত্র — বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, ওয়ালর্ড প্রেস।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700 064 & Printed at Prabaha, 45, Raja Rammohan Roy Sarani, Kolkata - 700 009.